স্পেনে মুসলমানদের
ইতিহাস
এ,এইচ,এম,শামসুর রহমান

স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস

স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস

প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান

অধ্যক্ষ কলারোয়া সরকারী কলেজ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা
ভূতপূর্ব সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামের
ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, সরকারী বি. এল. কলেজ,
দৌলতপুর, খুলনা। সহকারী অধ্যাপক, মেহেরপুর
সরকারী কলেজ, মেহেরপুর। প্রভাষক,
সরকারী এম. সি. কলেজ, সিলেট
এবং অধ্যাপক, মতলব ডিগ্রী
কলেজ, চাঁদপুর,
কুমিল্লা।

প্রকাশনার সাত দশকে
স্টুডেন্ট ওয়েজ

প্রকাশক
মোহাম্মদ লিয়াকতউল্লাহ
স্টুডেন্ট ওয়েজ
'লিয়াকত প্লাজা'
৯ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
দূরালাপ : [+৮৮] ০২৪৭১১৯০০৫
ই-মেইল : studentways@hotmail.com
ওয়েব : www.studentways.org

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৮১ বঙ্গাব্দ

অষ্টম পরিমার্জিত সংস্করণ
পৌষ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
রবিউল আউয়াল ১৪৩৮ হিজরি

প্রচ্ছদ
কর্দোবা মসজিদের ছবি থেকে পরিকল্পিত

অক্ষর বিন্যাস
হৃদয় কম্পিউটার ঢাকা

মুদ্রণে
মৌমিতা প্রিন্টার্স ঢাকা

মূল্য : দুইশত টাকা

ISBN : 978 984 92793 8 9

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com/studentways

উত্তর আমেরিকায় পরিবেশক
মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট
নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাজ্যে পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড
২ ব্রিক লেন, লন্ডন

কানাডায় পরিবেশক
এটি এন বুক এন্ড ক্র্যাফট্‌স
২৯৭০ ডান ফোর্থ অ্যাভিনিউ
টরেন্টো

ভারতে পরিবেশক
বিশ্ব বঙ্গীয় প্রকাশন
কলেজ স্ট্রিট মার্কেট
কলকাতা- ৭০০০০৭

Spainay Musulmander Itihas : A History of Muslim Spain in Bengali by A.H.M Shamsur Rahman. Published by Mohammad Liaquatullah of Student Ways. 9 Banglabazar, Dhaka-1100. Eighth Edition January 2017. Price: Taka Two Hundred only.

শ্রদ্ধেয়
মাতা-পিতার উদ্দেশ্যে—

আরজ

স্পেনে মুসলমানদের ধারাবাহিক ইতিহাস বাংলা ভাষায় পাওয়ার জন্য ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ পাঠকমহল দীর্ঘদিন যাবৎ গভীর প্রতীক্ষায় ছিলেন। এই পুস্তক সেই প্রতীক্ষা পূরণের একটি নগণ্য প্রয়াস মাত্র। স্পেনে মুসলমানদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য যে পরিমাণ জ্ঞান ও অধ্যয়ন থাকা প্রয়োজন তাহার কোনটাই আমার নাই। তাহা ছাড়াও আরবী, স্প্যানিশ ও ইংরাজী ভাষায় লিখিত মৌলিক গ্রন্থাবলীও নিতান্ত দুর্লভ। তবুও এই গুরুভার হাতে লইতে সাহসী হই আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ, অকৃত্রিম বন্ধু-বান্ধব ও প্রীতিভাজন ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহাতিশয্যে।

এই পুস্তকে স্পেনে মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বর্ণনাও কিঞ্চিৎ রহিয়াছে। মুসলমানেরা কেমনভাবে স্পেনে রাজত্ব কায়েম করেন, উমাইয়া খলিফা ও উত্তর আফ্রিকার গভর্ণরদের সঙ্গে স্পেনের সম্পর্ক, স্বাধীন উমাইয়া রাজ্যপ্রতিষ্ঠা, উমাইয়া শক্তির পতনের কারণ, স্পেনে মুসলমান শক্তির সঙ্গে লিয়োন, ক্যাস্টাইল, নাভারি ও ফ্রাঙ্কদের সম্পর্ক, ক্ষুদ্র রাজ বংশের ইতিবৃত্ত, উত্তর আফ্রিকার শাসন, গ্রানাদা রাজ্যের উত্থান পতন ও স্পেন হইতে মুসলমানদের বিতাড়ন প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হইয়াছে। পুস্তকের শেষে বংশতালিকা, গ্রন্থপঞ্জী ও মানচিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই পুস্তক প্রণয়নে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ড. এস. এম. ইমাম উদ্দিন সাহেব প্রণীত : A Political History of Muslim Spain গ্রন্থের উপর বহুলাংশে নির্ভর করিয়াছি। বলিতে গেলে উক্ত গ্রন্থই এই পুস্তকের পথ প্রদর্শক। তাই তাহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ড. এম. এ. বারী সাহেব ও বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এ. বি. এম. হোসেন সাহেবও বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান উপদেশ দিয়া আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকটও আমি কৃতজ্ঞ। এই পুস্তক প্রণয়নে অত্র বিভাগের আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ আবদুল হাই সাহেবও আমাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহার কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

তাহাছাড়া সহকর্মী অধ্যাপক জনাব সোহরাব উদ্দিন আহমদ সাহেব, অধ্যাপক মোল্লা গোলাম গাফফার সাহেব ও মুহাম্মদ নওশের আলী সাহেব এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক জনাব খান লুৎফর রহমান সাহেবও আমাকে

বিভিন্নভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। পরিশেষে যাঁহার উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ব্যতীত এই দুরূহ কার্যে হাত দেওয়া সম্ভব হইত না তিনি হইলেন আমার শিক্ষক ও বিভাগীয় প্রধান জনাব সুফিয়ান আহমদ সাহেব। তাঁহার নিকট আমার ঋণের অন্ত নাই। তাহাছাড়া অন্যান্য অধ্যাপক ও বন্ধু-বান্ধব যাঁহারা এই কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহারাও ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। পিরামিড প্রেসের কর্মচারীবৃন্দ যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এই পুস্তক মুদ্রণে সাহায্য করিয়াছেন তাহাদের কথাও একই প্রসঙ্গে স্মরণ করি।

পরিশেষে সকল মহলের নিকট আমার বিনীত আরজ— এই পুস্তক রচনায় তথ্যগত প্রমাদ এড়াইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি তবে ভাষাগত কারণে মাঝে মাঝে প্রমাদ ঘটিতে পারে, এই জন্য আমি পূর্বাহ্নে ক্ষমাপ্রার্থী। ভবিষ্যতে এই পুস্তক অধিকতর সুন্দর ও তথ্যবহুল করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট হইতে প্রাপ্ত সদুপদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হইবে। পাঠক সমাজ এই পুস্তক হইতে সামান্য মাত্রও উপকার লাভ করিলে আমার সীমিত সামর্থের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক হইবে। আল্লাহ হাফেজ।

সরকারী ব্রজলাল কলেজ
দৌলতপুর, খুলনা
ফেব্রুয়ারী ইং, ১৯৭৫ সাল।

এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

ষষ্ঠ সংস্করণ শুরুতে

সমস্ত প্রশংসা মহানস্রষ্টা আল্লাহ রাববুল আলামীনের—যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দান করেছেন। মানুষের অজানাকে জানিয়েছেন। অজ্ঞতার আঁধারকে জ্ঞানের দীপালোকে বিদূরিত করে সৃষ্টি সেরা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন তার সুপ্ত প্রতিভার চর্চা ও বিকাশ সাধনে। সেই মহান প্রভুর অসীম দয়ায় স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাসের পঞ্চম সংস্করণের মুদ্রিত সংখ্যা নিঃশেষিত হওয়ায় ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হল।

মহানবী (সাঃ) এর উপর সালাম সালাত যার সর্বোত্তম আদর্শকে বুকে মুখে ও হাতে নিয়ে এশিয়া ও আফ্রিকা পেরিয়ে সেদল ইউরোপে উপনীত হ'ল—তাদেরই দ্বারা ধর্মান্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্বৈরতন্ত্রী ও সামন্তবাদী দাসতন্ত্রে রক্ষণশীল-শিক্ষায় পশ্চাদপদে সমাজ পেল উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির আবেহায়াত। গোটা ইউরোপে দেখা দিল মার্জিত রুচির নবজাগৃতি সুন্দর সমাজ গঠনের সাড়ম্বর জোয়ার। জিব্রাল্টা প্রাণালী হতে পীরেনীজ পর্বতমালা পেরীয়ে ফ্রান্স জার্মানী হয়ে ইংল্যান্ডের টেম্‌স তটে পৌছে গেল রেনেসাঁর সাড়া জাগানো সওগাত। ভূমধ্যসাগরের উভয় সৈকতে শোভা পেল মুসলিম সভ্যতার সফেদ উড্ডীন পতাকা।

ইউরোপ রমণী নগরী কর্দোবার খ্যাতি আফ্রিকা ও এশিয়ার সভ্য সমাজে সগর্বে ঘোষণা করল মধ্যযুগে জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য স্থাপত্য ব্যবসা বাণিজ্য তাহযীব তমদ্দূন নিয়ে বিশ্বে সেই সেরা। তখনও প্যারীস, বন কিংবা লণ্ডনের রাজপথে আলোর বাতি জ্বলে উঠেনি। আর প্রাচীন রোম ও কনস্টান্টিনপলের খ্যাতি ক্ষয়িষ্ণু—নিবু নিবু প্রায়-। সেই ৭১১ থেকে ১৪৯২ পর্যন্ত ইউরোপে আন্দালুসিয়ার দিকে সকলের দৃষ্টি ছিল অতৃপ্ত বাসনায় নব নব সৃষ্টির অন্বেষায় নতুন প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায়।

কূফা, দামেস্ক, বাগদাদ কায়রো ও কায়রোয়ানের পাল্লা তখন কর্দোবার ভারে নিতান্ত হালকা। মুসলিম স্পেনের এই চমকপ্রদ, কৌতূহল উদ্দীপক ও সাড়া জাগানো সভ্যতার ইতিহাস নিয়েই বাংলা ভাষাভাষী জ্ঞান পিপাসুদের নিকট এ লেখা। দেশের সব কটি বিশ্ববিদ্যালয় আর মাষ্টার্স ও অনার্স কলেজগুলিতে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির ছাত্রছাত্রীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে এ সংস্করণ বর্ধিত তথ্য নিয়ে প্রকাশিত হ'ল। সকলের সহযোগিতার জন্য লেখক ও প্রকাশক সবার প্রতি কৃতজ্ঞ।

প্রফেসর এ. এইচ. এম শামসুর রহমান

১০.৮.১.২০০২ইং
কলারোয়া সরকারী কলেজ
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে অনার্স ও মাষ্টার্স শ্রেণীতে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে 'স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস' পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। ফলে ছাত্রছাত্রীদের প্রবল আগ্রহ স্পেনের ইতিহাস পড়ার। ৭১১ সাল থেকে ১৪৯২ সাল পর্যন্ত প্রায় আট শ বছর মুসলিম স্পেন ইউরোপে সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার এক নবদিগন্ত উন্মোচন করে। মধ্যযুগে কুসংস্কারাচ্ছন্ন পাদ্রীপুরোহিত শাসিত ইউরোপে ধর্মের নামে শোষণ ও বর্বরতার এক জঘণ্য অমানিশার আধার ঢেকে রাখে। মুসলমানেরা ঐ প্রেক্ষাপটে ইসলামের সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব আর এক পরিচ্ছন্ন সভ্যতা উপহার দেয়। যে সভ্যতার বিভিন্ন দিক প্রবলভাবে আকর্ষণ করে কৌতূহল পাঠককে। কর্দোবা, গ্রানাদা, সেভিল, মালাগা, তলেদো, আলমেরিয়ার জগত বিখ্যাত কীর্তি সমূহের বিবরণ এখনও হৃদয়ে শিহরণ জাগায় ; আজ-জাহরা, আজ-জাহিরা, আলহামরার ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রাসাদ, কর্দোবার জামে মসজিদ, সেভিলের জিরাল্ডা আর কর্দোবা বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ লক্ষ গ্রন্থেভরপুর লাইব্রেরী এখনও গবেষকদের অতৃপ্ত জ্ঞানতৃষ্ণা হাতছানি দিয়ে ডাকে! ভূমধ্যসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর আর গুয়াদাল কুইভার, তাগুস ও এবরো নদীতে ভাসমান রণতরী, বাণিজ্যবহর আর প্রমোদ ভেলা এখনও পাঠককে অজানা জ্ঞানের সন্ধান দেয়। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও যানবাহনের সমৃদ্ধি সেদিনের স্পেন সারা ইউরোপের আকর্ষণ ছিল।

সুদীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী স্পেনের মাটিতে যে অপরূপ কোলাহল আর জ্ঞান বিজ্ঞানের কল্লোল সৃষ্টি করেছিল তার ইতিহাস কে না জানতে চায় ? ঐ অজানারে জানানোর এক প্রয়াস "স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস" আজ কুড়ি বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান পিপাসুদের তৃষ্ণা এককভাবে নিবারণ করে চলেছে। প্রতি সংস্করণে প্রবৃদ্ধির কলেবর নিয়ে যেমন নতুন তথ্য উপহার দেয়া এবারও তার ব্যতয় ঘটেনি। আশা করি পাঠকের প্রয়োজন অনেকাংশ মিটাতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ। তথ্যগত অথবা মুদ্রণ প্রমাদ পরিলক্ষিত হলে তা আগামীতে সংশোধন করা হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তকাম্য। গ্রন্থ মুদ্রণ, প্রকাশ ও পরিবেশনায় যুক্ত সকলের শ্রমকে মুবারকবাদ জানাই।

সরকারী বি. এল. কলেজ,
দৌলতপুর, খুলনা
১০.১০.৯৫

এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

মহান আল্লাহ সুবহানাওয়া তায়ালার অসীম অনুগ্রহে 'স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস' গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হোল। ক্রমবর্ধমান চাহিদায় প্রায় বছর দেড়েক পূর্বেই তৃতীয় সংস্করণ শেষ হয়। বিভিন্ন কারণে বইটির প্রকাশনা বিলম্বিত হলেও একটু বর্ধিত কলেবরে কিছু প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংযোজন করে আবার আগ্রহী পাঠকের নিকট বইটি ছাপার হরফে এল। বইটির শেষের দিকে স্পেনের শিক্ষা সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা এবং স্পেনের যশস্বী মনিষীদের একটি তালিকাও সংযুক্ত করা হোল। আশা করি উৎসাহী ও তথ্য অনুসন্ধিৎসুজনের জন্য এটা উপকারে আসবে। তবে বইটি আরো আকর্ষণীয় ও তথ্যবহুল করার জন্য আগামীতে আরও বর্দ্ধিত কলেবরে বের করার প্রত্যাশা রইল।

এই বই এর প্রকাশনায় ষ্টুডেন্ট ওয়েজ যে মহৎ উদ্যোগ ও সাফল্যজনক পদক্ষেপ নিয়েছে তার জন্য মোবারকবাদ। বইটিতে তথ্যগত প্রমাদ বা মুদ্রণ ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে তা গ্রন্থকার ও প্রকাশককে মেহেরবাণী করে অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধন করার ইরাদা রেখে ছাত্রছাত্রী ও পাঠকমহলের সকলের সহযোগিতা কামনা করছি। বই পড়ে মুসলমানদের হৃত গৌরব অবহিত হয়ে যদি কিছু অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে প্রতিভা আর মনিষার উন্মেষ ও সাধনার ক্ষেত্রে তাহলে শ্রম সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ।

এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান

সরকারী বি. এল. কলেজ
দৌলতপুর, খুলনা
৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯০

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

মহান স্রষ্টার অসীম রহমতে "স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস" তৃতীয় দফায় মুদ্রিত হয়ে পাঠকের হাতে এল। বইটি আরো প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করার অভিপ্রায় থাকা সত্ত্বেও নানাবিধ প্রতিকূলতায় সম্ভব হোল না বিধায় খুবই সংকোচ বোধ করছি। তবে দৃঢ় প্রত্যয় রইল ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে বর্ধিত কলেবরে এর পুনঃ প্রকাশ ঘটবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের স্পেনের ইতিহাস পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত। আর বাংলা ভাষায় এটিই একমাত্র বই হওয়ায় এর চাহিদা যথেষ্ট। বেশ কিছু আগেই এর পূর্ববর্তী সংস্করণগুলি নিঃশেষ হয়ে গেছে। অথচ ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে সামনে রেখে ত্বরিতে এর প্রকাশনার অন্যতম অন্তরায় ছিল উপকরণ মূল্যের নিত্য উর্ধগতি।

যাহোক এ নাজুক পরিস্থিতির সকল মোকাবেলায় ঢাকাস্থ ষ্টুডেন্ট ওয়েজ অত্যন্ত হিম্মতের সাথে সানুগ্রহে এগিয়ে এসে বইটি পাঠক মহলের হাতে পৌঁছানোর যে গুরুদায়িত্ব বহন করেছেন তার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের শুভ প্রচেষ্টাকে সংকুচিত করতে চাই না। তবে কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি তাঁদের প্রাপ্য। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকেই মোবারকবাদ।

পরিশেষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের বর্তমান সভানেত্রী অধ্যাপিকা মিসেস কামরুন রহমান, যিনি আমার শ্রদ্ধেয়া শিক্ষিকা তার উৎসাহ আর অনুপ্রেরণা ও অন্যান্য শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মণ্ডলী, সহকর্মীবৃন্দ এবং স্নেহভাজন সকল ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ পাঠক মহলের সতত সহযোগিতা এ প্রসংগে অকৃপনভাবে উন্মুক্ত হৃদয়ে স্মরণ করছি।

বইটিকে আরও আকর্ষণীয় এবং তথ্য সমৃদ্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের নিকট হতে প্রাপ্ত সদুপদেশ শ্রদ্ধার সাথে গৃহীত হবে।

আল্লাহ্ আমাদের সকল জ্ঞানানুরাগীদের স্পেনে মুসলিম ইতিহাস সঠিক তথ্য দ্বারা জ্ঞান অনুশীলনের ও জাতীয় চেতনা প্রবৃদ্ধির কল্যাণ দান করুন। আমীন।

সরকারী ব্রজলাল কলেজ
দৌলতপুর, খুলনা।
২০শে জুন ১৯৮৬ ইং

এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার। তাঁহারই অশেষ অনুগ্রহে "স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস" প্রথম প্রকাশের সমস্ত কপি মাত্র দেড় বৎসরের মধ্যেই পাঠকদের হাতে পৌঁছাইতে পারিয়াছি। তাই পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত কলেবরে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে। এই গ্রন্থ অধ্যয়নে যাঁহাদের জ্ঞান পিপাসা তৃপ্ত হইয়াছে তাঁহাদের জন্য জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। এই সংস্করণের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে পরিশিষ্ট অধ্যায়ে কর্দোবা ও উমাইয়া যুগের শাসন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রমাণিক আলোচনা ও একটি নির্ঘণ্ট সংযোজন। ফলে, পাঠকদের নিকট গ্রন্থটি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর আকর্ষণীয় ও তথ্যবহুল হইবে বলিয়া বিশ্বাস রাখি।

বানান-শুদ্ধিতে ও ভাষাগত সৌন্দর্য সঞ্চারে যাঁহার সহৃদয় সহযোগিতা সবিশেষ স্মরণযোগ্য তিনি হইতেছেন দৌলতপুর সরকারী বি. এল. কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও আমার পরম মঙ্গলাকাঙ্খী জনাব আবদুল নঈম সাহেব। এই অবকাশে তাঁহাকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। নির্ঘণ্ট তৈয়ারী করিবার মত বিরক্তিকর কাজে প্রশংসনীয় ধৈর্য্যের সহিত বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া আমার ভ্রম লাঘব করিয়াছেন আমার দুই প্রীতিভাজন ছাত্র মোঃ জালালউদ্দিন ও মোঃ আবদুল লতিফ তালুকদার। তাঁহাদের জন্য আন্তরিকভাবে উত্তরোত্তর উন্নতি ও কল্যাণ কামনা করি। সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধায় স্মরণ করি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, সম্মানিত সহকর্মী স্নেহভাজন ছাত্র-ছাত্রীদের তাঁহাদের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য, সহযোগিতা ও সহৃদয় সহানুভূতির জন্য।

অনিচ্ছাকৃত অথচ অনিবার্য মূল্যবৃদ্ধির জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। কাগজের ক্রয়মূল্যের দ্বিগুণ দর ও গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি ইহার জন্য বিশেষভাবে দায়ী। সামগ্রিক অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া, সহানুভূতিশীল সুজন পাঠক, আশা করি , আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখিবেন। প্রথম সংস্করণে গ্রন্থটিকে আরও আকর্ষণীয়, যথাসম্ভব মুদ্রণ ত্রুটি–মুক্ত ও সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিবার জন্য পিরামিড প্রেস ও ইষ্টার্ণ প্রেসের মালিক ও কর্মচারীদের সর্বোত্তম সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি।

যাঁহাদের জন্য গ্রন্থটি পরিকল্পিত ও প্রকাশিত তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনে সামান্যমাত্রও সহায়ক হইলে আমার এই প্রাণান্ত প্রয়াস সার্থক বলিয়া বিবেচনা করিব। পরিশেষে, সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আল্লাহ তা'লার নিকট আন্তরিকভাবে মঙ্গল কামনা করি। আমিন!

সরকারী ব্রজলাল কলেজ
দৌলতপুর, খুলনা। এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান
জুলাই, ১৯৭৭ ইং।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস

[**সার সংক্ষেপ :** সূচনা ❑ বিজয়ের পূর্বাভাষ ❑ স্পেনের ভৌগোলিক অবস্থান ❑ বিজয় পূর্ববস্থা ❑ সামাজিক অবস্থা ❑ অর্থনৈতিক অবস্থা ❑ ধর্মীয় অবস্থা ❑ রাজনৈতিক অবস্থা ।]

মহানবীর তিরোধানের পর মুসলমাদের ক্রমাগত ও অভূতপূর্ব বিজয় পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিস্ময়কর বিপ্লব। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সামরিক শৌর্য এবং ধর্মীয় আবেদনে মুসলিম শক্তি এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ ভূখণ্ডে এক নূতন যুগের সূচনা করে। তাইগ্রীস, ইউফ্রেটিস, নীলনদ ও ভূমধ্যসাগর উপকূলে প্রাচীন রোম ও পারস্য শক্তির অবসান ঘটাইয়া জ্যোতির্ময় ইসলামী প্রভায় গড়িয়ে তোলে নূতন শাসন, শৌর্য ও সভ্যতা। মুসলিম বিজয় বাহিনী যেদিকে তাহাদের অভিযান পরিচালনা করে, সেদিকের অব্যাহত বিজয় সকলের কৌতূহল সৃষ্টি করে। এমনকি এক বিজয় বাহিনী সমগ্র উত্তর আফ্রিকা বিজয় করিয়া দুর্বার গতিতে ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর সংযোগকারী প্রণালী অতিক্রম করিয়া ইউরোপে প্রবেশ করে। উহা অতি দ্রুতগতিতে স্পেন অধিকার করিয়া ফ্রান্সের প্রবেশদ্বার পীরেনীজ পর্বতমালা অতিক্রম করিবার আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ মুসলমানদের দখলে আসে, সেখানে গড়িয়া উঠে ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং সভ্যতা ও ঐতিহ্যের মানমন্দির। তদানীন্তন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অর্ধসভ্য ইউরোপে প্রবাহিত হয় মুসলিম সভ্যতার স্রোতসলিল। কর্দোবা, গ্রানাদা, তলেদো, সেভিল, মালাগা প্রভৃতি কেন্দ্রে বিদ্যার্থীগণ দলে দলে আসিয়া সমবেত হয়। তাহারা জ্ঞান সূর্যের আলোকে স্নাত হইয়া ইউরোপের অজ্ঞতার অন্ধকার দূরীভূত করিয়া নূতন সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটায়। খ্রিস্টান ইউরোপ মুসলিম স্পেনের সংস্পর্শে আসিয়া ঘোর অন্ধকার ও কুসংস্কার হইতে নিজকে টানিয়া তোলে। আরবীয় মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণ প্রাঞ্জল ভাষায় চমৎকার মন্তব্য করিয়াছেন। মধ্যযুগের প্রথম ভাগে এই আরব জাতি মানব সভ্যতার প্রগতির ক্ষেত্রে যে অবদান রাখিয়াছে, এমন আর কোন জাতিই রাখে নাই। শার্লেমেন ও তাহার লর্ডরা যখন নাম দস্তখত করিতে শিখিতেছিলেন বলিয়া কথিত, তখন আরব পণ্ডিতেরা আরাস্তর গ্রন্থ অধ্যয়নে ব্যাপৃত।

কর্দোবার বিজ্ঞানীরা সতেরটি বিরাট লাইব্রেরী লইয়া গবেষণায় নিমগ্ন, তাহার একটি লাইব্রেরীর বই এর সংখ্যা ছিল ৪০,০০০ ; আর সেই পণ্ডিতেরা যখন পরম আরামদায়ক স্নানাগার ব্যবহার করিতেন, তখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্গ প্রক্ষালনকে এক ভয়ংকর অনাচার বলিয়া বিবেচনা করা হইত।[১]

খ্রিস্টান ইউরোপের অশুচি ও অনাচার সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ একইভাবে বিরূপ মন্তব্য করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। একজন সন্ন্যাসিনী সুদীর্ঘ ৬০ বছর পর্যন্ত স্নান অথবা দেহের কোন অংশ ধৌত না করিয়া কেবল ধর্মগ্রন্থ পাঠের সময় অঙ্গুলির অগ্রভাগ পানিতে ডুবাইয়া পবিত্রতা রক্ষা করিবার এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা সৃষ্টি করেন।[২] অথচ মুসলিমগণ সেখানে পবিত্রতা, শুচি ও আচার পালনে কত সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন বন্দোবস্ত করিয়াছেন অজু ও গোসলের সাহায্যে। এমনিভাবে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া স্পেনের মুসলমানেরা খ্রিস্টান ইউরোপকে সভ্যতার আলোকে টানিয়া আনে।

বিজয়ের পূর্বাভাস

ইসলামী পতাকা লইয়া মুসলিম বাহিনী উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রখ্যাত সেনাপতি মুসা বিন নুসাইরের[৩] নেতৃত্বে নিয়োজিত। দামেস্কের খলিফা আল-ওয়ালিদের নির্দেশক্রমে সেনাপতি সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় উমাইয়া প্রধান্য বিস্তার

---

১. P. K. Hitti—History of the Arabs—P. 526—

২. Stanley lane poole—The Moors in Spain—P. 135

৩. মুসা বিন নুসাইর এর পিতা নুসাইরের জীবন ইতিহাস খুবই চমকপ্রদ। হযরত আবু বকর (রা.) এর খিলাফতের শেষের দিকে এবং হযরত ওমরের (রা.) খিলাফতের প্রথম দিকে সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ আইনুত তামার অধিকার করেন। আইনুত তামার টেসিফোন হতে সোজা ১০০ মাইল পশ্চিমে। এখানে একটা গীর্জায় বেশ কিছু প্রতিভাধর যুবককে বন্দী করে সেনাপতি খালিদ নিয়ে আসেন। তাদের মধ্যে নুসাইর এবং সীরীন অন্যতম। সীরীন পুত্র বসরার মুহাম্মদ যেমন ছিলেন মসীতে পণ্ডিত তেমনি নুসাইর পুত্র মুসা ছিলেন অসিতে পারদর্শী।

মুসার পিতা নুসাইর পরবর্তীকালে হযরত মুআবিয়া বিন আবি সুফিয়ানের অন্যতম প্রাসাদরক্ষী বাহিনীর ক্যাপটেন ছিলেন। সিফ্‌ফিনের যুদ্ধের সময় তিনি মুআবিয়ার পক্ষে যুদ্ধে যেতে অস্বীকৃতি জানান এ মর্মে যে হযরত আলীর নিকট তিনি অধিকতর ঋণী। যদিও মুআবিয়া এতে ভীষণ রুষ্ট হন। পরে নুসাইর প্রাণনাশের আশংকায় ক্ষমা চেয়ে নেন। নুসাইর পুত্র মুসা জন্মগ্রহণ করেন (স্পেনের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক) ইবনে হাইয়ান এবং ইবনে বাশকুয়ালের মতে হযরত ওমরের (রা.) খিলাফত কালে ১৯ হিজরী মুতাবিক জানুয়ারী ৬৪০ খ্রি. এবং মৃত্যু বরণ করেন ৯৭ হিজরী মুতাবিক সেপ্টেম্বর ৭১৫ খ্রিস্টাব্দে। তিনি খলিফা আব্দুল মালিকের ভাই মিশরের গভর্ণর আব্দুল আজিজ ইবনে মারওয়ান ইবনে হাকামের রাজকীয় পরিবারে মাওয়ালী রূপেই প্রতিপালিত হন। স্পেনীয় ঐতিহাসিক ইবনুল ফারাজী এবং ইবনে বাশকুয়াল বলেন যে, মুসা একজন তাবেঈ অর্থাৎ সাহাবাদের অনুসারী ছিলেন। কারণ তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবী তামিমদারী (রা.) হতে হাদীস বর্ণনা করেন।

সেনাপতি মুসার পুত্র "কিতাবুল আইমাতি মিনাল মুসান্নাফিন" (হাদিস সংগ্রাহকদের জীবন তালিকা) নামক যে মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তা হাদিস, ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞানের জন্য সমৃদ্ধ দলিল। সকল ঐতিহাসিক

করিয়া ন্যায় ও সাম্যের দ্বারা ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধ পরিকর। অসংখ্য বার্বার গোত্র তখনও রোমানদের প্ররোচনায় মুসলমানদের বিরুদ্ধাচারণে নিমগ্ন। তাই সেনাপতি মুসা বিন নুসাইর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রোমানদের প্রভাব মুক্ত করিয়া বার্বারদিগকে ইসলামের সুমহান বাণীতে উদ্বুদ্ধ করিয়া আরবীয়দের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ সামরিক শক্তিতে পরিণত করেন। বার্বারগণ বিপুল আগ্রহ আর অপরিমেয় উৎসাহ সহকারে মুসলিম বাহিনীকে শক্তিশালী করিয়া তোলেন। এই নূতন শক্তি সমন্বয়ে গঠিত আরব বাহিনী ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জগুলিও মুসলিম শাসনে আনয়ন করেন। অতঃপর তাহারা দৃষ্টি দিলেন আফ্রিকার অপর তীরে স্পেনের দিকে।

ঐক্যমত পোষণ করেন যে মুসা ছিলেন দূর্জয় সাহসী, অনন্য প্রতিভাধর, মহানুভব, বিনয়ী, ধার্মিক এবং অর্পিত দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান ও তৎপর—এক সুনিপুণ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সেনাপতি। তিনি এমন একজন তেজস্বী সেনানায়ক যিনি যুদ্ধে অপরাজেয়। ঐতিহাসিক ইজহারী বলেন "তিনি সর্বদা সৎ গুণীজন এবং ধার্মিক পণ্ডিত বন্ধুবর্গ পরিবেষ্টিত থাকতেন। তিনি হিজাজের ওয়াদিউল কুরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বনি উমাইয়ার মাওয়ালী ছিলেন, তিনি আল ওয়ালিদের এবং আব্দুল আজিজের মনোনীত সেনানায়ক ও উত্তর আফ্রিকার গভর্ণর হিসাবে যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন তা আফ্রিকা ও স্পেন এবং মুসলিম ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় রূপে প্রোজ্জ্বল। তার জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হোল ঃ

হিজরী	খ্রিষ্টাব্দ	
৭৯	৬৯৮	মুসা আফ্রিকার গভর্ণরের নিযুক্তি পান।
৭৯	৬৯৮	মিশর থেকে উত্তর আফ্রিকায় এসে গভর্ণরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
৮০	৬৯৯-৭০০	জাখওয়ান, হাওয়ারাহ, জিনাতাহ এবং কুতামা নামক বার্বার গোত্রগুলির বিরুদ্ধে অভিযান।
৮৪	৭০৩	কায়রোয়ানে অবস্থান এবং ১০০ জাহাজের একটি নৌবহরের নৌঘাটি তিউনিসে স্থাপন।
৮৫	৭০৪	সিসিলি অভিযান।
৮৬	৭০৫	সারদিনা দ্বীপ দখল।
৮৯	৭০৭-৮	সুস আল আকসা, আওসাফ এবং তানজিয়ার অভিযান।
৯১	৭১০	তারিফ বিন মালিককে স্পেন অভিযানে প্রেরণ।
৯২	৭১১	তারিফ বিন জিয়াদকে স্পেন অভিযানে প্রেরণ, স্পেনের রাজা রডারিকের পরাজয়, রাজধানী তলেদোর পতন। ইছিজা ও কর্দোবা দখল। গ্রানাদা, মালাগা ও মুরসিয়া পদানত।
৯৩	৭১২	সেনাপতি মুসার স্পেনে উপস্থিতি মেদিনা সিদোনা, কারমোনা, সেভিল, বেজা, মেরিদা দখল। সারাগোসা, আরাগণ ও কাতালোনা অভিযান।
৯৪	৭১৩	গ্যালিসিয়া অভিযান।
৯৪ (জিলহজ্জ)	৭১৩ (সেপ্টেম্বর)	আফ্রিকার উদ্দেশ্যে স্পেন ত্যাগ।
৯৭	৭১৫ (ফেব্রুয়ারি)	খলিফা আল ওয়ালিদের মৃত্যুর ৪০ দিন পূর্বে দামেস্কে উপস্থিতি।
৯৭	৭১৫	খলিফা সুলাইমান কর্তৃক লাঞ্ছিত, পদচ্যুত। হজ্জ পালনে মক্কা মুকাররমায় গমন।
৯৭	৭১৫ (সেপ্টেম্বর)	মৃত্যু বরণ ওয়াদি উল কুরায়।

স্পেনের ভৌগোলিক অবস্থান.

স্পেন প্রাচীনকালে আইবেরীয় উপদ্বীপ নামে পরিচিত। এটা ইউরোপের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। উত্তর ও পশ্চিমে বিশাল আটলান্টিক মহাসাগর আর দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর এবং পূর্বে পীরেনীজ পর্বতমালা। তিনদিকে বিশাল জলরাশি আর একদিকে পর্বতাকীর্ণ স্থলভাগ বিধায় এটা উপদ্বীপ আকারে যেন আফ্রিকা মহাদেশের শিরোভাগে দাঁড়িয়ে। মাঝে ১৭ মাইলের প্রণালী।[৪] এই বিখ্যাত প্রণালীর নাম জিব্রাল্টার। তখনকার দিনে এই প্রণালী অতিক্রম করেই আফ্রিকার সাথে ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তে সেপনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হোত। এই প্রণালী ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরকে সংযুক্ত করেছে। পর্তুগালসহ স্পেনের আয়তন প্রায় ২,২৯,০০০ বর্গমাইল। এই উপদ্বীপটি পীরেনীজ পর্বতমালা দ্বারা বাদবাকী ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন। পীরেনীজ পবর্তমালার পরেই ফ্রান্স।

স্পেন যদিও আটলান্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগরের পলি বিধৌত তথাপিও উপদ্বীপটা সমতল নয়। অনেক উঁচু নিচু পর্বতমালা এই ভূখণ্ডটিকে অসমতল করে রেখেছে। উত্তরে কান্তাব্রীয় পর্বতমালা এবং উত্তরপূর্ব ও পূর্বে আইবেরীয় পর্বতমালা, দক্ষিণে সিয়েরা মারেনা পবর্তশ্রেণী আর পশ্চিমে গ্যালিশিয়ার উচ্চ মালভূমি। এখানে উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ এবং আদ্র আবহাওয়া বিরাজ করতে থাকায় পার্বত্য এলাকায় বেশ বনভূমি গড়ে উঠেছে এবং উপকূলীয় অঞ্চলে ফল ফসলের যথেষ্ট ভূমিও বিদ্যমান। নদনদীর মধ্যে ডিউরো, তাগুস, গুয়াদিয়ানা, ওয়াদিউল কাবীর বা গুয়াদালকুইভার, জেনিল, এ্যবরো, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পার্বত্য এলাকা, বনভূমি, মালভূমি, শুষ্ক অঞ্চল, এবং ফল ফসলের আবাদী জমি নিয়ে উপদ্বীপটি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। এখানে সীসা, লৌহ, তামা, ম্যাঙ্গানীজ, লবণ, ম্যাগনেশিয়াম, যবক্ষার সিলিকেট প্রভৃতি মূল্যবান ধাতব দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। এখানে বনভূমিতে পাইন, ওক এবং মূল্যবান টিক বা আবলুস কাঠও পাওয়া যায়। তৃণভূমিতে পশুচারণ ক্ষেত্র মওজুদ ছিল।

ফল ফসলের মধ্যে গম, চেরী, আপেল, নাশপতি, বাদাম, আনার, ডুমুর, আঞ্জীর, আখ, কলা, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মশলার মধ্যে যাফরান, মুআসফার, জিরা, ধনিয়া এবং মেহেদী অন্যতম। পশুপাখীর মধ্যে ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল এবং মধুর জন্য মৌমাছি ও পালন করা হোত। পরিবহন, যোগাযোগ, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সামরিক, বেসামরিক চলাচলের জন্য ঘোড়া স্থলে ব্যবহার হোত এবং নদীতে নৌকা ও পাল তোলা জাহাজ ছিল।

ফলে ভৌগোলিক দিক দিয়ে এক বিচিত্র অথচ আকর্ষণীয় দেশ ছিল। পাহাড়, পর্বত, নদ নদী, সমতলভূমি, উপত্যকা, গিরিপথ মালভূমি প্রভৃতি সহ আবহাওয়া, জলবায়ু, উৎপন্ন দ্রব্য এবং জনসংখ্যা সব মিলিয়ে স্পেন উত্তর আফ্রিকায় অবস্থানরত মুসলিম শাসকদের জন্য ছিল আকর্ষণীয় লক্ষ্য বস্তু। উপরন্তু রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় দিকটা ছিল মুসলিম অভিযানের তাৎক্ষণিক কারণ।

---

৪. History of the Moorish Empire in Europe এর লেখক S. P. Scott এর মতে জিব্রাল্টার প্রণালীর একেবারে সরু প্রস্থের দূরত্ব ৮ মাইল (পৃঃ ২০৫ ১ম খণ্ড)

১. ভিসিগথ রাজতন্ত্রের শেষ বীর পুরুষ হল রাজা ওয়ামবা। অতঃপর তার স্থলাভিসিক্ত হয় আরভিজিয়াস। অতঃপর তার জামাতা এযিজা। এযিজার পুত্র উইটিজা। উইটিজা নিহত হলে রাজবংশের বর্হিগত ৮২ বছর বয়স্ক রডারিক ৭০৯ সালে আইবেরীয় উপদ্বীপের সিংহাসন দখল করেন।

বিজয় পূর্বাবস্থা

এই সময় উত্তর আফ্রিকা মুসলমানদের সুশাসনের ফলে উন্নতি ও প্রগতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ন্যায় বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাধারণ নাগরিকগণ জীবনের মূল্য উপলব্ধি করিতে শুরু করে। অন্যদিকে তাহারই প্রতিবেশী রাষ্ট্র স্পেন ছিল গথ রাজা রডারিকের[১] উৎপীড়ণে ও নানা সমস্যায় জর্জরিত। শাসিতের মধ্যে অত্যাচারমূলক ব্যবধানের ফলে উন্নতির পথ ছিল সর্ব দিক হইতে রুদ্ধ। গথগণ তাহাদের পূর্বসূরী রোমানদের অপেক্ষাও ভীষণভাবে দুর্নীতিপরায়ণ ও অত্যাচারী ছিল। খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি তাহাদের আস্থা ও অনুরাগ ছিল এবং ধর্মযাজকদিগকে যথামর্যাদায় আসন দিয়াছিল বটে, কিন্তু সেগুলি ছিল নিছক নিজেদের অপকর্ম ঢাকিবার প্রয়াস মাত্র। ধর্মযাজকগণ জনসাধারণের রক্ষকের পরিবর্তে হইয়া ছিলেন জনগণের পীড়ণের কারণ ও পর ধর্মের প্রতি চরম অসহিষ্ণু। গথগণ দুইশত বৎসরের অধিককাল রাজত্ব চালাইয়াও জনগণের কল্যাণ আনিতে পারে নাই। রাজন্যবর্গ, অমাত্যবর্গ, ধর্মযাজক ও সামন্তশ্রেণীর ক্রমাগত শোষণের ফলে ক্রীতদাস, সার্ফ, বর্গাদার ও ইহুদীগণের মধ্যে সৃষ্টি হয় ত্রাহি অবস্থা। ফলে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা এক চরম ক্রান্তিলগ্নে উপস্থিত হয়।

সামাজিক অবস্থা

এই যুগে স্পেনের সামাজিক অবস্থা ছিল বড়ই করুণ ও হৃদয়বিদারক। এখানে ছিল শাসক ও শাসিত নামে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণী। তাহাদের মধ্যে ব্যবধান ছিল যোজনব্যাপি, সম্পর্ক ছিল প্রভু-ভৃত্য। শাসক শ্রেণীর মধ্যে প্রধানতঃ ছিলেন রাজা, অমাত্যবর্গ, ধর্মযাজক ও সামন্তরাজগণ। অন্যদিকে শাসিতের সারিতে ছিল বর্গাদার সার্ফ, ক্রীতদাস এবং ইহুদীগণ। সমাজের এই বৈষম্যমূলক শ্রেণী বিভেদের বিষময় ফল সমাজদেহকে পীড়িত ও মৃতপ্রায় করিয়া তোলে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে গথ শাসকগণ তাদের স্বার্থ রক্ষার কারণেই ছিল অত্যধিক ধর্মসেবী। আর ধর্মযাজকগণকে সর্বাদিক সুযোগ সুবিধা দিয়া বিশেষ ক্ষমতাশালী করিয়া তোলে। ফলে তাহারা অগাধ ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী হইয়া অনেক সময় রাজাদের উপর বেপরওয়া ভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। শাসক নির্বাচনের কাজটিও তাহারা সময় সময় করিতেন। তাহাদের এই অপরিসীম ক্ষমতা ও বিপুল বৈভবের জন্য মাঝে মাঝে ধর্মীয় অনুশাসনের নামে অনেক অধর্মনীতি জনগণের উপর চাপাইয়া দিতেন। নিষ্ঠুরতা, নির্মম অত্যাচার এবং জীবনের বিনিময়ে অনেক সময় প্রজাদিগকে এই অর্ধম বিধি গ্রহণ করিতে হইত।

রাজা, অমাত্যবর্গ, জোতদার জমিদার ও সামন্তরাজদের সমন্বয়ে গড়িয়া উঠে স্পেনের অভিজাত শ্রেণী। আভিজাত্যের নিদর্শন স্বরূপ তাহারা জীবনকে উপভোগ করিতেন জুয়া, মদ, শিকার, ঘোড়াদৌড় এবং ভুরিভোজের মাধ্যমে। তাহারা বসবাস করিতেন সুরম্য রাজপ্রাসাদে। জাকজমকপূর্ণ পোষাক ও অলঙ্কারে নিজদিগকে মোহনীয়ভাবে সুসজ্জিত করিয়া গর্ব ও দর্প প্রকাশ করিতেন। কিন্তু যাহারা জীবনের বিনিময়ে হাড় ভাঙ্গা খাটুনিতে এই অর্থ, বিত্ত ও দর্প যোগাইত তাহাদের দিকে নজর

দেওয়ার অবসর ছিল না। মেহনতী মানুষের সুখ ও দুঃখের পাশে ঘেষা আভিজাত্যের অবমাননা ছিল। তাহাদের জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুও সরবরাহ করা হইত না। শাসকশ্রেণী বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, ইহাদের সহযোগিতা আর আনুগত্যের উপরই তাহাদের স্থায়িত্ব। এই উপক্ষো আর অবহেলার জন্যই শাসকশ্রেণীকে দিতে হয় চরম মূল্য।

সমাজের মধ্যবিত্ত নয় কিন্তু উচ্চ শ্রেণী আর নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে সীমিত স্বাধীনতায় বারগেছ বা বর্গাদার শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল। তাহারা অনধিক ২৫ একর জমির মালিক ছিলেন। তবে এই জমির হস্তান্তর ক্ষমতা তাহাদের ছিলনা। এই জমিগুলি তাহারা কৃষকদের মধ্যে ফসল উৎপাদনের জন্য দিতেন। কিন্তু অনাবৃষ্টিতে অথবা অতিবৃষ্টিতে ফসল না হইলে বর্গাদারদের নিজেদের পকেট হইতে দেয় অর্থ জমিদারকে দিতে হইত। তাই অনেক সময় বর্গাদার ভূমি ছাড়িয়া সেনাবাহিনীত অথবা অন্য পেশায় জীবিকা অন্বেষণ করিতেন।

সার্ফ বা ভূমিদাস ও ক্রীতদাসরাই ছিল সমাজে সর্বনিম্ন শ্রেণীর মানুষ। ভূমিদাসগণ জমি চাষ ও ক্রীতদাস সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত থাকিতেন। জমি চাষের ও সৈন্য বিভাগের লোক সরবরাহের কঠিন দায়িত্ব তাহাদের উপর ন্যস্ত ছিল। জমির খাজনা ছাড়াও ব্যক্তিগত কর দিতে হইত এবং সামান্য ক্রটিতে দৈহিক নির্যাতনও ভোগ করিতে হইত। সবচেয়ে করুণ অবস্থা এটাই যে জমির সঙ্গে তাহারা ছিল একেবারেই বাধা। জমি বিক্রয় করা হইলে তাহাদিগকে বিক্রিত হইতে হইত। স্বেচ্ছায় তাহারা বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিত না। মনিবের হুকুমের অপেক্ষায় তাহাদের সারাটা জীবনের ইচ্ছা ও শক্তিকে তৈয়ারী রাখিতে হইত।

ক্রীতদাসগণের জীবন ছিল সর্বনিম্নস্তরে। পশুর প্রতিও মানুষের করুণা ও দয়া হয় কিন্তু স্পেনীয় সমাজে ইহাদের জন্য ছিল না এতটুকু অনুগ্রহ। ক্রীতদাসদের দেখিলেই যেন অত্যাচারী জমিদার লাফাইয়া উঠিত অত্যাচার ও আঘাত করিবার জন্য। জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ, দূর দুরান্ত হইতে পানি বহন এবং জমি চাষ করিয়া তাহাদের জীবনের মূল্য দিতে হইত দিবারাত্র পরিশ্রমে। অতএব মানুষের জন্য যে ন্যূনতম প্রয়োজন তাহাও তাহাদের থাকাটা ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। আর্থিক চাহিদার প্রশ্ন অবান্তর এবং জৈবিক চাহিদাকেও নিষ্ঠুরভাবে উপেক্ষা করা হইত।

কেবলমাত্র তাহারা জমি অথবা মালিকের সঙ্গে বাঁধা ছিল তাহা নহে বরং মনিবের বিনা হুকুমে বিবাহ করিলে মনিবগণ পরস্পরের মধ্যে তাহাদের সন্তানগুলি ভাগ করিয়া লইত। মানবতার প্রতি এই নিষ্ঠুর আচরণ ও বৈধ জৈবিক চাহিদার প্রতি নির্মম প্রহসন স্পেনের শোষিত, বঞ্চিত ও হতভাগ্য শ্রেণীর মধ্যে এক দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাহারা অকথ্য জুলুম সহ্য করিয়া অপেক্ষায় ছিল এক চরম বিপ্লবের জন্য। ইহাদের অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের কথা অনেক ঐতিহাসিক করুণ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ভূমিদাস কিংবা ক্রীতদাসের স্বাধীনতার কোন আশাই ছিল না। উপরন্তু তাহাদের কবরেও সূর্যের আলো পড়িবার সুযোগ ছিল না।

অর্থনৈতিক অবস্থা

এক দিকে সাধারণ প্রজাদের সুখ সুবিধার প্রতি সীমাহীন উপক্ষো, অন্যদিকে শিল্প-কারখানা ও কৃষি ব্যবস্থার প্রতি ছিল চরম অবহেলা। বৈষম্যমূলক ধন বন্টন ও নির্যাতনমূলক কর নির্ধারণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পঙ্গু করিয়া তোলে।

উৎপাদনে পুঁজি বিনিয়োগ না করিয়া অর্থের যথেচ্ছা অপচয় ও অপব্যয় করায় অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। শাসকদের খেয়ালী উপেক্ষা আর সীমাহীন অবহেলায় শিল্প কারখানাগুলি দিন দিন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কৃষিক্ষেত্রে আরও অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। সেচ ব্যবস্থা না হওয়ার দরুণ ফসল উৎপাদন চরমভাবে ব্যাহত হয়। তাহাছাড়া নির্যাতন ও পীড়নমূলক কর কৃষককে ভূমি ছাড়িতে বাধ্য করে। অনেকেই করভার সহ্য করিতে না পরিয়া বনে জঙ্গলে পলায়ন করিত। ফলে কৃষিযোগ্য জমি অনাবাদী পড়িয়া থাকিত। এমনভাবে শিল্প ক্ষেত্রেও চরম নৈরাজ্য-বিরাজ করিতেছিল। শিল্প ও কৃষির অবনতিতে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে অধঃপতন নামিয়া আসে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি কল্পে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার এবং বিপদমুক্ত না করিবার ফলে জনগণের চলাচল যথেষ্টভাবে বিঘ্নিত হয়। তাই দেখা যায় যে প্রতিটি অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্র ছিল অব্যবস্থায় পরিপূর্ণ ও চরম সংকটময়।

ধর্মীয় অবস্থা

গথগণ খ্রিস্টান ধর্মকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। শুধু তাই নয়, খ্রিস্টান ধর্মের জন্য তাহারা যত বেশি অসহিষ্ণু ও অত্যাচারী ছিলেন ধর্মে কোথাও সে কথা খুঁজিয়া পাওয়া যায়না। শাসক বা অভিজাত শ্রেণীর সবাই খ্রিস্টান ছিলেন। তাহারা ধর্মের সেবায় পরধর্মকে উচ্ছেদ ও উৎখাত করা ধর্মের কাজ বলিয়া মনে করিতেন। তাহাদের কৃত জঘন্য অপরাধ ও কুকর্মগুলিকে আচ্ছাদন করিবার জন্যই ধর্মের বড় প্রয়োজন ছিল। গথ শাসনে ইহুদিদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। বিপুল সংখ্যক ইহুদী স্পেনে বসবাস করিত। কিন্তু, রাজা ধর্মযাজক ও অমাত্যদের নির্মম অত্যাচারে তাহারা ছিল অতিষ্ঠ। অবিরত নির্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা একবার বিদ্রোহের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কিন্তু এ পরিকল্পনা ফাঁস হইয়া যাওয়াতে তাহাদের সম্পদ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। পাইকারী হারে হত্যার পরিবর্তে ব্যাপকভাবে তাহাদের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করা হয়।

অসংখ্য ইহুদীকে জোরপূর্বক খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। ইহা ব্যতীত মাঝে মাঝে রাজা এই মর্মে আদেশ জারি করিতেন যে, 'হয় তাহাদিগকে খ্রিস্টান হইতে হইবে, নতুবা দেশত্যাগ করিতে হইবে অথবা ক্রীতদাস হইতে হইবে ; ইহার কোন একটা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলে তাহাদিগকে নিহত করা হইবে।' এমনভাবে কতবার যে কত আইন পাশ করিয়া ঘোষণা করা হয় যে, ইহুদীদের জন্য খ্রিস্টান মেয়ে অথবা ছেলে বিবাহ করিতে হইবে। তাহারা আপন ধর্মের ছেলে মেয়ে বিবাহ করিতে পারিবে না। এইরূপ অন্যায় ও বাধ্যতামূলক আইনের দ্বারা বহু ইহুদীকে খ্রিস্টান করা হয়। '৬১২ সাল হইতে ৬২০ সালের মধ্যে ৯০,০০০ ইহুদীকে জোরপূর্বক খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা হয়।[১]

১. S. M. Imamuddin—A Political History of Muslim Spain P–4

এইভাবে খ্রিস্টানগণ ইহুদীদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাইয়া পরধর্মের প্রতি চরম অসহিষ্ণু ও বৈরী মনোভাবের পরিচয় প্রদান করে।

রাজনৈতিক অবস্থা

স্পেনের রাজনৈতিক আকাশ এই সময় মেঘাচ্ছন্ন ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক ত্রুটির ফলে প্রদেশগুলি ছিল প্রায় স্বাধীন। কেন্দ্রে রাজ পরিবারও কলহ এবং বিবাদমুক্ত ছিল না। প্রদেশের সঙ্গে সার্থক ও সর্বক্ষণ যোগাযোগ ছিল নামমাত্র। সামন্তপ্রথার ফলে কেন্দ্রকে কেবল কর যোগানো এবং প্রয়োজনে ইচ্ছামাফিক সৈন্য সরবরাহ করিতে হইত। রাজা রডারিক তাহার পূর্ববর্তী রাজা উইটিজার পুত্র অচিলাকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করেন। তাহা ছাড়া উইটিজার জামাতা কাউন্ট জুলিয়ান ছিলেন সিউটা ও আলজিসিরাসের গভর্ণর। একটি অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া উভয়ের মধ্যে বৈরীতার সৃষ্টি হয়। সমসাময়িক কালের নিয়ম ছিল যে, প্রদেশের গভর্ণর অথবা সামন্তরাজাদের পুত্র কন্যাকে কেন্দ্রীয় রাজধানীতে প্রেরণ করিতে হইত। সম্ভবতঃ ইহার দুইটি কারণ ছিল। গভর্ণর অথবা সামন্তরাজাগণ যাহাতে সহজেই বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে না পারে সেহেতু তাহাদের সন্তানদিগকে রাজার নিকট জামিন রাখিতে হইত। অন্য কারণটি ছিল, রাজকীয় পরিবেশে আদব কায়দা, সৈন্য পরিচালনা ও রাজনীতি সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান ও ধারণা অর্জন করা। তাই কাউন্ট জুলিয়ান তার অসামান্য সুন্দরী কন্যা ফ্লোরিণ্ডাকে রাজধানী তলেদোতে প্রেরণ করেন। রাজধানীতে অবস্থানকালে রাজা রডারিক ফ্লোরিণ্ডার সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন। আপন-কন্যাবৎ জুলিয়ান তণয়ার প্রতি তিনি কামনার বাহু প্রসারিত করেন। এই অসদাচারণ ছিল যেমন গুরুতর অন্যায় তেমনি মর্যাদা হানিকর। এই অপমানজনক ঘটনার বিবরণ দিয়া ফ্লোরিণ্ডা গোপনে তাহার পিতার নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। এমনিতেই কাউন্ট জুলিয়ানের সঙ্গে রডারিকের সম্পর্ক মধুর ছিল না। কারণ নিহত রাজা উইটিজা ছিলেন তাহার আপন শ্বশুর। অতঃপর কন্যার প্রতি অশালীন আচরণে চরম প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দৃঢ় সংকল্প করেন।

ইতিপূর্বে উত্তর আফ্রিকা হইতে স্পেন আক্রমণের প্রচেষ্টা কয়েকবার চালানো হয়। কিন্তু কাউন্ট জুলিয়ানের প্রতিরোধের জন্য অভিযানগুলি সফল হয় নাই। কাউন্ট জুলিয়ান তাই স্থির করিলেন যে মুসলমানদের পরবর্তী স্পেন আক্রমণে তিনি সক্রিয়ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করিবেন এবং রডারিককে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কন্যার ইজ্জতহানির প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। কন্যাকে সিউটাতে আনয়ন করিবার জন্য কাউন্ট জুলিয়ান তলেদোতে উপস্থিত হন। রাজা মনে করিয়াছিলেন যে ফ্লোরিণ্ডা হয়ত তাহার দুর্ব্যবহারের কথা তাহার পিতার কর্ণগোচর করে নাই। তাই তিনি কাউন্টকে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাইলেন। কাউন্টও প্রতিশোধের ইচ্ছা গোপন রাখিয়া রডারিকের প্রতি রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। এই সময় মুসা বিন নুসাইর স্পেন আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলেন এবং সে সংবাদও রাজা রডারিকের অজানা ছিল না। তাই রাজা কাউন্ট জুলিয়ানের নিকট পরামর্শ চাহিলেন কিরূপে মুসলমানদের আক্রমণ হইতে স্পেনকে রক্ষা করা যায়। রাজা কাউন্টের উপর বিশেষ নির্ভরশীল হইয়া পড়েন। কারণ সিউটাই ছিল প্রকৃত স্থান, যেখান

হইতে সার্থকভাবে মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করা যাইতে পারে। রাজা উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী ও বিপুল সমরাস্ত্র দিয়া কাউন্ট জুলিয়ানকে শক্তিশালী করিবার পরিকল্পনার কথাও জানাইলেন। কাউন্ট জুলিয়ান রাজার অগাধ বিশ্বাস ও বিপুল আস্থা লইয়া কন্যাসহ সিউটার পথে প্রস্থান করেন। বিদায় বেলায় রাজা অনুরোধ করিলেন যে, জুলিয়ান যেন তাহাকে শিকারের জন্য বিশেষ ধরনের কতকগুলি বাজপাখী প্রেরণ করেন। জুলিয়ান রাজাকে জানাইলেন যে তিনি তাহার সঙ্গে এমন কতকগুলি শিকারী পাখী আনিবেন যাহা রডারিক জীবনেও কোনদিন দেখেন নাই। এই উত্তরের মধ্যে সুচতুর জুলিয়ান আরব সৈন্যবাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত দিয়াছিলেন।

নিহত রাজা উইটিজার ভ্রাতা অপাস ও পুত্র অচিলা দ্বারা গঠিত একটি শক্তিশালী বিরোধীদল রডারিকের বিরুদ্ধে ছিল। তাহারা প্রতি মুহূর্তেই সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল কেমন ভাবে তাহার বিরুদ্ধে চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করা যায়। তাহা ছাড়া সেনাবাহিনীর সংগঠনও সুবিন্যস্ত ছিল না। কেন্দ্রে রাজার দেহরক্ষী ছাড়া নিয়মিত বাহিনীর প্রথা তখন ছিল না। প্রয়োজনের সময় প্রদেশ হইতে প্রয়োজন মাফিক সৈন্য সংগ্রহ করা হইত। তবে এই প্রথায় যথেষ্ট গলদ ছিল। সংখ্যার দিক দিয়া সৈন্য পাঠানো নির্ভুল হইলেও গুণগত বিচারে ইহা সুষ্ঠু ছিল না। তাই দেখা যায় যে রাজনৈতিক ও সামরিক দিক হইতেও স্পেনের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়।

নিপীড়িত, রিক্ত ও নিঃস্ব নাগরিক, অত্যাচারিত ও দুর্দশাগ্রস্ত ক্রীতদাস, অসহায় সার্ফ এবং নির্মমভাবে নিগৃহীত ইহুদী সকলেই কায়মনোবাক্যে কামনা করিতেছিল কিভাবে কখন তাহারা এ শাসন ও শোষণ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে। কে বা কাহারা তাহাদিগকে এই যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি হইতে উদ্ধার করিবে? সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক দুর্গতি, ধর্মীয় কলুষতা ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং সামরিক শক্তির দুর্বলতার সুযোগে এমন সময় উত্তর আফ্রিকা হইতে মুসলমানগণ স্পেন আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। উত্তর আফ্রিকার শাসনকর্তা ও খ্যাতনামা মুসলিম সেনাপতি মুসা বিন নুসাইর পার্শ্ববর্তী স্পেনের সামগ্রিক অবস্থার সংবাদ রাখিতেন। রডারিকের শাসন ব্যবস্থা ও সামরিক শক্তি সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন সূত্রে অবগত ছিলেন। মজলুম দাসদাসী ও ইহুদীগণও পালাইয়া আফ্রিকায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারাও সেনাপতিকে স্পেন জয় করিবার অনুরোধ জানায়। তাহাছাড়া স্পেন সম্পর্কে বহু আকর্ষণীয় সংবাদ সেনাপতির নিকট আসিত পর্যটক ও স্পেনীয়দের মাধ্যমে। স্পেনের স্বাস্থ্যপ্রদ ও আরামদায়ক আবহাওয়া, শান্ত, স্নিগ্ধ ও দিগন্ত প্রসারী নীলম্বর ; সফেদ গিরিশ্রেণী, সুশোভিত ও বৃক্ষলতায় পরিমণ্ডিত কানন কুঞ্জ, ফল ও ফসল তৃণলতা ; বৃক্ষ উৎপাদনে মৌসুমী বাদলধারা ; প্রবাহমান স্রোতস্বিনী ও স্বচ্ছ ঝর্ণাধারা ; ঋতুরাজ বসন্তের অপরূপ মনোমোহিনী সাজসজ্জা ; প্রাচীন স্থাপত্যশিল্পকলায় ভরপুর মনোরম ইমারতাদি, পীরেনীজ পবর্তমালা বিলম্বিত প্রদেশসমূহ ; অসংখ্য শহর নগর-বন্দর-সব মিলিয়া স্পেন অতুল সম্পদ সম্ভারে ভরপুর হইয়া সেনাপতি মুসা বিন নুসাইরের নিকট বিশেষ আকর্ষণীয় রূপে প্রতিভাত হয়।

উপরন্তু সিউটা অধিপতি কাউন্ট জুলিয়ান রাজা রডারিকের দরবার হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া উত্তর আফ্রিকা সফর করে সেনাপতি মুসা বিন নুসাইরের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ইতিপূর্বে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে তাহার সংঘর্ষ হইয়াছে। কিন্তু এইবার সেনাপতিকে কাউন্ট জুলিয়ান অভাবিতরূপে আশ্বাস দিলেন যে, স্পেন বিজয়ে তিনি তাহাকে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া সাহায্য করিবেন। দীর্ঘদিনের শত্রুর নিকট হইতে এইরূপ তৈয়ারি সুযোগ লাভ করিয়া সেনাপতি একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি কাউন্ট জুলিয়ানের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পর্যালোচনা করেন। অতঃপর দামেস্কের মহাপরাক্রমশালী খলিফা আল ওয়ালিদের (৭০৫-১৫) দরবারে স্পেন আক্রমণের সম্মতি প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করেন। রাজধানী দামেস্ক হইতে যথাসময়ে দূত ফিরিয়া আসিল। খলিফার সম্মতি পাইয়া সতর্ক সেনাপতি মুসা বিন নুসাইর এইবার পূর্ণ উদ্যোমে সৈন্যবাহিনীকে পুনর্বিন্যাস ও সুসজ্জিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। অসংখ্য বার্বার স্বেচ্ছায় আরবদের সঙ্গে সেনাবাহিনীতে যোগ দিল। তাহাদের বিপুল উৎসাহ ও অফুরন্ত উদ্দীপনা মুসলিম বাহিনীকে দ্বিগুণ ভাবে শক্তিশালী করিয়া তুলিল। ইসলামের সুমহান বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া—হয় শাহাদাতের মর্যাদা, নয় গাজীর গৌরব অর্জনের জন্য তাহারা একান্তভাবে নিজেদের নিবেদিত করিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্পেন বিজয়

[**সার সংক্ষেপ :** সূচনা ❑ স্পেন বিজয় ❑ ১ম অভিযান ❑ ২য় অভিযান ❑ জয়যাত্রা অব্যাহত ❑ রাজধানী তলেদোর পতন ❑ সেনাপতি মুসার আগমন ❑ মুসা ও তারিফের স্পেন ত্যাগ ❑ স্পেন বিজয়ের কারণ ❑ ফলাফল ❑ জিজিয়া ❑ শিল্প ও ধর্মীয়।]

১ম অভিযান

সেনাপতি মুসা বিন নুসাইর স্পেনের প্রাথমিক অবস্থা জরিপের জন্য অধীনস্থ সেনানায়ক আবু যারাহ তারিফ বিন মালিক আল মুগাফিরীকে চারশত পদাতিক ও একশত অশ্বারোহী সহ ৭১০ সালে স্পেনে প্রেরণ করেন। চারখানা যুদ্ধ জাহাজ লইয়া তারিফ স্পেনের দক্ষিণ উপকূলে অবতরণ করেন। তাহার অবতরণ স্থান তারিফা নামে পরিচিত।[১] সেনাপতি তারিফ অত্যন্ত যোগ্যতা ও সফলতার সঙ্গে তাঁহার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বহু ধন-সম্পদ সহ উত্তর আফ্রিকায় নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিয়া সেনাপতি মুসাকে জানাইলেন যে, কাউন্ট জুলিয়ানের প্রতিশ্রুতি সত্য। দেশ প্রায় অরক্ষিত। নির্যাতিত প্রজাকূল সকলেই তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত। তবুও সেনাপতি ধীরে অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত লইলেন। অজ্ঞাতভূমিতে সাগর পারে সমগ্র বাহিনীকে একযোগে ত্বরিতে পাঠাইলেন না।

২য় অভিযান

মুসা বিন নুসাইর প্রথমবার অপেক্ষা এইবার আরও একটু বড় আকারে অভিযান প্রেরণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। তাহার যোগ্য লেফটেন্যান্ট তারিক বিন জিয়াদ নামক এক বার্বার নবদীক্ষিত মুসলিম বীরকে সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব দিয়া ৭১১ সালে স্পেনে প্রেরণ করেন।[২] অধিকাংশ বর্বারদের দ্বারা গঠিত এই সেনাবাহিনীর প্রাথমিক সৈন্যসংখ্যা

---

১. এই স্থানটিকে যযিরা আল খাজরাহ বা সবুজ উপদ্বীপও বলে।

২. তারিকের স্পেন অভিযানের তারিখ সম্পর্কে নাফহুত তীব মিন গুশানিল আন্দালুসির রাতীব ওয়া তারিখ লিসানুদ্দীন ইবনুল খাতিব যা আহমদ বিন মুহাম্মদ আল মাককারী লিখিত এবং The History of Mohammedan dynastie in spain নামে ইংরেজীতে লণ্ডন থেকে অনূদিত ও মুদ্রিত তার ১ম খণ্ড ২৬৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে :- অনেক ঐতিহাসিক যেমন ইবনে খালদূন ৯২ হিজরী অক্টোবর ৭১০ খ্রিষ্টাব্দ। ইবনুল খাতিব ৯২ হিজরী ২০শে জুন ৭১১ খ্রিস্টাব্দ, ইবনে হাইয়ান এবং আয যাহাবী বিভিন্ন তারিখের কথা উল্লেখ করেছেন।

ছিল সাত হাজার। পরবর্তীকালে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দশ হাজার তিন শত থেকে বার হাজারে পৌছায়। কাউন্ট জুলিয়ান মুসলিম বাহিনীর সাহায্য স্বরূপ চারখানা যুদ্ধ জাহাজ সরবরাহ করেন। যথাসময়ে সেনাপতি তারিক ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর সংযোগকারী জিব্রালটার প্রণালী অতিক্রম করিয়া স্পেনের পার্বত্য এলাকায় অবতরণ করেন। তাহার অবতরণ স্থান আজও জাবালু তারিক বা তারীকের পাহাড় নামে অভিহিত হইতেছে। তিনি এই স্থানকে ঘাটী হিসাবে সুরক্ষিত করিয়া অগ্রগামী বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। তাহারা কারতিয়া অঞ্চল অধিকার করিয়া জিব্রাল্টার উপকূল দিয়া যাত্রা করেন। স্পেনের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের গভর্ণর থিয়োডমি এই সংবাদে বিচলিত হইয়া রাজা রডারিকের দরবারে মুসলিম বাহিনীর অভিযান সম্পর্কে সংবাদ প্রেরণ করেন। এই সময় রাজা রডারিক রাজধানীতে ছিলেন না। তিনি এই সংবাদ পাইয়া দ্রুত তলেদোতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং প্রদেশের ও সামন্তরাজাদের নিকট সৈন্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বার্তা প্রেরণ করেন। যাহা হউক, সমস্ত সৈন্য একত্রে সমবেত করিয়া তিনি তাহার বিরোধী পক্ষকে জাতীয় স্বার্থে এই দুর্দিনে তাহার সঙ্গে মিলিত হইতে অনুরোধ করেন। তাহারা নাম মাত্র এই আবেদনে সাড়া দেন।

সর্ব সাকুল্যে রাজা রডারিকের নেতৃত্বে এক লক্ষ্য সৈন্য মোতায়েন হইল। অন্য দিকে তারিকের নেতৃত্বে ছিল মাত্র বার হাজার মুসলিম সৈন্য। এই অসম বাহিনী মদিনা সিদোনিয়া শহরের সন্নিকটে লাজান্দা হ্রদের নিকট তীরে ওয়াদিলাক্কো নামক প্রান্তরে পরস্পর শক্তি পরীক্ষায় সম্মুখীন হইল। সৈন্য সংখ্যা অধিক হইলেও মনোবল ও আদর্শের দিক দিয়া মুসলিম বাহিনীর নিকট রাজকীয় বাহিনী ছিল নিতান্তই তুলনাহীন। একদিকে সত্যের সৈনিক, ঈমানের বলে উদ্দীপ্ত, বিজয়ে সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী এবং নির্ভীক মৃত্যুঞ্জয়ী বাহিনী, অন্যদিকে জোরপূর্বক সংগৃহীত ক্রীতদাস ও যুদ্ধে অনভ্যস্ত সৈন্যের দল। মনোবল আর সামরিক দক্ষতায় কত যোজন তফাৎ! ইহা ব্যতীত সমরক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সৈন্যদের উদ্দেশ্যে সেনাপতি তারিক এক উৎসাহব্যঞ্জক ও গুরুত্বপূর্ণ জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। তিনি ঘোষণা করেন— দেখুন, সম্মুখে ইসলামের শত্রু, পশ্চাতে বিশাল বারিধি, আল্লাহর শপথ! পলায়নের কোন উপায় নাই। অমিতবিক্রমে সত্য প্রতিষ্ঠায় ও মজলুম জনতাকে রক্ষার জন্য জেহাদই একমাত্র রাস্তা। যুদ্ধে জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। সৈনিকগণও সেনাপতির ভাষণের উত্তরে জবাব দেয়। জয় না হওয়া পর্যন্ত আমরা জেহাদ চালাইয়া যাইব। কারণ আমরা সত্য প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

অতঃপর সুদীর্ঘ সাত দিন যাবৎ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলিতে থাকে। মুসলিম বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে অনিচ্ছায় যুদ্ধে শরীক অচিলার বাহিনী রণে ভঙ্গ দিয়া হটিয়া যায়। তাহারা স্পেনে মুসলিম শাসন না চাহিলেও রাজা রডারিকের পতন চাহিয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল যে, যুদ্ধে পরাজিত হইলে মুসলিম বাহিনী কিছু ধন-সম্পদ লইয়া উত্তর আফ্রিকায় প্রত্যাবর্তন করিবে। তখন তাহারা স্বচ্ছন্দে সিংহাসন দখল করিয়া রাজ্য শাসন করিতে পারিবে। তাই তাহারা প্রথম আক্রমণেই পরাস্ত হইয়া যায়। মধ্যভাগ রক্ষা করিতেছিলেন স্বয়ং রাজা রডারিক। দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি তাহার সৈন্যবাহিনী লইয়া প্রাণপণ লড়াই করিতেছিলেন। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর ক্রমাগত প্রচণ্ড আক্রমণের

মুখে গথবাহিনী অধিককাল টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। ফলে যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারিত হইয়া যায়। গথবাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পশ্চাদপসারণ করিয়া পলায়ন করিতে শুরু করে। হাজার হাজার সৈন্যের মৃতদেহ রণক্ষেত্রে পড়িয়া থাকে। রডারিক উপায়ান্তর না দেখিয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু তখন ছিল বর্ষাকাল। নদী দুইকূল প্লাবিত করিয়া বিশাল প্রস্থ সৃষ্টি করিয়াছে। রডারিক নৌকাযোগে পলায়নের সময় নদী বক্ষে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ হারাইলেন। এইভাবে ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীর নিকট বিশাল রাজকীয় বাহিনী পরাজয় বরণ করিয়া স্পেনের ইতিহাস পরিবর্তন করে। মুসলিম সেনাপতির সৈন্য পরিচালনার দক্ষতা আর সেনাবাহিনীর বিপুল বিক্রম সত্যই ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি করে।

শত্রু পক্ষের মারাত্মক পরাজয় ও নিজের বিরাট সাফল্যে সেনাপতি তারিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সমগ্র স্পেন জয় করিতে আর বেশি সময়ের প্রয়োজন হইবে না। তবে এখন শুধু প্রয়োজন, কালক্ষেপন না করিয়া সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা। সমস্ত অবস্থা বিশেষ ভাবে পর্যালোচনা করিয়া তিনি অগ্রাভিযানের একটি নক্‌শা প্রস্তুত করেন। এই সময় তিনি উত্তর আফ্রিকায় সেনাপতি মুসার নিকট যুদ্ধের সাফল্য ও স্পেনের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে সংবাদ প্রেরণ করেন। সেনাপতি মুসা তারিকের সাফল্য সংবাদ পাইয়া তাহার নিকট একটি বার্তা প্রেরণ করেন। উহাতে তিনি তারিককে এই মর্মে নির্দেশ দেন যে— তিনিও স্পেনে আসিতেছেন এবং তাহারা পৌঁছানো পর্যন্ত যেন অপেক্ষা করেন। অর্থাৎ সেনাপতি মুসা স্পেনে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত যেন তারিক আর কোন অভিযান না চালান। কিন্তু বিচক্ষণ সেনানায়ক তারিক পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করা সমীচীন মনে করিলেন না। কারণ এই অহেতুক বিলম্বের ফলে পরাজিত খ্রিস্টানগণ হয়ত আবার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ব্যাপক হামলার সুযোগ লইতে পারে।

জয়যাত্রা অব্যাহত

ওয়াদিলাক্কোর বিজয় মুসলিম বাহিনীকে অপূর্ব মনোবল এবং আত্ম-বিশ্বাসের অফুরন্ত অনুপ্রেরণা যোগায়। সৈন্য বাহিনীকে পুনরায় সুসজ্জিত ও নতুন প্রেরণায় উৎসাহিত করিয়া অনধিকৃত অঞ্চলগুলি দখলের জন্য সেনাপতি তারিক অভিযান শুরু করেন। একটি ক্ষুদ্র দলের আক্রমণের মুখে এলভিরা ও আরচিদোনার পতন ঘটে। প্রধান বাহিনীটি অতি দ্রুতগতিতে ইছিজা ও কর্দোভার মধ্য দিয়া গথ রাজধানী তলেদো অভিমুখে অগ্রসর হয়। প্রকৃতপক্ষে ইছিজাতে মুসলিম বাহিনীকে বাধাদান করিবার ক্ষমতা নগরবাসীদের ছিল না। কারণ রাজা রডারিকের পরাজয়ের ফলে সৈন্যদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। সামন্তরাজা ও অন্যান্য শক্তিশালী খ্রিস্টান প্রধানগণ মনোবল হারাইয়া ফেলেন। দেশের সাধারণ জনগণ মুসলমানদিগকে প্রতিরোধের পরিবর্তে সাদরে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। মুগিস নামক এক সেনানায়কের নেতৃত্বে মাত্র ৭০০ অশ্বারোহীর একটি দল কর্দোভা নগরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। নগর প্রাচীরের একটি ছিদ্রের সন্ধান একটি বালকই তাহাদিগকে দেয়। এই ছিদ্রের মধ্যে রশি দিয়া অত্যন্ত কৌশলে এক

নির্ভীক মুসলিম সৈনিক নিশীথে প্রাচীরের উপরে উঠিয়া পড়ে। প্রাচীর পার্শ্বে একটি বৃক্ষের সাহায্যে সৈনিকটি নীচে নামিয়া পড়ে। পরে তাহাকে অনুসরণ করে আরও কয়েক জন সৈনিক। তাহারা একযোগে অকস্মাৎ প্রাচীর দ্বার প্রহরীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। তন্দ্রাচ্ছন্ন দ্বারপ্রহরী ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া আত্মসমর্পণ করে এবং নগরদ্বার অগর্লমুক্ত করিয়া দেয়। মুসলিম বাহিনী এই বার তীরবেগে নগর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। নগরবাসীদের মধ্যে সিটি ম্যাজিসট্রেটের নেতৃত্বে মাত্র চারিশত গোড়া খ্রিস্টান ব্যতীত সকলেই সানন্দে মুসলিম বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। ইহাদের মধ্যে ছিল অত্যাচারিত ক্রীতদাস ভূমিদাস, সার্ফ এবং নির্যাতিত ইহুদিগণ। সেনাপতি মুগিস গীর্জায় আশ্রয়গ্রহণকারী এই চারিশত খ্রিস্টানকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন ; কিন্তু তাহারা সেনাপতির নির্দেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে নাই। ফলে তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এইভাবে কর্দোভা মুসলমানদের দখলে চলিয়া আসে। তৃতীয় বাহিনী পূর্ব স্পেনের মালাগা ও অরিহিউলা জয় করে। থিয়োডমির শাসিত সম্পূর্ণ দক্ষিণ-পূর্ব স্পেন মুসলমানদের দখলে আসে। মুরসিয়ার গিরিবর্ত্মে থিয়োডমির বাহিনী কিছুক্ষণের জন্য মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করিতে থাকে। কিন্তু তাহারা বেশিক্ষণ টিকিতে পারে নাই। মুরসিয়া পতনের পর থিয়োডমিরের আর কোন সৈন্য ছিল না। ফলে তিনি অরিহিউলাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি এক অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করেন। অরিহিউলা নগরের নারীদিগকে পুরুষ সৈন্যের বেশে সজ্জিত করিয়া পূর্ণ সামরিক কায়দায় নগর প্রাচীরের সম্মুখে সারিবদ্ধ করিয়া রাখেন। মুসলিম বাহিনী নগরের অদূরে তাবু স্থাপন করেন। তাহারা অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে নগরটি প্রচুর সৈন্যদ্বারা বেষ্টিত। ইতিমধ্যে থিয়োডমির আর একটি কৌশল অবলম্বন করেন। নিজেই দূতবেশে মুসলিম সেনাপতির নিকট এই মর্মে প্রস্তাব পেশ করেন যে, যদি নগরবাসীর জানমাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হয়, তবে আগামীকল্য মুসলিম বাহিনীর নিকট নগর অর্পণ করা হইবে। আর যদি এই শর্তপূরণে দ্বিমত করা হয়, তবে নগরের একটি লোকও পর্যন্ত জীবিত থাকিতে যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া হইবে। মুসলিম সেনাপতি সর্বদা রক্তের পরিবর্তে আনুগত্য ও জুলুমের পরিবর্তে ইনসাফ পছন্দ করিতেন, তাই দূতের প্রথম প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করেন। পরদিন প্রভাতে সেনাপতি সসৈন্যে যখন নগর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন তখন তার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। ভগ্ন অস্ত্র হাতে থিয়োডমির ও তাহার একান্ত সঙ্গী ছাড়া আর কোন সৈনিকের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। আর তাহারই পার্শ্বে দণ্ডায়মান অগণিত বৃদ্ধ মহিলা ও শিশুর দল। সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার সেনাবাহিনী কোথায়, যাহারা রাতে দুর্ভেদ্য বূহ্য রচনা করিয়া নগর রক্ষায় ছিল ? উত্তরে থিয়োডমির তাহার সব ঘটনা বিবৃত করিলেন। থিয়োডমির বীরোচিত পদক্ষেপ ও কৌশলে মুগ্ধ হইয়া সেনাপতি তাহাকে মুরসিয়ার গভর্ণর পদে নিয়োগ করেন। বীরের উপযুক্ত মর্যাদা দান করিয়া তিনি উদারতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। থিয়োডমিরের নামানুসারে মুরসিয়া প্রদেশ তুদমির নামে অভিহিত হয়।

রাজধানী তলেদোর পতন

মুরসিয়া ও অরিহিউলা অধিকার করিয়া সেনাপতি তারিক গথ রাজধানী তলেদো আক্রমণ করেন ও প্রায় বিনা বাধায় রাজধানী অধিকার করেন। কারণ রাজন্যবর্গ ও অভিজাত শ্রেণী মুসলিম বিজয় বাহিনীর দুর্বার অগ্রাভিযানে ও অপূর্ব সাফল্যে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন। ফলে মুসলিম বাহিনীর আগমন বার্তায় তাহারা রাজধানী ছাড়িয়া আজতুরিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নগরে ছিলেন কেবল মাত্র ইহুদীগণ, উইটিজার পুত্রগণ ও দলবল এবং কাউন্ট জুলিয়ান। ইহারা ছিলেন সম্ভবতঃ নগর সমর্পণের দায়িত্ব পালনের জন্য। তারিক নগরে প্রবেশ করেন বিনা বাধায়। তারপর তিনি ইহাদের সঙ্গে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করেন। রাজধানী অধিকারের পর মুসলিম বাহিনী প্রচুর ধন-রত্ন লাভ করেন। তাহারা একটি গীর্জার মধ্য হইতে ২৪টি মহামূল্যবান স্বর্ণের রাজ-মুকুট উদ্ধার করেন। হযরত সুলাইমানের (আঃ) কথিত মূল্যবান টেবিলটাও হস্তগত করেন মুসলিম সেনাপতি। রাজধানী অধিকার করিবার পর মুসলিম বাহিনীর আনন্দের সীমা রহিল না। কারণ এখন অনধিকৃত অঞ্চলগুলি দখল করিবার জন্য খুব বেশি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হইতে হইবে না।

সেনাপতি এইবার বিজিত অঞ্চলে সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য দৃষ্টি নিবন্ধ করেন। পদমর্যাদা ও যোগ্যতা অনুসারে তিনি গথরাজ বংশীয়দিগকে শাসন কার্যে নিয়োগ করেন। উইটিজার পুত্র অচিলাকে মুসলিম শাসনের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য সাপেক্ষে তলেদোতে তাহার পূর্ব রাজ্য শাসনের অনুমতি প্রদান করেন। বিশপ অপাসকে তলেদোর গভর্ণর এবং কাউন্ট জুলিয়ানকে সিউটার গভর্ণর নিয়োগ করেন। অন্যান্য অঞ্চলে যোগ্য, অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিদিগকে শাসন ক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। এইভাবে প্রায় অর্ধেক স্পেন বিজয় সমাধা করিয়া খলিফা আল ওয়ালিদের রাজ্য সীমানা সুদূর ইউরোপ ভূখণ্ডে বিস্তৃত করেন। স্পেনের অবশিষ্ট অনধিকৃত অঞ্চলগুলি মুসা বিন নুসাইয়ের সংযুক্ত বাহিনী দ্বারা অধিকৃত হয়।

সেনাপতি মুসার আগমন

সেনাপতি তারিকের বিজয়পর্ব সমাধা করিবার মানসে আঠার হাজার সৈন্যসহ সেনাপতি মুসা বিন নুসাইর ৭১২ সালে স্পেনে আগমন করেন। সিউটার গভর্ণর কাউন্ট জুলিয়ানও তাহার সঙ্গে বিজয় অভিযানে যোগদান করেন। সেনাপতি মুসা আন্তরিকভাবে সেনানায়ক তারিকের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ ও রুষ্ট হন। কারণ তাহার নির্দেশ তারিক পালন করেন নাই। উপরন্তু এত বড় একটা দেশ জয়ের একক গৌরব তাহারই অধীনস্থ তারিক লাভ করিয়াছে অথচ তিনি ইহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। এই বঞ্চনার ক্ষোভে তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ। যাহা হউক, তিনি তাহার বিশাল বাহিনী লইয়া অনধিকৃত অঞ্চলগুলি জয় করিয়া তলেদোর দিকে অগ্রসর হইলেন। পূর্বাঞ্চলের পথ ধরিয়া তিনি কারমোনা, সেভিল, নিয়েবলা, বেজা এবং মেরিদা জয় করিয়া রাজধানী তলেদোতে উপস্থিত হন। সেনাপতি মুসা বিন নুসাইরকে উপযুক্ত মর্যাদা সহকারে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিবার জন্য সেনানায়ক তারিক পূর্ব হইতে তলেদোতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই দুইজন

খ্যাতনামা বীরের সাক্ষাৎ আনন্দ মুখর পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে নাই। এই সাক্ষাৎ এক দুঃখজনক করুণ চিত্র তুলিয়া ধরে। সেনাপতি মুসা তারিককে তাহার আদেশ অমান্যের জন্য বেত্রাঘাত করেন। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রবল বিক্রমশালী বীর তারিক সামরিক শৃংখলার প্রতি নজীরবিহীন শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া নীরবে শাস্তি গ্রহণ করেন। ইচ্ছা করিলে তিনি বিদ্রোহী হইয়া নেতার প্রতি অস্ত্র উত্তোলন করিতে পারিতেন এবং সে শক্তিও তাহার ছিল। কিন্তু ইসলামের মহান শিক্ষায় দেশ বিজয়ী বীরের অন্তর পূর্ব হইতেই বিজিত ছিল। সম্ভবতঃ ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) ও সেনাপতি খালিদ বিন অলিদের ঘটনা তাহার নিকট চিরভাস্বর ছিল। সময়, সুযোগ, অবস্থা ও পরিস্থিতির আনুপূর্বিক ঘটনার গুরুত্ব সবিস্তারে বর্ণনা করিলে উভয়ের মধ্যে আন্তরিকতা ও স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। উভয়ের বাহিনী একত্রিত করিয়া দুই বিখ্যাত অপরাজেয় সেনাপতি পুনরায় বিজয় অভিযান শুরু করেন। মুসলিম বাহিনীর সাফল্যের অপ্রতিহত গতি রোধ করিবার মত শক্তি স্পেনের ছিল না। তাই তাহারা একের পর এক আরাগন, সারাগোসা, তারাগোনা, বারসিলোনা, প্রভৃতি নগরগুলি অতি সহজে অধিকার করেন। এই সম্মিলিত বাহিনী এতদূর সাফল্য অর্জন করে যে, মাত্র দুই বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে সমগ্র স্পেন জয় করিয়া পীরেনীজ পর্বতমালা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। কয়েক বৎসর পর পর্তুগাল বিজিত হয় এবং ইহা আল গারব নামে একটি পৃথক প্রদেশ রূপে গঠিত হয়। আস্তরিয়ার পার্বত্য অঞ্চলেই খ্রিস্টান স্পেনীয়গণ কেবল মুসলমানদের মোকাবেলা করে।[১]

---

১. আন্দালুসিয়ার অন্যতম বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে হাইয়্যান (৯৮৭-১০৭০) যিনি স্পেনের খলিফা মুহাম্মদ (২য়) সহ মোট ১০ জন খলিফার খিলাফত কাল প্রত্যক্ষ করেছেন এবং উমাইয়া খিলাফত অবসানের পর কর্দোবাতে স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজবংশ বনু জাওহারের শেষ অবধি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ লাভ করেছেন। অর্থাৎ সুদীর্ঘ ৮৪ বছর ব্যাপী হায়াত নিয়ে স্পেনের অতীত গৌরব আর সমকালীন ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী রূপে ইতিহাস রচনার অপূর্ব সুযোগের যথার্থ ব্যবহার করে জগতবাসীকে ইউরোপে মুসলিম বিজয় কাহিনীর একটা নিখুঁত চিত্র উপহার দিয়ে প্রশংসনীয় ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন। তার রচিত জগত বিখ্যাত গ্রন্থ "কিতাব আল মাকতাছি ফি তারিখ রিজাল আল আন্দালুস" ১০ খণ্ডে সমাপ্ত এবং আল মাতিন ৬০ খণ্ডের এক বিস্ময়কর বিশ্বকোষ।

এই বরেণ্য ঐতিহাসিক ইবনে হাইয়্যানের আর অন্য ঐতিহাসিকদের উদ্ধৃতি দিয়ে ঐতিহাসিক আহমদ বিন মুহাম্মদ আল মাককারী (মৃ. ১৬৩১) তার রচিত "নাফ আত তীব মিনগুসানিল আন্দালুসির রাতীব ওয়া তারিক লিসানুদ্দিন ইবনুল খাতিব" যা ইংরেজীতে The History of Mohammedan dynasties in Spain নামে লণ্ডন থেকে ২ খণ্ডে অনূদিত ও প্রকাশিত গ্রন্থে সেনাপতি মুসা বিন নুসাইর ও তার অধীনস্থ সেনানায়ক তারিক বিন জিয়াদের মধ্যে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে সে সম্পর্কে বলেন :- যখন তারিক দ্রুত গতিতে রাজা রডারিককে পরাজিত করে গোটা গথরাজ্যের শক্তিকে পর্যুদস্থ করেন তখনই তিনি তার হুকুমদাতা সেনাপতি মুসা বিন নুসাইরকে এ মর্মে অবহিত করেন যে দয়াময় মহান আল্লাহ তার সেনাবাহিনীকে এই বিজয়ের তাওফীক দান করেছেন। এ সংবাদ পেয়ে এই অভাবিত বিজয়কে ধন্যবাদ জানানোর পরিবর্তে বেশ ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেন সেনাপতি মুসা। একটি নতুন দেশ বিজয়ের একক গৌরব এবং অজস্র মালে গণিমাত হতে তিনি যেন বঞ্চিত হচ্ছেন আর তার জন্য কিছুই আর অবশিষ্ট রইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ সংবাদ পাঠাইলেন যে তার অনুমতি ছাড়া সে এমন একটা বড় ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান করেছে এবং তিনি না আসা পর্যন্ত যেন যেখানে সে আছে সেখানেই অবস্থান করে। মুসা ত্বরিত গতিতে উত্তর আফ্রিকার শাসনভার তার পুত্র আব্দুল্লাহর উপর অর্পণ করে অপর তিন পুত্র আব্দুল আজিজ, আব্দুল আলা ও

গ্যালিসিয়া দখলের ভার সেনানায়ক তারিকের উপর অর্পণ করিয়া মুসা বিন নুসাইর ফ্রান্স বিজয়ের মহাপরিকল্পনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। গথদের অধিকৃত ল্যাংগুডক তিনি অতি সহজেই দখল করেন। অতঃপর স্পেন ও ফ্রান্সের প্রাকৃতিক বিজয়ের দুর্বার বাসনায় অস্থির হইয়া পড়েন। তাহার দুর্বার গতি ও অনড় মনোবল এবং বিপুল সেনাবাহিনী তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে আশাতীত সাহায্যে উদীপ্ত করে। কারণ ক্ষয়িষ্ণু খ্রিস্টান শক্তির একতা ও সমন্বয়ের অভাবে বিজয় নেশায় উন্মত্ত উদীয়মান মুসলিম শক্তিকে প্রতিহত করিবার কেহই ছিলেন না সম্ভবত। কিন্তু সেনাপতি মুসাকে সেই সুবর্ণ সুযোগ হইতে নিদারুণভাবে বঞ্চিত করে দামেস্কের অদূরদৃষ্টিমূলক বৈদেশিক নীতি। মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃতির এমন একটি উজ্জ্বলতম ভবিষ্যত বিনষ্ট হয়।

সেনাপতি মুসা নারবোঁ, এভিজোঁন এবং লিওন অধিকার করেন। কিন্তু হেরিষ্টলের পেপিন শেষোক্ত শহর দুইটি পূর্ণদখল করিয়া নারবোঁ অবরোধ করেন। তবে অবরোধ করিলেও ইহা দখল করা তাহার পক্ষে দুরুহ ছিল। তাই খ্রিস্টান জগতের নরপতিদের সাহায্য কামনা করিয়া তিনি পত্র প্রেরণ করেন এবং রোন নদীর উপকূলীয় দুর্গ ও নগরগুলি সুরক্ষিত করিতে থাকেন। সেনাপতি যখন এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় আপন কর্তব্য নির্ধারণে ব্যাপৃত ঠিক এমনি সময়ে ফ্রান্স অভিযান বন্ধ করিয়া দামেস্ক অভিমুখে যাত্রার নির্দেশনামা লইয়া খলিফার পত্র তাহার নিকট আসিল। অগ্যতা সেনাপতি স্পেনের উত্তর পশ্চিম পার্বত্য এলাকার দিকে নজর দিলেন। সেখানে বহু স্পেনীয় পলাতক খ্রিস্টানরা আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমরসজ্জা গ্রহণ করিতেছিল। গ্যালিসিয়ার মধ্য দিয়া লিওন দুর্গ ও লোগো প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করিয়া শত্রুদেরকে বিতাড়িত করেন আস্তরিয়ার পার্বত্য

মারওয়ান এবং হাবিব বিন আরদাহ ফিহ্‌রীকে সংগে নিয়ে ৯৩ হিজরী রামাযান মাসে ৭১২ সালে আগস্ট মাসে অন্য বর্ণনায় ঐ একই সালের রজব ও জুন মাসে স্পেনে উপস্থিত হন। তার সাথে সেনা বাহিনীর সংখ্যা কেউ বলেন ১০ হাজার অন্য বর্ণনায় ১৮ হাজার ছিল। তার সাথে অনেক তাবেঈ ছিলেন। তার নিকট এটাও সংবাদ এল যে তারিক ইতিমধ্যে স্পেনের অনেক শহর নগর দখল করে বিপুল যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করেছেন। এ সংবাদে সেনাপতি মুসা ক্ষিপ্ত হয়ে তার আদেশ অমান্যের জন্য তাকে কঠোর শাস্তিদানে কৃতসংকল্প হন। স্পেনে তার অবতরণ স্থল জাবাল-মুসা বা মুসার পর্বত নামে পরিচিত। কাউন্ট জুলিয়ানের বিশ্বস্ত কতিপয় পথ নির্দেশক মুসাকে জানায় যে তারিক যে পথ ধরে বিজয় বহর নিয়ে গেছে সে পথ ছাড়া অন্য পথে এমন এমন নগর শহর ও বন্দর দিয়ে তারা সেনাবাহিনী নিয়ে যাবেন যে শহরগুলি অধিক জনবহুল ও সম্পদশালী। সে অঞ্চলগুলি এখনও বিজিত হয়নি। আল্লাহ চাহে তো এ অঞ্চলগুলি তারই করতলগত হবে। পথ নির্দেশকের নির্দেশনায় সেনাপতি মুসা সিদোনিয়ার পথ ধরে কারমোনা, সেভিল, বেজা, মেরিদা, নিয়েবলা বিজয় করে তিনি রাজধানী তলেদো অভিমুখে যাত্রার সংবাদ তারিককে প্রেরণ করেন। যথারীতি সেনানায়ক তারিক তার সেনাপতিকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তার উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার সহ তলেদো হতে যাত্রা করে তালাভেরা জিলায় এসে সেনাপতি মুসা বিন নুসাইরের সাথে মিলিত হন। সেনাপতি মুসাকে দেখা মাত্রই তারিক তার ঘোড়া থেকে নেমে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন। অত্যন্ত রুষ্ট ভীষণ ক্ষিপ্ত ও ঈর্ষান্বিত সেনাপতি মুসা তার আদেশ লংঘনের অপরাধে তাৎক্ষণিকভাবে তারিককে বেত্রাঘাত করে সকলের সম্মুখে লাঞ্ছিত করেন এবং তলেদোতে নিয়ে সমস্ত যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ হাজির করার হুকুম দেন। বিশেষ করে গথরাজধানী তলেদোতে রক্ষিত নবী সুলাইমান বিন দাউদ (আঃ)-র নামে কথিত অত্যন্ত মূল্যবান হিরাজহরত মণি মুক্তাখচিত টেবিলটি অবিলম্বে তার সামনে আনতে হুকুম করেন। মূল্যবান পাথর স্বর্ণ রৌপ্য হিরাকাঞ্চন খচিত এ টেবিলটি আদৌও হযরত সুলাইমানের নয়। বরং এটা গথরাজাদের যুগযুগ ধরে সঞ্চিত সম্পদের একাংশ দ্বারা গীর্জার পাদ্রীদের অভিপ্রায়ে নির্মিত এবং হযরত সুলাইমানের নামে কথিত

এলাকায়। পিলায়েও ব্যতীত সমগ্র অঞ্চলটাই মুসলমানদের দখলে আসে। এই আস্তরিয়া ও পিলায়েও অঞ্চল দুইটি অনধিকৃত থাকিবার ফলে পরে মুসলমানদিগকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়। পরবর্তীকালে মুসলমানদের পতনের কারণ হিসাবে এই দুইটি দুর্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সেনাপতি মুসা ও তারিকের স্পেন ত্যাগ

সেনাপতি মুসা ও তারিকের স্পেনের অবস্থানকাল যথাক্রমে ২ বছর ৪ মাস ও ৩ বছর ৪ মাস ছিল। ৭১৩ সালে তাহারা দামেস্কের খলিফা আল ওয়ালিদের গুরুতর পীড়ার সংবাদে দ্রুত সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। স্পেন হইতে বিদায় গ্রহণকালে সদ্য বিজিত রাজ্যে সুশাসন কল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সেনাপতি মুসা আপন পুত্র আবদুল আজিজকে স্পেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সেভিলকে রাজধানী নির্বাচিত করিয়া শাসন ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। তাহার অন্যান্য পুত্রগণও বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। তাহাদিগকেও তিনি দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করেন। ইহাদের মধ্যে আবদুল্লাহকে আফ্রিকায় এবং আবদুল মালিককে মরক্কোতে গভর্ণরের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তানজিয়ারকে সদর দফতর করিয়া উপকূল ও নৌবাহিনীর যুক্ত দায়িত্বভার অর্পণ করেন পুত্র আবদুস সালেহকে। এইভাবে নববিজিত স্পেনে শাসনভার যোগ্যহস্তে সমর্পণ করিয়া তাহারা স্পেন ত্যাগ করেন।

স্পেন বিজয়ের কারণ

স্পেনের রাজনৈতিক গোলযোগ ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে ভীষণভাবে দুর্বল করিয়া দেয়। উইটিজা হত্যা করিয়া রডারিক সিংহাসন দখল করেন। ইহাতে উইটিজার

এই টেবিল। এত স্বর্ণ রত্ন মণিকাঞ্চন দ্বারা সুশোভিত এ টেবিলটা তারিকের হাত ছাড়া হবে যখন তার সেনাপতি এটা পেতে চাইবে এবং তিনি তা দিতে বাধ্য হবেন অথচ এর একটা নিদর্শন তার থাকা প্রয়োজন তাই তিনি টেবিলের একটা পায়া খুলে রাখেন গোপনে। অতঃপর মুসার হুকুম তামিল করে তিনি তিন পায়া বিশিষ্ট টেবিলটি তারই সামনে হাজির করে বলেন যে এটা তিন পায়াই পেয়েছেন। অতঃপর সেনাপতি মুসা খাটি স্বর্ণ দিয়ে অবশিষ্ট চতুর্থ পায়াটি টেবিলের সাথে সংযোজন করেন। মুসা তারিককে কারারুদ্ধ করেন এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দিবার পরিকল্পনাও করেন। ইত্যবসরে এ ঘটনা খলিফা আল ওয়ালিদের গোচরীভূত হওয়ায় খলিফা তাৎক্ষণিকভাবে দূত প্রেরণ করে তারিককে মুক্ত করে পূর্বপদে বহালের নির্দেশ দেন। সেনাপতি মুসা খলিফার নির্দেশ পালন করেন এবং তারিকের সাথে খুবই ভাল ব্যবহার করে যৌথ কমাণ্ডসহ স্পেনের অবশিষ্ট অঞ্চলগুলি বিজয় করেন। স্পেন বিজয় সমাপ্ত করে এই বিজয়ী বীরদ্বয় যখন দূলঙ্ঘ্য পীরেনীজ পর্বতমালা অতিক্রম করে দক্ষিণ ফ্রান্সের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ বিজয় পূর্বক সমগ্র ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী ইংল্যাণ্ড হয়ে কনষ্টান্টিনোপল অর্থাৎ বাইজানটাইন রাজধানী বিজয় সমাধা করে বসফোরাস প্রণালী পার হয়ে ইউরোপ থেকে এশিয়ায় এসে পাশ্চাত্য পদানত করে প্রাচ্যের গৌরব গর্বের পতাকা নিয়ে দামেস্কে উপনীত হবার দূর্বার সাধ ও পরিকল্পনায় নিয়োজিত তখনই খলিফা আল ওয়ালিদের নিকট হতে বার্তা এল— আর অগ্রসর হয়োও না— অবিলম্বে ফিরে এস রাজধানী দামেস্কে— খলিফা মৃত্যু শয্যায়। এত বড় একটা সুযোগের, এত বড় একটা বিস্ময়কর কীর্তি সম্পাদনের সুবর্ণ আশা তিরোহিত হল। মুসলিমগণ চিরদিনের মত জিব্রাল্টার প্রণালী পাড়ি দিয়ে বিজয়ী বেশে সমগ্র ইউরোপের চাবিকাঠি নিয়ে বসফোরাস পার হয়ে সিরিয়ায় আসতে পারল না।

ভাতষ্পুত্র, জামাতা এবং অন্যান্যরা রডারিকের শত্রু হইয়া পড়ে। তাহারা রাজাকে কোন ক্রমেই ভাল চোখে দেখিত না এবং সুযোগমত তাহাকে উৎখাত করিবার পরিকল্পনায় ছিল। রাজধানীতে এইরূপ সংঘাতমত পরিবেশে প্রশাসনিক ক্ষমতার সংহতি যৎসামান্য ছিল। ইহা ব্যতীত রাষ্ট্রে সুষ্ঠু ও সুসংগঠিত সৈন্যবাহিনীও ছিল না। প্রয়োজনের তাগিদে সময়ে সময়ে যে সৈন্য সংগৃহীত হইত তাহার মান ছিল নিম্নস্তরের। উৎপীড়িত ও নির্যাতিত দাসদিগকে সৈন্য বাহিনীতে জোরপূর্বক ভর্তি করা হইত। তাহাদের উপর খুব ভাল ব্যবহার করা হইত না। ফলে দেশপ্রেম ও স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ, সেনাবাহিনীতে এই দুইটি মৌলিক গুণের অভাব তাহাদের মধ্যে ছিল। সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ শৃংখলা ও ঐক্যেও অভাব ছিল যথেষ্ট। ফলে এক লক্ষের এক বিশাল বাহিনী বার হাজারের এক ক্ষুদ্র দলের নিকট ভীষণভাবে পরাজিত হইয়া দেশরক্ষায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিল।

অকথ্য নির্যাতনে নিষ্পেষিত ক্রীতদাস, সার্ফ, বর্গাদার ও ইহুদীগণ এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য বহুদিন হইতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিল। খ্রিস্টানগণ শাসনে তাহারা ছিল সমাজের সর্বনিম্নস্তরের বাসিন্দা। মানুষের সামান্যতম প্রয়োজনকেও অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে উপেক্ষা করা হইত। তাই অবর্ণনীয় জুলুমের শিকার মজলুম ও অসহায় জনগণ এই শাসনের অবসানের জন্য মনে প্রাণে কামনা করিতেছিল। তবে এই শাসনের অবসান বিদেশী কি স্বদেশী শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে তাহা বিবেচনা বা দেখিবার মত অবস্থা ইহাদের ছিল না। কারণ মানুষের মত বাঁচিবার অধিকার যেখানে নাই সেখানে এইরূপ চিন্তার অবকাশই বা কোথায়। তবে তাহারা পূর্ব হইতে বিদেশী মুসলমানদের সুশাসন সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত ছিল। তাই তাহারা তাহাদের সীমিত সাধ্যে মুসলমানদিগকে ত্রাণকর্তারূপে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন জানায়।

খলিফা আল ওয়ালিদ কর্তৃক সেনাপতি মুসা বিন নুসাইরকে উত্তর আফ্রিকার গভর্ণর করা স্পেন বিজিত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। মুসা যখন নূতন দায়িত্বভার লইয়া আফ্রিকায় উপস্থিত হইলেন তখন উত্তর আফ্রিকার অধিবাসী বার্বারগণ তাহাকে সহজভাবে লইতে পারে নাই। কিন্তু সেনাপতি মুসা ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি দুর্দ্ধষ বার্বার জাতির মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলেন অপূর্ব সামরিক প্রতিভা অফুরন্ত সাহস ও অসাধারণ উৎসাহ। তিনি সুযোগ বুঝিয়া তাহাদের প্রতি মধুর, সহানুভূতি সম্পন্ন ও ভ্রাতৃসুলভ ব্যবহার করিয়া তাহাদের অন্তর জয় করেন। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ইসলামের বাণী প্রচার করিয়া তাহাদিগকে সত্যের জন্য জেহাদী জাতিতে পরিণত করেন। আরব সেনাবাহিনীতে বহু বার্বার রণনিপুণ যোদ্ধাকে যোগ্য পদ মর্যাদা প্রদান করেন। ইহাদের মধ্যে তারিক বিন জিয়াদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহার অফুরন্ত উদ্যম ও তুলনাহীন সমর শৌর্য্য সেনাপতি মুসাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। ফলে তাহাকে তিনি নিজের সহকারী সেনাপতি রূপে নিযুক্ত করেন। স্পেন বিজয়ী সেনাবাহিনীর মধ্যে অধিকাংশই ছিল বার্বার সৈন্য এবং তাহাদের বাহুবল ও রণনিপুণতাই স্পেন বিজয়ের মূল কারণ।

ভৌগোলিক কারণও মুসলিম বিজয়ের সহায়ক ছিল। উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র ১৭ মাইল বিশিষ্ট একটি প্রণালী। স্পেন ও উত্তর আফ্রিকার মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য যাতায়াত ও তথ্যাদি আদান প্রদানে তেমন কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না।

তাহা ছাড়া মুসলিম বাহিনীর অভিযান অন্যদিকে চালাইবার উপায় ছিল না। কারণ একদিকে দিগন্ত প্রাসরী সাহারা মরুভূমি ও অন্যদিকে অথৈ বারিধি আটলান্টিক মহাসাগর। ফলে স্বভাবতঃই স্পেনের দিকে অভিযান পরিচালনা একমাত্র লক্ষ্য ও বিজয় সহজসাধ্য হইয়া পড়ে।

সর্বোপরি ইসলামের বীর মোজাহিদগণ হক ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের মূলমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া স্পেনের মজলুম জনগণকে উদ্ধার করিবার মাসনে দৃঢ় ও মজবুত ছিল যে বিরুদ্ধ পক্ষের শতগুণ শক্তিকে তাহারা তরবারির আঘাতে বিধস্ত করিয়া দেয়। যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রু সেনার মোকাবেলায় তাহাদের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেরণা ছিল—মৃত্যু হইলে শাহাদাতের মর্যাদা আর জয়ী হইয়া জীবিত থাকিলে গাজীর সম্মান লাভ। তাই দুর্বার গতিতে ছুটিয়া গিয়াছিল তাহারা স্পেন ভূমিতে, বুকে কোরআন, মুখে কলেমা আর হাতে তলওয়ার ও ঝাণ্ডা লইয়া। ফলে অত্যাচারী জুলুমকারী গথ রাজশক্তির পতন হইয়া রাজধানী তলেদোর প্রাসাদ শিখরে উড্ডীন হয় ইসলামী নিশান।

ফলাফল

মুসলমানদের স্পেন বিজয় ইউরোপের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে আনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই বিপ্লব সমগ্র ইউরোপে সৃষ্টি করে অভিনব জাগরণ। যুগ যুগান্তরের ধর্মযাজক ও অভিজাত শ্রেণীর অন্যায় ও অত্যাচারের দীর্ঘ কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। ন্যায় ও সাম্যের ছকে গড়িয়া উঠে নূতন সমাজ। শোষণ বঞ্চনা আর জুলুমের অবসান হইয়া জনগণ পায় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা আর স্ব স্ব ধর্ম পালনের অবাধ অধিকার। শুধু তাহাই নহে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও জনগণ নূতন জীবনের পথ আবিষ্কার করে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ন্যায়সংগত ভাবে স্বীকৃত হয়। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি বিধান কল্পে নূতন নিয়ম পদ্ধতির প্রচলন হয়। মেরিদা ও তুদমিরবাসীর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নূতন নিয়মে পুরাতন মালিকদের হাতে প্রত্যার্পণ করা হয়। কৃষিযোগ্য ভূমির উপর রাজস্ব কর উৎপন্ন শস্যের এক দশমাংশ হারে ধার্য করা হয়। কিন্তু যে সমস্ত খ্রিস্টান মুসলমানদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া পরাজিত হয় এবং দেশ ত্যাগ করে অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনা হয় ; পরে এই সম্পত্তিগুলি ৪/৫ অংশ লোকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। আর বাকী ১/৫ অংশ সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। এইভাবে স্পেনের সমাজে প্রথম বারের মত সার্ফ বা ভূমিদাসগণ জমি হস্তান্তর করিবার অধিকার লাভ করে। ইতিপূর্বে তাহারা অন্যায়ভাবে এই মানবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। শোষণের জন্য রোমানগণ অথবা গথগণ যুগ যুগ ধরিয়া কেহই তাহাদের এই ন্যায্য অধিকার দেয় নাই। স্পেনে পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় ও সাধারণ সম্পত্তির খাজনা উৎপন্ন শস্যের ১/৫ হারে প্রদত্ত হইত। তবে সকল সময়ের জন্য এই আইন বলবৎ ছিল না। সময়ে সময়ে এই আইন পরিবর্তন করা হইত। খাজনা নির্ধারণ করিবার সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হইত যে, জনগণের কর দেওয়ার ক্ষমতা কতটুকু। অর্থাৎ ইসনাফের উপর ভিত্তি করিয়া খাজনা ধার্য করা হইত। স্পেনের রাজস্ব বা ভূমিকর মুসলমান ও অমুসলমান প্রত্যেককে দিতে হইত।

জিজিয়া বা নিরাপত্তা কর

অমুসলমানদের সামরিক বাহিনীতে যোগদানের পরিবর্তে তাহাদের জানমাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তার জন্য সামর্থানুযায়ী এই কর ধার্য করা হইত। ইহা ১২ দিরহাম হইতে ৪৮ দিরহামের মধ্যে সীমিত ছিল। বৎসরে বার কিস্তিতে এই কর পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা ছিল। সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এই জিজিয়া কর। যাহাদিগকে এই কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা হইল দরিদ্র, দিন মজুর, সাধু সন্যাসী, ধর্মযাজক, পুরোহিত, রুগ্ন, বৃদ্ধ, বালক, শিশু, মহিলা, অন্ধ, খঞ্জ, মুক, বধির, পাগল ও ক্রীতদাসগণ।

শিল্প

সুন্দর অর্থনীতির কাঠামোতে শিল্প কারখানাগুলির অবস্থার পরিবর্তন করা হয়। উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এইগুলিকে পুনর্জীবিত করা হয়। ফলে দেশে শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী শুরু হয় এবং জনগণ বিপুলভাবে উপকৃত হইতে থাকে। বেকার সমস্যার সমাধান ও রুজি- রোজগারের ন্যায়সঙ্গত উৎসের সন্ধানের ফলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ সুফল দেখা হয়। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। শাসন কর্তাদের বিশেষ দৃষ্টির ফলে জনগণ নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে পণ্য সামগ্রী লইয়া বাণিজ্যে মনোনিবেশ করে। যাতায়াত ব্যবস্থারও উন্নতি হয় যথেষ্ট এবং বহুদিন পর রাস্তাঘাটগুলি ডাকাত দস্যুদের কবল হইতে মুক্ত হয়।

ধর্মীয়

ইহুদী ও খ্রিস্টানগণ মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের প্রত্যক্ষ ফল লাভ করে। দীর্ঘ দিনের নির্যাতন ও নিগ্রহের হাত হইতে জনগণ হাফ ছাড়িয়া মুক্তির নিশ্বাস ফেলে। সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা তাহারা লাভ করে। নির্বিঘ্নে জনগণ স্ব স্ব ধর্মের যাবতীয় অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি পালন করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়া মুসলিম শাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। দীর্ঘদিন ধরিয়া তাহাদের উপর যে ধর্মীয় জুলুম চলিয়া আসিতেছিল তাহার অবসান ঘটে। ইহুদীগণ খ্রিস্টানদের নির্যাতনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মুসলমানদের সঙ্গে সহযোগিতা ও সাহায্য করিতে আগাইয়া আসে। খ্রিস্টানগণের উপরও কোন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। তাহারাও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ন্যায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মাণ করিবার সমান সুযোগ লাভ করে। সবচেয়ে বেশি খুশী হয় ক্রীতদাসগণ। তাহারা মানবিক অধিকার লাভ করিয়া যেন চরমভাবে কৃতার্থ হয়। তাহাদের প্রতি যে স্বাধীনতা আসে তাহা ভোগ করিবার সময় অতি আনন্দে তাহাদের নয়ন যুগল হইতে আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়ে। তাহারা দীর্ঘদিন পরে বুঝিতে পারিল যে, মুসলমানদের আমলে তাহাদের যেন পুনর্জন্ম ঘটিয়াছে। মুসলমানদের সাম্য, ন্যায় ও ইনসাফ জনগণ যখন উপভোগ করিতে শুরু করিল তখন তাহাদের মধ্যে অনেকেই স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

স্পেন বিজয়ের ফলে ইউরোপ ধর্ম, ভাষা, শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতে স্পেন ইউরোপের রেঁনেসার সূত্রপাত করে। মুসলমানদের উন্নতমনের ভাবধারা, আচার অনুষ্ঠান, বিশ্বাস ও নীতি স্পেনীয় জনগণের মাঝে বিপুলভাবে অনুকরণের সাড়া জাগায়। ফলে অনেকেই ধর্মান্তরিত হয় এবং বিপুল সংখ্যক ধর্মচ্যুত না হইয়া মুসলমানদের উন্নতমানের জীবনধারা গ্রহণ করে। শুধু স্পেন নহে, ফ্রান্স এবং ইউরোপের কেন্দ্র ভূমিতেও এই উন্নতি নব জাগরণের ঢেউ প্রবাহিত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

৭১৩ হইতে ৭৫৬ সালের ঘটনাবলী

[**সার সংক্ষেপ ঃ** সূচনা ❑ দামেস্কের অবস্থা ❑ স্পেনের অবস্থা ❑ আবদুল আজিজ ❑ আয়ুব ❑ হোর- ❑ আস সামাহ ❑ আম্বাসা ❑ ফলাফল ❑ আবদুল মালিক ❑ ওক্‌বা ❑ ফ্রান্সে মুসলমানদের পতনের কারণসমূহ।]

৭১৩ সালে স্পেন বিজয়ী মুসা ও তারিক খলিফা আল ওয়ালিদের নির্দেশে রাজধানী দামেস্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তাহারা আবার ভাবী খলিফা সুলাইমানের নিকট হইতে আর একটি পত্র পান। সে পত্রের বিষয়বস্তু ছিল যে, খলিফা আল ওয়ালিদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত যেন তাহারা দামেস্কে প্রবেশ না করেন। কিন্তু বীরদ্বয় রুগ্ন ও মৃত্যুপথযাত্রী খলিফার আদেশ শিরোধার্য করিয়া যাত্রা অব্যাহত রাখেন। খলিফার মৃত্যুর চল্লিশ দিন পূর্বেই তাহারা রাজধানীতে উপস্থিত হন। খলিফা এই বিজয়ী বীরদ্বয়কে সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। যাহা হউক-সুলাইমান খলিফা হওয়ার পর স্পেন বিজয়ী বীরদ্বয়ের প্রতি নামিয়া আসে নিষ্ঠুর ব্যবহার। তাহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া সমস্ত মর্যাদা ও সম্পদ হইতে বঞ্চিত করা হয়। দীনহীনবেশে নিদারুন কষ্টে তাহারা মৃত্যুবরণ করেন।[১]

---

১. মুসা বিন নুসাইর যখন বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ লব্ধ দ্রব্যাদি, অশ্ব ও উচ্চপদস্থ অফিসারসহ স্পেন হতে আফ্রিকা হয়ে সিরিয়ায় প্রবেশ করেন তখনও খলিফা আল ওয়ালিদের শারীরিক অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে। খলিফার ভাই সুলাইমান পরবর্তী খলিফার জন্য মনোনীত। খলিফার মৃত্যু হলেই খিলাফতের আসনে বসবার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষারত সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক।

ঐতিহাসিক ইবনে হাইয়্যান, ইবনে বাশকুয়াল, ইবনে ইজাহারী এ বিষয়ে একমত যে সেনাপতি মুসার আনিত অজস্র ধনরত্ন এবং স্পেন বিজয় গৌরব বার্তা মৃত্যু শয্যায় শায়িত খলিফার থেকে পরবর্তী নূতন খলিফা সুলাইমানের যেন বেশি প্রয়োজন ছিল— তাই সুলাইমান সেনাপতি মুসাকে এ মর্মে বার্তা প্রেরণ করেন যে খলিফার মৃত্যু সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত যেন তিনি রাজধানী দামেস্কে প্রবেশ না করেন। রাজাদের এহেন ঈর্ষাকাতর এবং আপন কৃতিত্ব কবজা করার উদগ্র কামনাই থাকে। অথচ মুসা বিন নুসাইর কোন মতেই এ আদেশ মানতে পারেন নি। কেননা তারই পৃষ্ঠপোষক, তারই নিয়োগদাতা মৃত্যু পথযাত্রী খলিফাকে কিভাবে পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে শুধু বঞ্চিত নয় বরং আদেশ ও আনুগত্যের অবমাননা করতে পারেন ? তাই সুলাইমানের আদেশ উপেক্ষা করে মুসা বিন নুসাইর দ্রুত গতিতে উপস্থিত হলেন অসুস্থ খলিফার নিকট যখন তিনি মসজিদে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। অজস্র মালে গণিমাত আর সেই দুর্লভ মণিকাঞ্চন খচিত হযরত সুলাইমান (আঃ) এর নামে কথিত টেবিলটি এবং ২৪টি গথরাজাদের স্বর্ণ মুকুট। ৪০ দিন পর

দামেস্কের অবস্থা

খলিফা সুলাইমান মাত্র দুই বৎসর রাজত্ব করেন (৭১৫-১৭)। অতঃপর দ্বিতীয় ওমর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াই এই ধীর শান্ত ও ধার্মিক খলিফা অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা দমন করিয়া রাজ্যে সুখ শান্তি প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেন। নববিজিত স্পেন রাজ্যে সুশাসন কায়েম করিবার জন্য-আস্ সামাহ্‌কে প্রতিনিধি করিয়া প্রেরণ করেন।

স্পেনের অবস্থা

সেনাপতি মুসা ও তারিকের প্রত্যাবর্তনের পর সুদীর্ঘ ৪২ বৎসর ধরিয়া স্পেন একটি আমির শাসিত প্রদেশ হিসাবে পরিণত হয়। এই আমিরগণ রাজধানী দামেস্ক অথবা উত্তর আফ্রিকার গভর্ণর কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। আবার কখনও দেশীয় প্রভাবশালী ওমরাহ ও অভিজাতদের দ্বারা নির্বাচিত হইতেন। এই ক্ষেত্রে তাহাদিগকে নাম মাত্র খলিফা বা

খলিফার মৃত্যু হলে সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক উমাইয়া রাজতখতে আরোহণ করেন। ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান বলেন প্রথমে নূতন খলিফা সেনাপতি মুসা বিন নুসাইরকে স্বাভাবিকভাবে দেখেন এবং তাকে সংগে করে ৯৬ হিজরীতে মক্কাতে হজ্বে যান। এ সময় খলিফা মুসাকে প্রশ্ন করেন গ্রীকরা কেমন ধরনের লোক ? সেনাপতি মুসা বলেন :- তারা তাদের নগর অভ্যন্তরে সিংহ সদৃশ, অশ্ব পৃষ্ঠে বাজপাখী, আর জাহাজে নারীর ন্যায়। সুযোগ পেলেই ক্ষিপ্র গতিতে ধাবমান কিনতু পরাজিত হলেই পর্বত শিখরে পলায়নপর। বার্বারগণ কেমন ? বার্বারগণ আরবদের মত কর্মতৎপর, শক্তিশালী, সাহসী, সহিষ্ণু, যুদ্ধপ্রিয় এবং অতিথিপরায়ণ। কিন্তু তারা বিশ্বাসঘাতক, বিশ্বাসযোগ্য নয় আর কথা রাখে না তারা। গথগণ কেমন ? তারা প্রভুর ন্যায় আভিজাত্য ও আড়ম্বরে থাকে। তবে যদি তারা যুদ্ধে বিজয়ী হয় তবে শত্রুর পিছু নেয় না। ফরাসীরা কেমন ? তারা খুবই সাহসী এবং পরিকল্পনায় দূরদর্শী তারা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় প্রচুর সৈন্য, অস্ত্র এবং রসদে প্রাচুর্যশালী।

৯৭ হিজরীতেই মুসা বিন নুসাইয়ের উপর নিপতিত হয় নযীরবিহীন জুলুম, অপমান, দণ্ড আর লাঞ্ছনা গঞ্জনা। সমস্ত কৃতিত্ব থেকে একেবারেই রিক্ত নিঃস্ব করে অপমানের এবং চরম দারিদ্রের বোঝা মাথায় চাপিয়ে খলিফা সুলাইমান তাকে বাধ্য করেন এক দূর্গতিময় জীবনে প্রবেশ করতে। শুধু ব্যক্তি সেনাপতি আফ্রিকার গভর্ণর স্পেন বিজয়ী বীর মুসা বিন নুসাইরকে নয়— তার গোটা পরিবারকে নির্যাতন, হত্যা ও জুলুমের কশাঘাতে জর্জরিত করেন। স্পেনের ১ম গভর্ণর মুসা পুত্র আব্দুল আজিজকে হত্যা করে তার ছিন্ন মস্তক পিতা মুসার সামনে রেখে বলেন– চিনতে পারেন কি ? হতভাগ্য পিতা শোকের সাগরে ভাসতে ভাসতে বলেন হত্যাকারী থেকে নিহত কতই না উত্তম। ঐতিহাসিক মাক্কারী বলেন দারিদ্রের বোঝা নিয়ে দৈনিক আহারের জন্য নির্বাসিত সেনাপতি মুসা ওয়াদিউল কুরার পল্লীতে গোত্রের পর গোত্রের নিকট দু একটা দিরহাম সংগ্রহ করে তার থেকে কিছু বাঁচিয়ে খলিফার ধার্যক্রত জরিমানাও প্রদান করেছেন। এমনিভাবে মুসা বিন নুসাইরের জীবন নিভে যায় ৯৮ হিজরীতে সকলের অলক্ষে।

কেন এমনটি হোল। একটিই উত্তর। মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রে লালিত ইসলামী আদর্শ বিবর্জিত উমাইয়া কথিত খলিফার শয়তানী খায়েশ তাড়িত ঈর্ষা হিংসা আর পার্থিব মোহ লোভ লালসার যোগান দানে ব্যর্থ সেনাপতি মুসা বিন নুসাইর। সুলাইমান ভেবেছেন যে মুসা তার কথামত তারই রাজ অভিষেকের দিনে রাজধানীতে বিজয়ী সেনাপতি রূপে প্রবেশ করে দামেস্কবাসীর সামনে উমাইয়া রাজের সিংহাসনের পদপ্রান্তে সপে দিবেন অঢেল মালে গণিমাত আর স্পেন বিজয় গৌরব পতাকা সুলাইমানের হাতে তুলে দিবেন। তার রাজ অভিষেক কানায় কানায় ভরে যাবে প্রাচুর্যে আর গর্বে। কিন্তু তা না হওয়ায় সেনাপতি মুসার এ করুণ পরিণতি। অথচ সুলাইমান জীবনে শান্তিতে মরতে পারেন নি।

গভর্ণর হইতে সম্মতি গ্রহণ করিতে হইত। ২৫০০ মাইল দূরত্বে স্পেনকে প্রত্যক্ষভাবে শাসন করা দুর্বল খলিফার পক্ষে সত্যই দুরুহ ছিল। তাই দ্বৈত শাসনের ফলে স্পেনের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল গোলযোগপূর্ণ। স্পেনে রাজনৈতিক পরিবেশ অশান্ত ও বিশৃংখলাপূর্ণ থাকিবার মুখ্যতঃ একটি কারণই ছিল। দেশীয় বিবাদমান দুই গোত্রের (হিমারীয় ও মুধারীয়) শক্তি ও প্রভাবের উপরই শাসকের রদবদলের পালা বদল হইত। ফলে দেখা যায় যে, মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে বেশ কয়েকজন গভর্ণরের উত্থান পতন ঘটে। সেই উত্থান ও পতনের ইতিহাস নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইল।

আবদুল আজিজ

সেনাপতি মুসা বিন নুসাইরের পুত্র আবদুল আজিজ স্পেনের প্রথম আমিরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি সেভিলকে রাজধানী করিয়া দেশ শাসনে আত্মনিয়োগ করেন। প্রশাসক ও ন্যায় বিচারক হিসাবে তাহার প্রচুর সুখ্যাতি ছিল। তিনি থিয়োডমিরের সংগে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তি সম্পাদন করিয়া শান্তিতে রাজত্ব করেন। প্রজাদরদী মন লইয়া তিনি শাসন কার্যের প্রতিটি বিভাগের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। শিল্প কারখানা নিমার্ণ, সেচ কার্যের জন্য খাল খনন, যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য সড়ক ও সেতু নির্মাণ করেন। ব্যবসা বাণিজ্যের ও পথিকদের নিরাপত্তার জন্য প্রহরী নিয়োগ করেন। দেশের শান্তি ও আইন শৃংখলা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সশস্ত্র বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোতায়েন করেন এবং প্রতিরক্ষা দুর্গগুলিকে মজবুত করেন। তিনি ভালভাবেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, স্পেনে মুসলিম শাসনের বুনিয়াদ সুদৃঢ় করিতে হইলে দেশীয় জনগণের সংগে নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে। তাই তিনি মুসলমানদিগকে উৎসাহিত করেন দেশীয় জনগণের সঙ্গে সখ্যতা ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে। তিনি নিজেই নিহত রডারিকের পত্নী আইলাকে বিবাহ করেন। এই ভাবে যখন তিনি স্পেনে মুসলিম রাজত্বের বুনিয়াদ গড়িয়া তোলার বিভিন্ন প্রকার বাস্তবমুখী পরিকল্পনায় ব্যস্ত তখনই তাহার উপর নামিয়া আসে মৃত্যুর পরওয়ানা। খলিফা সুলাইমান তাহাকে পৃথিবীর আলো বাতাস হইতে চিরতরে বঞ্চিত করিবার জন্য এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের ফাঁদ প্রস্তুত করেন। তাহার সব চেয়ে বড় অপরাধ ছিল যে তিনি ছিলেন স্পেনবাসীর জনপ্রিয় শাসক। তবে তাহার পতনের কারণ খলিফা অন্যভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। খ্রিস্টান রাজা রডারিকের পত্নীকে বিবাহ করা খলিফা ভাল চক্ষে দেখতে পারেন নাই। খলিফার নিকট এই কাজটি অত্যন্ত আপত্তিজনক ও ইসলামের মর্যাদা হানিকর বলিয়া বিবেচিত হয়। খ্রিস্টানদিগকে ইসলাম ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করাকে খলিফা ভাল চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। ফলে তাঁহার বিরুদ্ধে স্পেনীয় খ্রিস্টানদের উত্তেজিত করা হয় এবং মুসলমানদিগকেও বিশেষভাবে প্ররোচিত করা হয়। ফলে অত্যন্ত নৃশংসভাবে আবদুল আজিজকে ফজরের নামাজরত অবস্থায় হত্যা করা হয়। তখন খলিফার নির্দেশ মোতাবেক আবদুল আজিজের ছিন্ন মস্তক দামেস্কে প্রেরণ করা হয়। তখন খলিফা হতভাগ্য পুত্রের পিতা মুসাকে দরবারে ডাকেন এবং মস্তকাবৃত বস্ত্র উন্মোচন করিয়া প্রশ্ন করেন– চিনিতে পারেন কি এই ছিন্ন মস্তক কাহার ? পুত্র শোকে বিহ্বল বৃদ্ধ

পিতা মুসা বিন নুসাইর অতি দুঃখে এবং প্রচণ্ড ক্ষোভে উত্তর দিলেন—হাঁ, আল্লাহর অভিসম্পাত পড়ুক হত্যাকারীর প্রতি। নিশ্চয়ই নিহত, হত্যাকারী অপেক্ষা উত্তম ছিল। এই বলিয়া তিনি মনের দুঃখে দরবার কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া মক্কাভিমুখে যাত্রা করেন। পরে দীনহীন ও অসহায়ভাবে ওয়াদিউল- কোরা নামক স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। স্পেনের প্রথম আমির যোগ্য শাসক আবদুল আজিজকে অকালে প্রাণসংহার করিয়া খলিফা সুলাইমান অমানুষিক নিষ্ঠুরতার পরিচয় প্রদান করেন। স্পেনের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় আমিরের অকাল মৃত্যু এমনিভাবে সংঘটিত হয়।

আইয়ুব

আবদুল আজিজ নিহত হওয়ার পর সেনাবাহিনী আইয়ুব নামক মুসা বিন নুসাইরের এক ভগ্নীর পুত্রকে স্পেনের আমির নির্বাচিত করেন। কিন্তু তাঁহার এই নিয়োগ আফ্রিকার গভর্ণর অনুমোদন করেন নাই। তাহার একটি মাত্র কারণ তিনি সেনাপতি মুসার আত্মীয়। অতএব যোগ্যতা থাকা সত্বেও তাহার নিয়োগ কোন ক্রমেই খলিফার মনপুত হইবে না। যাহা হোক তিনি মাত্র সাত মাস ক্ষমতায় ছিলেন।

হোর

অতঃপর হোর ইবনে আবদুর রহমান আস সাকিফিকে আমির নির্বাচিত করা হয়। হোর শাসন কার্যে জনগণের বিরাগভাজন হইয়া উঠেন। তিনি ছিলেন লোভী ও অত্যাচারী। জনগণ তাহার নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। শাসন ব্যাপারে তাহার যোগ্যতাও বেশী ছিল না। মহাপ্রাণ ধার্মিক খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ আমির হোরের কীর্তিকলাপ শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং রাজ্যের জনগণের আবেদনের প্রতি সঠিক গুরুত্ব দিয়া আস সামাহ বিন মালিক আল খালানীকে স্পেনের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। এমনিভাবে খলিফা হোরকে অপসারিত করিয়া জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্য আস সামাহকে স্পেনে চতুর্থ আমির নিযুক্ত করেন।

আস সামাহ

আস সামাহ স্পেনে আসিয়াই অবস্থা পর্যালোচনার জন্য জরিপ ও আদম শুমারী করেন। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় ও অন্যান্য সমস্যার মূল উৎস উদ্‌ঘাটনের জন্য তিনি সর্বোতোভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেন। জনগণের কল্যাণে জনদরদী মন লইয়া সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হন। দক্ষ, যোগ্য ও সমর কুশলী হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল প্রচুর। তিনি শাসন কার্যের সুবিধার জন্য সেভিল হইতে রাজধানী কার্দোবাতে স্থানান্তরিত করেন। পরবর্তী কালে এই কর্দোবা নগরীই ইউরোপ রমণী-নগরীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়।

আস সামাহ শাসনভার গ্রহণ করিবার পরই শুনিতে পাইলেন সেপটিমনিয়ার খ্রিস্টানগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। পীরেনীজ পর্বতমালার অপর প্রান্তে এই সেপটিমনিয়া। ইহাকে

সপ্তনগরী বলা হয়। কারণ নারবোঁ, আগাঁদে, বেজিয়ার, লোডিভ, কারকাসোঁ, নিমে এবং ম্যাগেলোঁ নামে সাতটি নগর লইয়া সেপটিমনিয়া গঠিত। আমির সামাহ্ এক সুদক্ষ সেনাবাহিনী লইয়া পীরেনীজ পবর্তমালা অতিক্রম করিয়া সেপটিমনিয়ায় উপস্থিত হন। খ্রিস্টানদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি তাহাদিগকে সহজে পরাজিত করেন। ৭২১ সালে তিনি অকিটেন প্রদেশে প্রবেশ করিয়া রাজধানী টুলুস নগর অবরোধ করেন। কিন্তু অকিটেনের ডিউক এডিউসের বিশাল সেনাবাহিনী আস সামাহ্‌কে শংকিত করিয়া তোলে। এডিউসের বাহিনী মুসলিম বাহিনী অপেক্ষা দশ গুণ বেশি ছিল।

আস সামাহ্ তাহার শক্তি প্রয়োগ করিয়া খ্রিস্টানদের সঙ্গে মোকাবেলায় অবতীর্ণ হন। তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। কিন্তু অকস্মাৎ একটি তীর আসিয়া আস সামাহ্‌র গলদেশে বিদ্ধ হয় এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রেই তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। তাহার সহকারী সেনাপতি আবদুর রহ্‌মান সেই মুহূর্তে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। অদ্ভুত রণকৌশল ও অদম্য সাহসের সঙ্গে শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকেন এবং অবশিষ্ট মুসলিম সৈন্যসহ তিনি নারবোঁতে ফিরিয়া আসেন। এই যুদ্ধে মুসলমানগণ সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই। তবে আবদুর রহ্‌মানের রণনিপুণতা ইউডির সৈন্যগণকে ভীষণভাবে হতবাক করিয়া দেয়। যদিও এই যুদ্ধে বহু মুসলিম সৈন্য হতাহত হয় তথাপিও তাহাদের অটুট মনোবল ও যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ভীকতা পরাজয়ের গ্লানিকে ম্লান করিয়া দেয়।

আস সামাহ্‌র মৃত্যুর পর দুই মাস যাবৎ আবদুর রহ্‌মান আল-গাফিকী স্পেনের অস্থায়ী শাসন কর্তার দায়িত্ব পালন করেন।

অতঃপর আগস্ট মাসে ৭২১ সালে আম্বাসা স্পেনের নতুন শাসনকর্তা হইয়া আসেন।

আম্বাসা

টুর্‌সের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পরাজয় আম্বাসার অন্তরকে দারুণভাবে বিদ্ধ করে। তাই হৃতগৌরবকে পুনরুদ্ধারের নিমিত্তে তিনি ফ্রান্সে নূতনভাবে সৈন্য প্রেরণ করেন। নূতন প্রেরণা ও উদ্যম লইয়া মুসলিম বাহিনী খ্রিস্টানদিগকে পরাজিত করিয়া কারকাসোঁ ও নিমে প্রভৃতি অঞ্চলগুলি দখল করেন। সমগ্র দক্ষিণ ফ্রান্স পুনরায় মুসলমানদের দখলে আসে। আম্বাসা তাহার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা লইয়া বসবাস করিতে থাকে, কিন্তু খ্রিস্টানগণ মুসলমানদিগকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করিত এবং ধ্বংস করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিত। ৭২৫ সালে শান্তি প্রিয় সুদক্ষ শাসনকর্তা আম্বাসা রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনকালে একদল বাস্‌ক কর্তৃক নিহত হন।

আম্বাসার মৃত্যুর পর পুনরায় স্পেনে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। ইহার পরবর্তী ছয় বৎসরে পাঁচজন শাসনকর্তার রদবদল হয়, কিন্তু কেহই শন্তি ও শৃংখলা বিধান করিতে সামর্থ হন নাই। দুর্বল শাসনকর্তাদের সুযোগে ফ্রান্সে পুনরায় খ্রিস্টানগণ মুসলিম শাসনকে উৎখাত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে থাকে। চারিদিকে প্রচণ্ড বিদ্রোহের দাবানল জ্বলিয়া উঠে। এই অবস্থার মধ্যে ৭৩০ সালে হাইসাম নূতন শাসনকর্তা হইয়া আসেন।

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করিয়া দেশের মধ্যে কিছুটা শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করিতে

তিনি সমর্থ হন। তারপর তিনি খ্রিস্টানদের সংগে মোকাবেলা করিয়া লেওন্স ও ম্যাকন্স প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেন। কিন্তু বিজিত অঞ্চলে তিনি পূর্ণ শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখিতে পারেন নাই। আত্মকলহের ফলে খ্রিস্টানগণ শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে। আর ধীরে ধীরে ঐ অঞ্চলগুলি তাহারা দখল করিয়া নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে।

৭৩২ সালে আবদুর রহমান আল-গাফিকী স্পেনের শাসনভার লাভ করেন। তিনি তাহার বুদ্ধি, কৌশল ও ব্যবহারের দ্বারা আত্মকলহ ও গৃহ বিবাদ দূর করিতে সক্ষম হন। জনগণ তাহার প্রতি এতই মুগ্ধ হইয়া যায় যে, বিবাদমান হিমারীয় ও মুধারীয় দল দুইটি পর্যন্ত তাহাকেই নিজেদের নেতারূপে মানিয়া লয়। সমগ্র দেশ সফর করিয়া তিনি জনগণের মূল সমস্যার সান্নিধ্যে আসেন এবং ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে সমস্ত গোলযোগ ও বিবাদ মীমাংসা করেন। দেশের প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগের পুনর্গঠন এবং অর্থনীতিতে বিপুল পরিবর্তন সাধন করেন। এইভাবে দেশের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণরূপে আপন প্রভাবে আনেন। সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে তাহাকে সাহায্য, সহায়তা ও সমর্থনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। এইবার তিনি উত্তর ফ্রান্সের দিকে মনোনিবেশ করেন। টুলুস যুদ্ধের বিপর্যয়ের দৃশ্য আর মুসা তারিকের বিজয় কাহিনী আবদুর রহমানকে প্রেরণা দিল নূতন ভাবে। অভিনব পদ্ধতিতে সৈন্য সমাবেশ করিয়া তিনি সৈন্য বাহিনীর শক্তির পরিমাপ বুঝিয়া লন। এইবার তিনি স্থির করেন যে, প্রস্তুতি সম্পূর্ণ না করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন না। কিন্তু হঠাৎ তিনি নূতন এক সমস্যায় পড়িলেন। দক্ষিণ ফ্রান্সের শাসনকর্তা উসমান বিন আবু নিসা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি অকিটেন অধিপতি উইডির কন্যা ল্যাম্পোজীকে বিবাহ করিয়া ফরাসী নেতৃবৃন্দের সংগে সংখ্যতা সৃষ্টি করেন। তাদেরই প্ররোচনায় উসমান বিদ্রোহী হয়। তবে আবদুর রহমান তাহার সেনাবাহিনী প্রেরণ করিয়া উসমানকে পরাজিত ও নিহত করেন।

অতঃপর ৭৩২ সালের শুরুতেই আবদুর রহমান আর্লে নগর অবরোধ ও অধিকার করেন। প্রখ্যাত রোণ নদীর তীরে এই যুদ্ধে তিনি প্রতিপক্ষকে প্রচণ্ডভাবে পর্যুদস্ত করেন। ইহার পর তিনি বোর্দা আক্রমণ করিয়া উহা দখল করেন। অকিটেন অধিপতি ইউডি তাহাকে বাধা দেন। কিন্তু সে বাধা আবদুর রহমানের বিজয় বাহিনী সমূলে চূর্ণ করিয়া ফেলে। ইউডি দারদোঁ নদের তীরে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। বার্গাণ্ডিসহ লিয়োঁ, বেজাকোঁ ও স্পেন মুসলমানদের দখলে আসে। এই সমস্ত স্থান বিজয় করিবার ফলে মুসলমানগণ আর্থিক দিক দিয়া যেমন লাভবান হইয়াছিলেন। মনোবলের দিক হইতে তেমনি মজবুতরূপে তৈয়ার হইতে পারিয়াছিলেন, মুসলমানদের অব্যাহত বিজয়ের ফলে ফ্রান্সে দারুণ আতংকের সৃষ্টি হয়। তাহাদের আশংকা ছিল যে, যে কোন মুহূর্তে সমগ্র ফ্রান্সের পতন ঘটিতে পারে।

আবদুর রহমান তাহার বিজয়ী বাহিনীকে অতি দ্রুত গতিতে ফ্রান্সের রাজধানী প্যাঁরিসের দিকে পরিচালনা করেন। এই সংবাদে ইউডি ফ্রান্সের রাজা পেপিন পুত্র চার্লসের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া মুসলিম বাহিনীকে পথিমধ্যে বাধা দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। চার্লস এক বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া অগ্রসর হন। বেলজিয়াম ও জার্মানী হইতে সংগৃহীত বহু সৈন্য ইউডির বাহিনীকে শক্তিশালী করে। সমগ্র ইউরোপ হইতে প্রচুর সৈন্য

দ্বারা ইউডির বাহিনী যে এত দুর্বার শক্তির অধিকারী হইয়াছিল তাহা আবদুর রহমানের গুপ্তচর বাহিনী তাহার নিকট পরিবেশন করিতে ব্যর্থ হয়। তাই আবদুর রহমান খ্রিস্টান সৈন্যদের প্রকৃত শক্তি পরিমাপ করিতে পারেন নাই। যুদ্ধের এহেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি মুসলিম বাহিনীকে বিপদগ্রস্ত করিয়া ফেলে। আবদুর রহমান নিজেও বুঝিতে পারেন নাই যে, সমগ্র খ্রিস্টান জগৎ এমনিভাবে জোট বাঁধিয়া তাহাকে আক্রমণ করিবে। তাই তাহাকে নিদারুণভাবে নগন্য সংখ্যক সৈন্যের বহর লইয়া ঐ বিপুল ও বিশাল সৈন্যবাহিনীর মোকাবেলায় উপস্থিত হইতে হয়। তাহা ছাড়া নববিজিত অঞ্চলে বহু অভিজ্ঞ সৈন্যকে মোতায়েন রাখিতে হয়। ফলে তাহার সামরিক শক্তি যথেষ্টভাবে হ্রাস পায়। অথচ দামেস্ক মিশর ও উত্তর আফ্রিকা হইতে নূতনভাবে কোন সৈন্য আসে নাই কিংবা স্পেন হইতে সৈন্য সংগ্রহও হয় নাই। উপরন্তু ইতিপূর্বে হস্তগত ধন-সম্পদ হেফাজতের দিকেই সৈন্যদের বেশি দৃষ্টি ছিল। তাই তাহারা আসন্ন ভয়াবহ যুদ্ধের জন্য সামরিক ও মানসিক দিক হইতে নিজেদের যথেষ্ট প্রস্তুত করিতে পারে নাই। তাহা ছাড়া ধন-রত্ন লোভী ও ক্ষমতাপ্রিয় সৈন্যদের মধ্যে জঘন্য গোত্রকলহও ছিল। এই সব দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, আবদুর রহমানকে তাঁহার নিয়তি এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নিক্ষেপ করে। যাহা হউক মুসলিম ও খ্রিস্টান সৈন্যদল টুরস ও পয়টিয়ার্সের মধ্যবর্তী রণক্ষেত্রে মিলিত হয়। এক সপ্তাহ যাবৎ চলে খণ্ড যুদ্ধ। তবে এই খণ্ড যুদ্ধের গতি আবদুর রহমানের অনুকূলেই ছিল। অতঃপর শুরু হয় প্রচণ্ডভাবে পূর্ণ সংগ্রাম। সৈন্যাধিক্য থাকা সত্বেও প্রথম দিকে মুসলিম সৈন্যদের ভীষণ আক্রমণে খ্রিস্টান বূহ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস। কোথা হইতে গুজব উঠিল। মুসলিম ছাউনিতে খ্রিস্টানগণ প্রবেশ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের মোড় পরিবর্তিত হইয়া গেল। মুসলিম সৈন্যরা আপন আপন গণিমাতের মালের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ছুটিল তাঁবুর দিকে। জীবন ও জাতীয় সম্মান অপেক্ষা ব্যক্তিগত সম্পদের মোহ তাহাদের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করিল। যুদ্ধের জয়লাভ অত্যাসন্ন এমনি এক বিজয়ী বাহিনী মারাত্মক ভুল করিয়া নিজেদের বিপর্যয় ত্বরান্বিত করিল।

যুদ্ধক্ষেত্রে জয়-পরাজয়ের ক্রান্তিলগ্নে এহেন অনভিপ্রেত গোলযোগের মধ্যে সন্ধ্যার প্রাক্কালে অকস্মাৎ একটি তীর আসিয়া মহাবীর প্রতাপশালী রণকুশলী সেনাপতি আবদুর রহমান আল-গাফিকীর জীবন সন্ধ্যার ঘন্টাধ্বনি বাজাইয়া দিল। মুসলিম বাহিনীর এই মহাদুর্যোগ মুহূর্তে সেনাপতি রণক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করলেন। সেনাপতির তিরোধানে সহকারী সেনানায়কের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল সেনাপতি নির্বাচনে। এ দিকে প্রকৃতি ও সন্ধ্যার আধারে ঢাকিয়া দিল তাহার দিনের উজ্জ্বলতাকে। আর টুরসের রণক্ষেত্রে অস্তমিত হইল মুসলমানদের ইউরোপ বিজয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা।

মুসলিম বাহিনীর সহকারী সেনানায়করা তাহাদের স্ব স্ব গোত্রীয়দের লইয়া রাতের আধারে আপন তাবুতে প্রস্থান করিল। খ্রিস্টানগণ এত বেশি রণক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহাদের এমন উৎসাহ বা স্পৃহাও ছিল না যে, তাহারা মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদাবন করে। নিশীথের নীরবতায় তাহারা মুসলিম শিবিরের অবস্থা গোপনে দেখিতে আসিয়া বিস্মিত হইয়া পড়ে। তাবুর মধ্যে কোন জন প্রাণীর সাড়া শব্দ নাই। কেবল আহত সৈনিকদের করুণ আর্তনাদ রাতের স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করিতেছে। তাহারা তাবুর অভ্যন্তরে প্রবেশ

করিয়া দেখে জন প্রাণী শূন্য। তাহারা অজস্র ধন-রত্ন কুড়াইয়া লইল এবং পরিশেষে নারকীয় হত্যাযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইল। আহত সৈনিকদের আর্তনাদ উপক্ষো করিয়া শাণিত তরবারির আঘাতে তাহাদের প্রাণ সংহার করিল। এমনিভাবে অসহায় আহতদের হত্যা করিয়া তাহারা বীরত্বের পরিচয় প্রদান করে এবং তাহাদের নেতা চার্লস মার্টেল উপাধি গ্রহণ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

ফলাফল

মুসলিম ও খ্রিস্টান শক্তির ভারসাম্য বিশ্লেষণ করিলে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, টুরস্ যুদ্ধের উপরই নির্ভর করিতেছিল ইউরোপরে ভবিষ্যৎ। এই যুদ্ধ সম্পর্কে লেনপুল সাহেব মন্তব্য করিয়াছেন যে "টুরস যুদ্ধের ফলাফলের উপরই নির্ভর করিতেছিল যে, ইউরোপ কি মুসলিম ইউরোপে পরিণত হইবে না ইহা খ্রিস্টানদের অধিকারে থাকিবে।" যাহা হউক মুসলিম শক্তির জয়লাভ হইলে সমগ্র ফ্রান্স যে মুসলমানদের অধিকারে চলিয়া আসিত এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। আর তাহা হইলে সারা ইউরোপে মুসলমানদের সভ্যতার ও সংস্কৃতির এ নূতন যুগের সূচনা করিত। কিন্তু মুসলমানদিগকে টুরসের যুদ্ধের গতিরোধ করিবার ফলে–পশ্চিম ইউরোপের খ্রিস্টানদের এক মহাবিপদের অবসান ঘটে। অন্য দিকে টুরস যুদ্ধ খ্রিস্টান ইউরোপে ইসলামের অব্যাহত বিজয় রুদ্ধ করিয়া দেয়।

মুসলমানদের পরাজয়ের কয়েকটি কারণ ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। তবে আবদুর রহমান আল-গাফিকির মৃত্যুর পর যদি যোগ্য নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী ন্যস্ত হইত, তবে ইতিহাস অন্যধারায় প্রবাহিত হইত। কারণ পুনরায় মুসলমানদিগকে বাধা প্রদানের জন্য ইউডি কিংবা চার্লসের কোন রিজার্ভ সৈন্য ছিল না, নেতৃত্বের কোন্দল, গোত্রকলহ, পারস্পরিক ঈর্ষা, হিংসা, অনৈক্য, দ্বন্দ্ব, কলহ এবং ধন সম্পদ লিপ্সা মুসলমানদের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ। আর এই কারণের জন্যই মুসলিম শক্তিকে পরবর্তীকালে যথেষ্ট মূল্য দিতে হইয়াছে।

টুর্‌সের যুদ্ধের পর হইতে ৭৫৬ সাল পর্যন্ত চলে স্পেনে এক মারাত্মক আত্মকলহ ও গৃহযুদ্ধের যুগ। বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংঘাত স্পেনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ডাকিয়া আনে মারাত্মক বিপর্যয়। এই দল ও সম্প্রদায়ের মধ্যে আরব, মুদারীয়, হিমারীয়, বার্বার, নওমুসলিম, মুদেজার, ইহুদী, খ্রিস্টানগণই প্রধান। ইহাদের মধ্যে ছিল আরও দল উপদল। ক্ষুদ্র আত্মস্বার্থের জন্য তাহারা জাতীয় স্বার্থ ও সম্পদকে পর্যন্ত বিনষ্ট করিবার জন্য সদা তৎপর ছিল। ফলে স্পেনে বিরাজ করিতে থাকে এক ভয়াবহ নৈরাশ্যজনক অবস্থা।

আবদুল মালিক

৭৩২ সালে টুর্‌সের পরাজয় ও আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর দামেস্ক খলিফা হিশাম মুসলিম গৌরবের পুনরুদ্ধারের জন্য তৎক্ষণাৎ আবদুল মালিককে শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়া প্রেরণ করেন। আবদুল মালিক পীরেনীজ পর্বতমালায় পার্বত্য জাতির বিদ্রোহাত্মক

ও নাশকতামূলক কার্যকলাপ রোধ করিবার জন্য ল্যাংদোক প্রদেশের দুর্গগুলি পুনর্নির্মাণ ও সুরক্ষিত করেন। অতঃপর তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ৭৩৭ সালে পীরেনীজ অতিক্রম করিয়া রোমি ও আভিনোঁ অধিকার করেন। ফরাসীরা বাধা প্রদান করিলেও শেষ পর্যন্ত টিকিতে পারে নাই। আবদুল মালিক অত্যন্ত কঠোর এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। এই জন্য সেনাবাহিনী তাহার উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং জনগণও অতিষ্ট হইয়া উঠেন। লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড এবং নির্যাতনমূলক ব্যবহারে জনগণ বীতশ্রদ্ধ হইয়া ওঠেন। অতঃপর ৭৩৪ সালেই তাহার পদচ্যুতি ঘটে।

ওক্‌বা

ওক্‌বা আসিলেন আবদুল মালিকের স্থলাভিষিক্ত হইয়া। নিরপেক্ষ, ন্যায়পরায়ণ, সুবিচারক ও ধার্মিক হিসাবে তাহার খ্যাতি প্রচুর। তাহার মধুর ব্যবহারের ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি জনগণের একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। তাই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর যাবৎ তিনি স্পেনের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ফ্রান্সে মুসলিম শক্তি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সেন্টপল, ত্রোয়াদুর্গ, দোঁজের, ব্যালেন্স, নিউলিয়োঁ প্রভৃতি প্রধান স্থানগুলি ৭৩৬ সালের পূর্বে অধিকৃত হয়। এ দিকে ইতালির অন্তর্গত পীডমন্ট প্রদেশের কিয়দংশও দখল হয়। মুসলিমগণ প্যারিস আক্রমণের প্রস্তুতিও লইয়া ছিল। কিন্তু মুসলমানদিগকে এইরূপ নির্বিঘ্নে রাজ্য বিস্তার করিতে দেখিয়া ফরাসীরা বিশেষভাবে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। চার্লস মুসলিম শক্তিকে মোকাবেলার জন্য লম্বার্ডির রাজার সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাজা তাহার ভ্রাতাসহ এক বিশাল সৈন্য প্রেরণ করেন।

ফরাসীদের সম্মিলিত বাহিনী আভিনোঁ অধিকার করে এবং নগরবাসীরা তাহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু বর্বর ফরাসী সৈন্যগণ হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের দ্বারা বহু মুসলিম পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলে। বিজয়ের গর্বে গর্বিত হইয়া তাহারা নারবোঁ আক্রমণ করিতে আসে। কিন্তু মুসলমানগণ তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা প্রদান করে। তাহারা এমন বেকাদায় পড়ে যে শেষ পর্যন্ত প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। দক্ষিণ ফ্রান্স হস্তগত করিতে না পারায় তাহারা বিকল্প পথ অবলম্বন করে। হত্যা অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসলীলার মাধ্যমে লোয়ার নদের দক্ষিণ প্রান্তে বহুদূর ব্যাপী মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি জনশূন্য করিয়া ফেলে। ইহার ফলে বহু নগর ও জনপদ এবং তাহার সম্পদ ও সভ্যতা বিনষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ ধ্বংসযজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া চার্লস স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে।

এই ঘটনার পর হইতে ১৬ বৎসরের মধ্যে ফরাসীরা আর কোন মারাত্মক উপদ্রব করে নাই। ফ্রান্সে মুসলিম জনপদগুলিতে মুসলমানগণ শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, বাণিজ্য ও শিল্প প্রভৃতি কার্যে যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করে। নগর, প্রাসাদ, মসজিদ, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া নূতন সভ্যতার বীজ বপন করে। কি গথ কি ফ্রাঙ্ক কোন জাতির অধীনেই দক্ষিণ ফ্রান্স এত সমৃদ্ধির মুখ দেখে নাই। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা খ্রিস্টানদের সব কিছুই ধ্বংস করিয়া দেয়। মুসলমানদিগকে তাহারা শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে এবং তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য সাংঘাতিক তৎপর হইয়া উঠে।

এই সময়ে উত্তর আফ্রিকায় ভীষণ গোলযোগ সৃষ্টি হয়। ৭৩৯ সালে গভর্ণর জেনারেল উবায়দুল্লাহ ওক্‌বাকে ডাকিয়া পাঠান। কিন্তু পদচ্যুত আমির আবদুল মালিকের সংগে তাহার সংঘর্ষ বাধে। তবে ওক্‌বা শেষ পর্যন্ত ৭৪১ সালে আফ্রিকাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এইবার সেনাবাহিনীর মধ্যে কোন্দল শুরু হয়। আবদুল মালিক পুনরায় স্পেনের আমির হন। কিন্তু তাহাতেও গোলযোগের অবসান হইল না। বরং সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করে। বার্বার, মুধারীয় ও হিমারীয়দের দ্বন্দ্ব স্পেনে চরমভাবে দেখা দেয়। উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ ফ্রান্সের অবস্থা একই রূপ। এই অরাজকতাপূর্ণ অবস্থায় স্পেনে শক্তিশালী শাসনকর্তা কেহই ছিলেন না। মুসলিম জাহানের এহেন দুর্যোগপূর্ণ অবস্থাকে মহাসুযোগ মনে করিয়া ফ্রান্সের পেপিন এর বাসনা জাগিল হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের। নিজকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করিয়া ৭৫২ সালে পেপিং ফ্রান্সে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে আক্রমণ চালায়। এই সর্বাত্মক আক্রমণকে প্রতিরোধ করিবার মত কোন শক্তি মুসলমানদের ছিল না। তাই তাহারা আত্মরক্ষার জন্য ন্যূনতম ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে দুর্ধর্ষ ফরাসী বাহিনীর শিকার হইয়া পড়ে। ফলে বহু মুসলমান প্রাণ হারায়। সুন্দর ইমরাত, বিদ্যালয়, মসজিদ, হাসপাতাল সব কিছুই ফরাসীরা বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। সুদীর্ঘ ৪ বৎসর ধরিয়া নারবোঁ অবরুদ্ধ থাকে এবং পরিশেষে নগরীস্থ খ্রিস্টানদের বিশ্বাসঘাতকতায় নারবোঁর পতন ঘটে। ক্ষিপ্র ও হিংস্র জন্তুর ন্যায় ফরাসী সৈন্যরা নগরে প্রবেশ করিয়া মুসলমানদের উপর আঘাত হানিতে থাকে। তাহাদের বর্বরতায় নগরের জনপ্রাণী শূন্য হইয়া পড়ে। নারবোঁর পতনের ফলে মূলতঃ দক্ষিণ ফ্রান্স মুসলমানদের হাতছাড়া হইয়া যায়।

আত্মকলহে লিপ্ত বিভিন্ন দল উপদল ফ্রান্সে মুসলিম শক্তির অবলুপ্তির জন্য মোটেই চিন্তা করে নাই। এই শত ছিন্ন সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করা যেমনি দুরূহ ছিল তেমনি ছিল যোগ্য সেনানায়কের বা আমিরের অভাব। ৭৩২ সাল হইতে ৭৫৬ সালের মধ্যে স্পেনে ৮ জন ক্ষমতায় আসেন। কিন্তু অবস্থার উন্নতি হয় নাই। এই সময়ে দামেস্কে কেন্দ্রীয় উমাইয়া শক্তিরও ক্ষয়িষ্ণু কাল, ফলে তাহারাও স্পেনের ব্যাপারে কোন ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে নাই। স্পেনের যোগ্য শাসনকর্তার অভাবের দরুণই ফ্রান্সে মুসলিম শক্তির এমনিভাবে পতন ঘটে।

ফ্রান্সে মুসলমানদের পতনের কারণগুলি নিম্নরূপ

সমগ্র ফ্রান্স অধিকার করিবার জন্য যে শক্তি সম্পদের প্রয়োজন ছিল তাহা দামেস্ক, কায়রোয়ান অথবা কর্দোবা সরবরাহ করিতে পারে নাই। অথচ বিভিন্ন কারণে সমগ্র ফ্রান্স জয় করা একান্ত অপরিহার্য ছিল। সময় সুযোগ মত মাঝে মাঝে কর্দোবা হইতে অভিযান প্রেরণ করা হইয়াছে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ সাহায্য আসে নাই উত্তর আফ্রিকা অথবা দামেস্ক হইতে। ফলে দেখা গিয়াছে সুনিশ্চিত বিজয় অবেশেষে বিপর্যয়ে পরিণত হইয়াছে।

সেনাপতি মুসা বিন নুসাইর ও তারিক বিন জিয়াদ ফ্রান্স অধিকার করিবার জন্য যখন প্রস্তুতি লইয়া বীর দর্পে অগ্রসর হইতেছিলেন তখন বজ্রপাতের ন্যায় দামেস্কের নিষেধাজ্ঞা। তাহার পর আবদুর রহমান আল-গাফিকী ও ওক্‌বার সময় সার্থকরূপে সাহায্য আসিলে ফ্রান্সের বিজয় ছিল অবধারিত।

কেন্দ্রীয় রাজধানীতে খলিফাদের দুর্বলতার জন্য স্পেনের আমিরের প্রায়ই রদবদল ঘটিতেছিল। শক্তিশালী দীর্ঘস্থায়ী শাসনের পরিবর্তে অস্থায়ী ও দুর্বল শাসনই স্পেন ও ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ডাকিয়া আনে। প্রতিনিয়তই সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও অভিযান অব্যাহত রাখিবার প্রয়োজন ছিল কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই। তাহার ফলে খ্রিস্টান শক্তি বৃদ্ধি পায়।

অনৈক্য ও বিশৃংখলা এবং গোত্রকলহের ফলে স্পেনের সামরিক শক্তি হ্রাস পায়। তাহাদের মধ্যে বিরোধ ও কোন্দল চরম আকার ধারণ করে। নিজেদের উপর অর্পিত জাতীয় দায়িত্ব অবহেলা ও উপেক্ষা করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য তাহারা বেশি তৎপরত ছিল। ফলে সামরিক শক্তির মান নিম্নস্তরে নামিয়া পড়ে। অথচ শত্রুপক্ষীয় শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

দুর্লঙ্ঘ্য পীরেনীজ পর্বত, স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রাকৃতিক বাধারূপে বিরাজ করিতেছিল। আর অধিকাংশ সময়ে গিরিপথগুলি বরফে আচ্ছাদিত থাকিত। এই জন্য সব সময় সৈন্যবাহিনী লইয়া অভিযান চালানো মুশকিল ছিল।

তাহাছাড়া ফ্রান্সে মুসলিম জনপদের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কোন দুর্গ বা স্থায়ী ছাউনি তৈয়ার করা হয় নাই। ফলে সুদূর স্পেন হইতে সৈন্য বাহিনী আসিয়া খ্রিস্টানদের সংগে সাময়িকভাবে যুদ্ধ করিয়া সাফল্য অর্জন করা খুব সুবিধাজনক ছিলনা। এই জন্য প্রয়োজন ছিল মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে সুরক্ষিত স্বয়ংসম্পূর্ণ সামরিক ছাউনি গড়িয়া তোলা। তাহা হইলে প্রয়োজনে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ফরাসীদিগকে ঘায়েল করা খুব সহজতর হইত।

যদিও মুসলমানদিগকে ফ্রান্স হইতে চলিয়া আসিতে হয়, তবুও সেখানে তাহারা তাহাদের অক্ষয় ও দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি রাখিয়া আসিতে সক্ষম হয়। "প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল দক্ষিণ ফ্রান্সে মুসলিম রীতি-নীতি আইন-কানুন, ধর্ম-কর্ম প্রচলিত ছিল। উহা ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের দৈহিক ও মানসিক বিশেষত্বের মধ্যে প্রকাশ পাইতে থাকে।"[১]

"যদি মুসলমানেরা গল (ফ্রান্স) জয় করিতে পারিত তাহা হইলে খ্রিস্টধর্মের পরিবর্তে ইসলামই বহুকাল যাবৎ ইউরোপের প্রচলিত ধর্মে পরিগণিত হইত।"[২]

কিন্তু যদিও অস্ত্রবলে ইউরোপ বিজিত হয় নাই, তথাপি উত্তরকালে জ্ঞানবলে মুসলমানেরা সমগ্র ইউরোপ বিজয় করিতে সমর্থ হয়।

---

১. S. P. Scott—Mororish Empire in Europe Vol. 1. P—941

২. Student's History of England Vol. 1. P—54

চতুর্থ অধ্যায়

স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরদের রাজত্ব (৭৫৬-৯২৯)

আবদুর রহমান আদ দাখিল (১ম) (৭৫৬-৭৮৮)

[**সার সংক্ষেপ ঃ** সূচনা ❑ আবদুর রহমান আদ-দাখিল (১ম) ❑ মাসারাহ্ যুদ্ধ ❑ সেভিলে বিদ্রোহ ❑ তলেদোতে বিদ্রোহ ❑ আব্বাসীয় বিপদ ❑ বার্বারদের বিদ্রোহ ❑ শাসক হিসাবে আবদুর রহমান ও অন্যান্য গুণাবলী ❑ উত্তরাধিকারী নির্বাচন ও মৃত্যু ।]

হিন্দুকুশ হইতে পীরেনীজ, চীনের প্রাচীর হইতে আটলান্টিক তীরভূমি পর্যন্ত বিশাল উমাইয়া সাম্রাজ্যের বিস্তৃত সীমানা দামেস্ক খলিফাগণের শাসনাধীনে ছিল। এত বিরাট ভূভাগ সুশাসনে রাখিবার জন্য প্রয়োজন হইত পরাক্রান্ত, সুনিপুণ, দক্ষ, বিচক্ষণ, ন্যায়পরায়ণ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন খলিফার। কিন্তু খলিফা হিশামের মৃত্যুর পর এমন যোগ্যতা সম্পন্ন কোন খলিফা দামেস্কের খিলাফতে আসেন নাই। ফলে দুর্বল খলিফাদের সময়ে চতুর্দিক হইতে বিপদ নামিয়া আসে। বিদ্রোহ বিশৃংখলা গণআন্দোলন উমাইয়া শক্তিকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষিপ্ত করে। এই সময়ে রাজ্যের মধ্যে আব্বাসীয় আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং পরিশেষে তাহারা দ্বিতীয় বার যুদ্ধে ৯০ বৎসরের উমাইয়া শাসনকে ধ্বংস করিয়া ৭৫০ সালে খিলাফতের ক্ষমতা দখল করে।

আব্বাসীয় বংশের প্রথম খলিফা আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ্ শাসন ক্ষমতা হাতে লইয়া উমাইয়া বংশ উচ্ছেদের এক নিষ্ঠুর ফরমান জারি করেন। শহর, নগর, পল্লী ও বস্তী এলাকা নির্বিশেষে উমাইয়া বংশীয়দিগকে খুঁজিয়া হত্যা করা হয়। এই নির্মম সাধারণ হত্যার কবল হইতে যে কয়েকজন ভাগ্যবান ব্যক্তি আত্মগোপন করিয়া রক্ষা পান, তাহাদের মধ্যে খলিফা হিশামের পৌত্র ও মাবিয়ার পুত্র আবদুর রহমানের নাম ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। আব্বাসীয় হত্যাকারীরা আবদুর রহমানের জ্যেষ্ঠভ্রাতা আবানকে অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। তাহারা যখন পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সন্ধান করিতেছিল তখন আবদুর রহমান অতি সংগোপনে আব্বাসীয় দৃষ্টি এড়াইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহয়াসহ স্বপরিবারে গৃহ হইতে পালাইতে সক্ষম হন। তাহারা ফোরাত নদীর কূলে রাহ্ নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস, সেখানেও আব্বাসীয় বাহিনী তল্লাসী

চালাইতে চালাইতে উপস্থিত হয়। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, এখান হইতে সুযোগমত আফ্রিকায় আশ্রয় লইবেন। কিন্তু অকস্মাৎ বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়।

একদিন চক্ষু পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া তিনি তাবুর মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় তাহার চারি বৎসর বয়স্ক পুত্র সুলাইমান ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া তাহার কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। তাবুর বাহিরে সুলাইমান তখন ক্রীড়ারত ছিল। পুত্রের এহেন আকস্মিক ক্রন্দনের জন্য তিনি বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা তাহাদেরই সাক্ষাত মৃত্যুর পরওয়ানা অর্থাৎ তাহাদেরই সন্ধানে আব্বাসীয় সৈন্যবাহিনী উপস্থিত। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি তাহার বিশ্বস্ত ভৃত্য বদরকে পরবর্তী করনীয় উপদেশ প্রদান করিয়া একমাত্র জীবিত তের বৎসর বয়স্ক ভ্রাতাকে সংগে লইয়া নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে সেই স্থান ত্যাগ করেন। কিন্তু আব্বাসীয়গণের তল্লাসীর গতি ও প্রকৃতি চিন্তা করিয়া কোথাও দূরে যাইতে পারিলেন না। কারণ আব্বাসীয় সৈন্যগণ দ্রুত গতিতে তাহাদের দিকে আসিতেছিল। উপায় না দেখিয়া ভ্রাতার হাত ধরিয়া ফোরাত নদীর স্রোতে নিজেদেরকে নিক্ষেপ করেন। তাহারা যখন অপর কূলে পৌঁছাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় সাঁতার কাটিতেছেন তখন আব্বাসীয় সৈন্যরা অপর কূলে পৌঁছাইয়াছে। নদীর মাঝ পথ হইতে শুনিতে পাইলেন যে, সৈন্যরা তাহাদিগকে নিরাপত্তার অভয় দিয়া প্রত্যাবর্তনের জন্য আহবান করিতেছে। তের বৎসর বয়স্ক ইয়াহ্ইয়া স্রোতের সংগে লড়াই করিয়া তখন ক্লান্ত ও অসবন্নপ্রায়। তদুপরি কূলের শত্রুদের নিকট হইতে অভয়বাণী তাহাকে যেন প্রত্যাবর্তন পথে শক্তির সঞ্চার করিল। কিন্তু তাহাকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া আবদুর রহমান ফিরিতে বারংবার নিষেধ করিয়া বলিলেন যে, উহাদের কথায় বিশ্বাস নাই কারণ উহারা রক্ত পিপাসু। কিন্তু বালক ফিরিয়াই চলিল। আবদুর রহমান যখন কূলে উঠিলেন তখন তাহার ভ্রাতাও অপর তীরে। কিন্তু পরক্ষণে যাহা দেখিলেন, তাহা ছিল যেমনি নির্মম তেমনি হৃদয়বিদারক। সন্তরণে ক্লান্ত ভ্রাতাকে নদীর কূল হইতে উঠাইয়া রক্তপিপাসু সৈনিকেরা তরবারির আঘাতে নিষ্ঠুরভাবে মস্তক দেহচ্যুত করিয়া ফেলিল। তাহার ভ্রাতার পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড দেখিয়া সাশ্রুনয়নে তিনি আপন গন্তব্যের পথে চলিলেন। সমস্ত ভ্রাতাদিগকে আব্বাসীয় সৈন্যদের শাণিত কৃপাণতলে হারাইলেন। নিতান্ত নিঃসম্বল, নিঃসঙ্গ অবস্থায় একাকী দিবারাত্র পথ চলিয়া অবশেষে প্যালেষ্টাইনে উপনীত হইলেন। পূর্ব নির্দেশ মোতাবেক আপন ভৃত্য বদর ও ভগ্নী আসবাগের ভৃত্য সলিমকে সঙ্গী করিয়া ভগ্নি প্রদত্ত পাথেয় লইয়া ভাগ্য পরীক্ষার জন্য তিনি আফ্রিকার উদ্দেশ্যে পথ ধরিলেন।

আফ্রিকায় তখনও বনি আব্বাসের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তথায় ইচ্ছা করিলে আবদুর রহমান সপরিবারে নির্বিঘ্নে জীবন যাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার আশা ছিল বিরাট, উদ্দেশ্য ছিল মহৎ এবং সংকল্প ছিল দুর্বার। বাল্যকালে তাহার পিতামহ মাসলামাহ তাঁহাকে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন— 'তুমি বড় হইবে, খলিফা হইয়া দেশ শাসন করিবে।' সহায় সম্বলহীন, বন্ধু উপদেষ্টা অর্থবিহীন ভ্রাম্যমান যুবকের মনে তখনও সেই বাল্যবয়সে শ্রুত পিতামহের ভবিষ্যৎ বাণী অভ্রান্ত সত্যরূপে কাজ করিতেছিল। জীবনে বড় হইবার অদম্য উৎসাহ, অসীম সাহস, বে-নজীর আত্মনির্ভরতা ও সংকল্পে দৃঢ়তা তাঁহাকে অধ্যবসায়ের সোপান দিয়া মনজিলে লইয়া যাইতেছিল।

উত্তর আফ্রিকায় তখন আবদুর রহমান ইবনে হাবিব শাসনকর্তা। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল তিনি স্পেনের শাসনকর্তা হইবেন। কিন্তু তাঁহার আকাঙ্ক্ষা সফল হয় নাই। তাঁহারই এক আত্মীয় ইউসুফ আলফিহ্‌রী সেখানে শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ইবনে হাবিব প্রথম আকাঙ্ক্ষায় ব্যর্থ হইয়া হতাশ হন নাই। তিনি আশা করিতেছিলেন উমাইয়া শক্তির পতন ঘটাইয়া তিনি আফ্রিকায় স্বাধীন রাজবংশ কায়েম করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক ইহুদী জ্যোতিষীর নিকট ভাগ্য গণনা করাইয়াছিলেন। তবে জ্যোতিষী বলিয়াছিলেন যে, উত্তর আফ্রিকার স্বাধীন রাজ্যের অধিপতি হইবেন রাজ বংশের আবদুর রহমান নামক এক শাহাজাদা। তাঁহার ললাটের উভয় পার্শ্বে চুলের ঘুংঘুর থাকিবে। নিজ নাম আবদুর রহমান হওয়াতে ইবনে হাবিব সর্বদা চুলের কৃত্রিম ঘুংঘুর করিয়া ললাটের উভয় পার্শ্বে রাখিতেন। এই সময় আবদুর রহমানের উপস্থিতি ইবনে হাবিবের কর্ণগোচর হয়। তাঁহার মনে তখন ভীষণ সংশয় জাগে। তখন তিনি দরবার জ্যোতিষীকে ডাকিয়া এই নবাগত উমাইয়া বংশোদ্ভূত আবদুর রহমানের ভাগ্য গণনা করিতে বলেন। জ্যোতিষী যথাসময়ে ইবনে হাবিবকে জানাইলেন যে তাঁহার গণনাকৃত সেই স্বাধীন রাজ্যের ভাবি শাসনকর্তা হইবেন এই নবাগত আবদুর রহমানই। ইহাতে ইবনে হাবিব ক্ষিপ্ত হইয়া আবদুর রহমানকে গোপনে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন।

আবদুর রহমানও বসিয়া ছিলেন না। তিনিও গোপনে আফ্রিকাতে ভাগ্য পরীক্ষার চেষ্টা করিতেছিলেন। স্বল্প সময়ে আপন দলে বহু লোক সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। আবদুর রহমানের কার্যকলাপ রোধ করিবার জন্য ইবনে হাবিব আব্বাসীয় খলিফার বশ্যতা স্বীকার করেন এবং উমাইয়া হত্যার জন্য সাহায্য ও সমর্থন খলিফার নিকট কামনা করেন। আব্বাসীয় খলিফা কুফা হইতে ইবনে হাবিবের সাহায্যে সৈন্য প্রেরণ করিলে তিনি বহু উমাইয়াকে হত্যা করিয়া আব্বাসীয় শাসন কায়েম করিতে লাগিলেন। এইবার আবদুর রহমানের জীবনের পট পরিবর্তন করিতে হইল। আব্বাসীয়দের রোষ হইতে নিজেকে এখন নিরাপত্তামূলক দূরত্বে রাখিতে হইবে। তাই পুনরায় যাযাবর জীবন লইয়া রাবকাতে বার্বার গোত্রের ক্ষুদ্র বোস্তমীয় তাহেরী বংশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইবনে হাবিবের প্রেরিত অনুসন্ধানকারী দল তাহাকে অনুসরণ করিয়া তথায় গমন করে। অগত্যা আবদুর রহমান সেখান হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হন। বারংবার আশ্রয়হীন হইয়া মরুভূমির পথে বেদুইনদের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া ভবঘুরে জীবনের চাকা ঘুরাইতে লাগিলেন। এইরূপ চরম বিপদে পড়িয়াও তিনি হতাশ হইয়া উচ্চাভিলাষ হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন নাই। কি নির্বাসনে, কি নিদারুণ দুঃখ কষ্টে, কি শত মৃত্যুভয়াল বিপৎপাতে, কোন কিছুতেই তাঁহার সিংহাসন লাভের আশা হ্রাস পায় নাই। সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরিয়া আফ্রিকার মরু জঙ্গল শহরে ঘুরিয়াও স্বীয় আশা বাস্তবে পরিণত করিবার কোন উপায়ের সন্ধান করিতে পারিলেন না। অবশেষে মরক্কোতে সিউটা নগরের দক্ষিণে এক পার্বত্য অঞ্চলে বনি নাফসা গোত্রের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বনি নাফসাগণ তাঁহার মাতুল গোষ্ঠী হওয়ায় তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। এই আশ্রয়স্থল হইতেই আবদুর রহমানের ভাবী উজ্জ্বল জীবনের দীপ প্রজ্বলিত হয়। সাগরপারে স্পেন ভূমিতে তিনি তাঁহার ভাগ্যান্বেষণের নূতন পথ বাছিয়া লইলেন। তিনি প্রথমে তাঁহার ভগ্নির মুক্তদাস সলিমের নিকট হইতে স্পেনের অবস্থা

সম্পর্কেও ওয়াকেবহাল হন। তাই তাহার আবাল্য লালিত বাসনা ফলবতী করিবার জন্য এইবার বিশেষ উদগ্রীব হইয়া উঠেন। স্পেনের সার্বিক অবস্থা সুষ্ঠুরূপে জানিবার জন্য তাহার দুর্দিনের সঙ্গী মুক্তদাস বদরকে এলভিরা, জায়েন ও দক্ষিণ স্পেনের জেলাগুলিতে বসবাসকারী দামেস্ক শাখার উমাইয়াগণের নিকট প্রেরণ করেন।

এই সময়ে স্পেনের রাজনৈতিক অবস্থা খুবই সংকটজনক ছিল। বিভিন্ন শ্রেণী ও গোত্রের মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্ব ও কলহ চরম আকার ধারণ করে। মুধারীয় ও হিমারীয়দের দ্বন্দ্বই ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি প্রকট। উভয় দলই শক্তিতে ছিল প্রবল। তাই বহু দিন ধরিয়া দ্বন্দ্ব কলহে যখন কোন স্থায়ী ফল হইল না তখন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে, পর্যায়ক্রমে হিমারীয় ও মুধারীয় প্রতিনিধিগণ সিংহাসনে বসিবেন। এই নীতির ফলে মুধারীয় গোত্রের প্রতিনিধি ইউসুফ আল ফিহ্‌রী প্রথমে স্পেনের আমির হইলেন। কিন্তু হিমারীয়গণের নির্ধারিত সময় আসিলে ইউসুফ সিংহাসন ছাড়িতে অস্বীকার করেন এবং অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করিয়া রাখেন। হিমারীয়গণ ইউসুফের অত্যাচারে অত্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। তাহাদের মধ্যে সেভিলের গভর্ণর আহমদ বিন আমর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অতঃপর হিমারীয়গণের আন্দোলনে সমগ্র স্পেনে এক বিদ্রোহাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাহাছাড়া আস্তুরীয়গণ মুসলমানদের অন্তবিপ্লবের সুযোগ লইয়া নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে থাকে এবং ওই অঞ্চল দখলের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়।

স্পেনের এহেন অবস্থায় আবদুর রহমানের পত্র লইয়া বদর দামেস্ক শাখা উমাইয়া দলপতি উবাইদুল্লাহ বিন উসমান ও আবদুল্লাহ বিন খালিদের নিকট উপস্থিত হয়। এলভিয়ার এই দলপতিদ্বয় আবদুর রহমানের পত্র পাইয়া হিমারীয়গণকে মুধারীয়গণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তোলে। হিমারীয়গণ বিপুলভাবে সাড়া দিয়া আবদুর রহমানের সাহায্যে ও সমর্থনে প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে লাগিল। মুধারীয়গণের প্রতি চরম প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাহারা ক্রমাগত শক্তি বৃদ্ধি করিতে থাকে। এই সময়ে ইউসুফ ও তাহার শ্রেষ্ঠ সহযোগী সামুয়েল উত্তরে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। যুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য হিমারীয়গণকে তিনি প্রচুর অর্থ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়া সেই অর্থ দিয়া আবদুর রহমানের পক্ষে কাজ চালাইতে থাকে। শাহাজাদা আবদুর রহমানকে স্পেনে আনাইবার জন্য কিছু অর্থ দিয়া তাহারা আবু গালিব তাম্মামকে বদরের সঙ্গে প্রেরণ করেন।

এদিকে বদরকে স্পেনে প্রেরণ করিয়া আবদুর রহমান অধীর আগ্রহ নিয়া দিনের পর দিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমুদ্রের তীরে আসিয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন। এমনি করিয়া তিনি একদিন নামাজ অন্তে সমুদ্র তটে বসিয়া আছেন অসীম জলরাশির প্রতি উদার দৃষ্টি দিয়া। হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইল একখানি ক্ষুদ্র জাহাজ তাঁহার দিকে আসিতেছে। জাহাজখানি ধীরে ধীরে ঘাটে ভিড়িল। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ হইতে অবতরণ করিল বদর ও তাহার সঙ্গী। আবদুর রহমানের মনে আশার সঞ্চার হইল। এত দিনে বুঝি তাঁহার সযত্নে লালিত বাসনা অধ্যবসায়ের বিভিন্ন সোপান উত্তীর্ণ হইয়া বাস্তবের স্পর্শ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। আবদুর রহমান তাহাদিগকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করিয়া সংবাদ জানিতে

চাহিলেন। সুসংবাদ পাইয়া স্রষ্টার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রার জন্য প্রস্তুতি লইলেন।

ঐ জাহাজেই আবদুর রহমান স্পেনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ৭৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি স্পেনের মাটিতে পদার্পণ করেন। উবায়দুল্লাহ ও ইবনে খালিদ আবদুর রহমানকে লইয়া টোরক্স দুর্গে উপনীত হইলে সেখানকার প্রতীক্ষারত জনগণ তাঁহাকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। আবদুর রহমানের সমর্থনে দলে দলে বার্বার ও হিমারীয়গণ তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হয় এবং তাহাদের সাহায্যে তিনি একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন করেন। আমির ইউসুফ উত্তর রণাঙ্গণে সাফল্য অর্জন করেন। কিন্তু ইয়েমেনীদের সঙ্গে সন্ধিশর্ত ভঙ্গ করিয়া বহু লোককে হত্যা করেন। বহু সৈন্য ইহাতে আমিরের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে। এই সময় আমির ইউসুফ সংবাদ পাইলেন যে হিশামের পৌত্র আবদুর রহমান স্পেনে উপস্থিত হইয়াছেন এবং বহু উমাইয়া তাঁহার দলে যোগ দিয়াছে। ইউসুফ তাঁহার সহকারী সামুয়েলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে আপাততঃ আবদুর রহমানের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন না। কারণ তাঁহার আপন সৈন্যবাহিনীতে যথেষ্ট গোলযোগ বিদ্যমান। আবদুর রহমান নিরাপদে আপন শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ পান এবং সৈন্যবাহিনীকে সুবিন্যস্ত করিতে শুরু করেন। যদি এই সময়ে টোরক্সে ইউসুফ আবদুর রহমানকে বাধা প্রদান করিতেন তবে স্পেনের ইতিহাস হয়ত অন্যরূপ হইত। ইউসুফ তাঁহার সেক্রেটারী খালিদ বিন জিয়াদ ও দুইজন সহকারী দিয়া আবদুর রহমানের নিকট শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য প্রেরণ করেন। উপযুক্ত উপঢৌকনাদি দিয়া পত্র দিলেন যে, আবদুর রহমান যদি শান্তিতে বসবাস করিতে চায় তবে ইউসুফ স্বীয় কন্যা ও বিস্তর ভূমি তাহাকে সম্প্রদান করিবেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ও নিভৃত সুখ শান্তির জন্য আবদুর রহমান কোন দিনই লোলুপ ছিলেন না। তাই ইউসুফের প্রস্তাব তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া সসৈন্যে রাজধানী কর্দোবার দিকে অগ্রসর হন। এই সময়ে ইউসুফের সৈন্যবাহিনীর বহু নামকরা সেনানায়ক আবদুর রহমানের সৈন্য দলে যোগদান করেন। ইহাদের মধ্যে কায়েদ বা দলপতি ইবনে শিহাবের পুত্র জাবির অন্যতম। তাহা ব্যতীত আবদুর রহমান উত্তর আফ্রিকা হইতে আগত বহু অশ্বারোহী সৈন্য দিয়া নিজ শক্তিকে আরও মজবুত করেন। ইউসুফও আবদুর রহমানকে বাধা প্রদানের জন্য কর্দোবা হইতে যাত্রা করেন। আবদুর রহমান আর্চিদোনা ও সিদোনিয়ায় পৌঁছাইলে তথাকার বহু লোক তাঁহাকে বিপুলভাবে সমর্থন দেয়। ৭৫৬ সালের ৮ই মার্চ তিনি আর্চিদোনার রাজধানী রিজিওতে প্রবেশ করেন। সেখানেই তাঁহাকে স্পেনের আমির বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং তাঁহার নামে খোত্‌বা পাঠ করা হয়।

রিজিও হইতে আবদুর রহমান বিপুল সৈন্য ও প্রবল আগ্রহ লইয়া সেভিলে উপস্থিত হন। গিয়াস বিন আল-কামাহ্ এবং ইব্রাহিম বিন সাজাহ্ যথাক্রমে সেদোনিয়া ও রোনদার অধিপতিদ্বয় রহমানের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সমর্থনকে আরও জোরদার করিয়া তোলেন। ৭৫৬ সালের মাঝামাঝিতে আবদুর রহমান স্পেনের দক্ষিণ জেলাগুলিতে বিনা রক্তপাতে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন।

মাসারাহ্‌ যুদ্ধ

ইউসুফ তলেদো ও মুরসিয়া হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজধানী কর্দোবা হইতে সেভিলের দিকে গোয়াদালকুইভার নদীর দক্ষিণ তীর ধরিয়া শাহাজাদা আবদুর রহমানকে বাধা প্রদানের জন্য অগ্রসর হন। সুচতুর আবদুর রহমান নদীর বাম তীর দিয়া রাজধানীর দিকে যাত্রা শুরু করেন। এইভাবে সেভিলের অনিবার্য সংঘর্ষ এড়াইয়া আবদুর রহমান রাজধানীতে পৌঁছান। দুর্ভিক্ষ কবলিত রাজধানী অবরোধ করিয়া রাখেন। এই সংবাদ পাইয়া ইউসুফ সেভিল হইতে দ্রুত গতিতে রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হন। আবদুর রহমানও এক লক্ষ সৈন্য লইয়া মাসারাহ নামক স্থানে ইউসুফের সৈন্যবাহিনীকে মোকাবেলা করেন। ফলে ভীষণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইউসুফ পরাজিত হইয়া তলেদোতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সামুয়েল জায়েনে পলায়ন করেন। আবদুর রহমান বিজয়ী বেশে রাজধানী কর্দোবাতে প্রবেশ করিয়া নগরবাসীকে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করেন এবং রাজপরিবারের মহিলাদের বিশেষ সম্মানের সাথে হেফাজত করেন। ইউসুফের কন্যা আবদুর রহমানের ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাহাকে এক অপরূপ সুন্দরী কিংকরী উপহার দেন। এই কিংকরী হুলাল আবদুর রহমানের বেগমের মর্যাদায় ভূষিত হন এবং স্পেনের দ্বিতীয় আমির হিশাম তাহারই গর্ভজাত সন্তান। জাব যুদ্ধে পূর্বদেশে উমাইয়া শক্তি পতনের মাত্র ছয় বৎসর পরে মাসারাহ যুদ্ধে পশ্চিমদেশে উমাইয়া শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজধানী কর্দোবা অধিকৃত হইলেও সমগ্র স্পেন তখনও বিজিত হয় নাই। ইউসুফ তলেদো হইতে জায়েনে গিয়া সামুয়েলের সঙ্গে মিলিত হন। উভয়ে পরামর্শ করিয়া পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন এবং কর্দোবা পুনর্দখলের জন্য তাঁহারা সসৈন্যে অগ্রসর হন। আবদুর রহমান আবু ওসমানকে কর্দোবার প্রশাসক নিযুক্ত করিয়া ইউসুফের বাহিনীকে মোকাবেলা করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইউসুফ আবদুর রহমানের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া সমীচিন মনে করেন নাই।

তিনি আবদুর রহমানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং তাহার দুই পুত্র আবু জায়েদ আবদুর রহমান ও আবুল আসাদ মুহাম্মদকে জামিন স্বরূপ কর্দোবাতে রাখিয়া নিজে শান্তিতে বসবাস করিবেন এই মর্মে একটি চুক্তি করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই চুক্তি ভঙ্গ করিয়া ইউসুফ মেরিদাতে গিয়া সমরায়োজন শুরু করেন। এই চুক্তি ভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে আবদুর রহমান ইউসুফের পুত্রদ্বয় ও সামুয়েলকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। ইউসুফ শেষবারের মত ক্ষমতা দখলের জন্য এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করিয়া লোক্স নামক স্থানে উপস্থিত হন। আবদুর রহমান তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। ৭৫৮ সালে লোক্স প্রান্তরে তুমুল সংঘর্ষের পর ইউসুফ পরাজিত হন এবং আহত অবস্থায় কোন রকমে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। তবে এক বৎসর পরে আবদুল্লাহ বিন আমর আনছারী কর্তৃক তলেদোতে তিনি নিহত হন। পরবর্তীকালে সামুয়েল ও আবু জায়েদ নিহত হন এবং আবুল আসাদ অন্ধ অবস্থায় ছদ্মবেশে কারাগার হইতে পালায়ন করেন। এমনিভাবে আবদুর রহমানের প্রতিদ্বন্দ্বি ও তাঁহার বংশের পতন হয়।

সেভিলে বিদ্রোহ

ইউসুফের শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিবার পরও আবদুর রহমান নিরাপদে রাজ্যশাসন করিতে পারেন নাই। বার্বার ও ইয়েমেনীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে কিন্তু তাহাদের দমন করিতে আবদুর রহমানকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। ৭৬০ সালে সেভিলে আরজাক বিন আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। যথাসময়ে তাঁহাকে দমন করিয়া সেভিলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন। সামারাহ যুদ্ধের পর সেভিলের গভর্ণর আবু আব্বাস ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে লিপ্ত হইলে ৭৬৬ সালে তাহাকে হত্যা করা হয়। তবে ৭৭৪ সালে সেভিলবাসী আবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে আবদুর রহমান বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন করেন। বিদ্রোহ দমন কল্পে প্রায় কুড়ি হাজার লোককে হত্যা করিয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধান করেন। তাঁহার জীবদ্দশায় সেভিলে আর বিদ্রোহ দেখা দেয় নাই।

তলেদোতে বিদ্রোহ

৭৬১ সালে হিশাম বিন উরাহ তলেদোতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আবদুর রহমান তাঁহাকে পরাজিত করেন এবং তাঁহার পুত্রকে জামিনস্বরূপ কর্দোবাতে আনয়ন করেন। ৭৬৪ সালে তলেদোতে আবার বিদ্রোহ দেখা দেয়। এইবার বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত প্রকৃত অপরাধীদিগকে ধরিয়া কর্দোবাতে ফাঁসি দেন। এইভাবে তলেদোর বিদ্রোহ দমন করা হয়।

আব্বাসীয় বিপদ

বাগদাদের খলিফা আল-মনসুর স্পেন দখলের জন্য উত্তর আফ্রিকার শাসনকর্তাকে নির্দেশ দেন। কায়রোয়ান হইতে আমীর আ'লা বিন মুগিস বিপুল সৈন্য লইয়া আক্রমণ করেন। স্পেনের বিভিন্ন স্থানের বিদ্রোহীগণও আব্বাসীয় বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করেন। প্রথম দিকে আব্বাসীয়গণ সেভিল শহর দখল করে। আবদুর রহমান কারমোনাতে আব্বাসীয় সৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন। দুইমাস ধরিয়া অবরোধ চলে। কিন্তু ইতিমধ্যে আব্বাসীয় সৈন্যদলে ভীষণ খাদ্যাভাব দেখা দেয়। আবদুর রহমানও সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিয়া বসেন। আব্বাসীয় সৈন্যগণ দিশাহারা হইয়া কিছুক্ষণ যুদ্ধ চালাইবার পর ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পলায়ন করে। কিন্তু রাতের অবসানে দেখা গেল যে, সেনাপতিসহ প্রায় সাত হাজার আব্বাসীয় সৈন্যের মৃতদেহ রণক্ষেত্রে পড়িয়া আছে। প্রায় নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া আবদুর রহমান আব্বাসীয়গণের উপর প্রতিহিংসায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন। নিহত আ'লার মস্তক দেহচ্যুত করিয়া লবণ ও গন্ধক দ্রব্যাদি মিশাইয়া একটি থলিতে ভর্তি করেন। আব্বাসীয় কৃষ্ণ পতাকা ও আ'লাকে প্রদত্ত স্পেন আক্রমণের নির্দেশনামাসহ ছিন্ন মস্তকটি একজন বণিকের মারফতে কায়রোয়ানে প্রেরণ করেন। খলিফা আল-মনসুর এই সংবাদ শ্রবণে স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলেন যে—'আল্লাহ তাহাকে ও তাহার এমন শত্রুর মধ্যে একটি সমুদ্র রাখিয়া তাহাকে বিপদমুক্ত করিয়াছেন।'[১]

---

১. Dozy—Spanish Islam P—199

1 Lane Pole—Moors in Spain P—64

বার্বারদের বিদ্রোহ

বার্বারদের গোত্রপ্রীতি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া রক্তপাতের মাধ্যমে শৌর্যবীর্য প্রকাশ এবং প্রতাপশালী পদবী লিপ্সা মোহ কোন দিন কাটে নাই। যখন কোন নূতন আন্দোলন দানা বাধিয়া উঠে সেখানে তাহাদের সাহায্যের হাত প্রসারিত। কিন্তু এককেন্দ্রীয় শাসনকে সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় এবং সুশৃংখল হইলেই যেন তাহারা স্বস্তি লাভ করিতে পারে না। আবদুর রহমানকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিতে তাহারা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। অতঃপর কিছু সময়ের ব্যবধানে আবার তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেও কসুর করে নাই। আবদুল্লাহ নামক এক উচ্চাভিলাষী শিক্ষকের নেতৃত্বে তাহারা বিদ্রোহী হয়। আবদুল্লাহ নিজেকে ফাতেমী বংশের দাবীদার রূপে পরিচিত করেন এবং শাসন ক্ষমতা দখলের ন্যায্য অধিকার লাভের জন্য জনগণের নিকট প্রচার কার্য চালান। অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে তিনি বিভিন্ন জনপদে চলাফেরা করিতেন। যখন তিনি শুনিতে পাইতেন যে, আবদুর রহমানের সৈন্যরা তাহাকে ধরিবার জন্য আসিতেছে তখনই তিনি আত্মগোপন করিতেন, কখনও গহীন বনানীর অভ্যন্তরে আবার কখনও দুর্লংঘ্য পার্বত্য এলাকায়।

এমনিভাবে সুদীর্ঘ নয় বৎসর যাবৎ তিনি বিভিন্ন স্থানে আবদুর রহমানের শাসনকে বিপদাপন্ন করিয়া তোলেন। অবশেষে ৭৭৭ সালে তাহারই দুষ্ট অনুচর কর্তৃক তিনি নিহত হন। এইভাবে দূরন্ত উপদ্রব হইতে রহমান তাহার শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ শাসনকে নিশ্চিত করেন।

আবদুর রহমান আরও একটি মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হন। সম্মিলিত আরব গোত্রগুলি খ্রিস্টানদের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করিয়া আবদুর রহমানকে স্পেন হইতে বিতাড়িত করিবার ষড়যন্ত্র করে। আরব দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন ইউসুফের পুত্র আল-আসাদ তাহার জামাতা আবদুর রহমান বিন হাবিব এবং বারসিলোনার গভর্ণর সুলাইমান বিন আকজান আল-আরাবী। এইভাবে আরবীয় প্রধানগণ ও উত্তরের খ্রিস্টানগণ ফ্রান্সের শার্লেমেনকেও আমন্ত্রণ করে। তবে ত্রিপক্ষীয় মৈত্রী জোট গঠিত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধিত হয় নাই। এই ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতানৈক্য ঘটে এবং পরিশেষে সাধারণ লক্ষ্যে তাহারা উপনীত হইতে ব্যর্থ হয়। তথাপিও ইহাদের জন্য আবদুর রহমানকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। ত্রিপক্ষীয় পরিকল্পনা ছিল যে, আল-আরাবীর ও শার্লেমেন এবরো নদীর উত্তরাঞ্চলে স্বীয় প্রভুত্ব কায়েম করিবেন এবং বার্বারদের সাহায্যে ইবনে হাবিব আব্বাসীয় পতাকা উত্তোলন করিবেন। শার্লেমেন যথারীতি পীরেনীজ অতিক্রম করিয়া স্পেনে প্রবেশ করেন। কিন্তু মিত্রপক্ষের কোন সমর্থন লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি উত্তরাঞ্চলের বহু শহর অধিকার করেন। ৭৭৮ সালে সারাগোসাতে শার্লেমেন ভীষণ বাধা প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাদাপসরণ করিতে বাধ্য হন। এদিকে স্যাকসন নেতা ফ্রান্সে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে শার্লেমেন দ্রুত স্পেন ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাবর্তন কালে বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহে আল আরাবীকে বন্দী করিয়া সঙ্গে নেন। কিন্তু পরে আল-আরাবী তার পুত্রগণের দ্বারা মুক্তি লাভ করেন। পীরেনীজ অতিক্রমকালে শার্লেমেন এক বিপদের সম্মুখীন হন। পার্বত্য বাস্ক জাতির সংগে তাহার বৈরীভাব ছিল। তাই তাহারা সুযোগের

প্রতীক্ষায় ছিল। শার্লেমেন রণসেসভক্স নামক পর্বতের গিরিপথ অতিক্রমকালে তাহারই অপেক্ষায় হাজার হাজার বাস্‌ক তাহার সেনাবাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। সেই দুর্গম বন্ধুর অন্ধকার গিরিপথে শার্লেমেনকে প্রায় অর্ধেক সৈন্য হারাইয়া নিতান্ত ভগ্ন হৃদয়ে ফ্রান্সে ফিরিতে হয়।

ত্রিপক্ষীয় জোটের হামলা হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া আবদুর রহমান আভ্যন্তরীণ ছোটখাটো শত্রুদিগকে সহজে মোকাবেলা করেন। ৭৭৮ সালে তিনি আল-আসাদকে পরাজিত করেন। ৭৮৬ সালে অসহায় অবস্থায় তলেদোর এক অজ্ঞাত গ্রামে আল-আসাদ মৃত্যুমুখে পতিত হন। এইবার আবদুর রহমান সকল প্রকার যুদ্ধ-বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা হইতে মুক্ত হইয়া শান্তিতে সিংহাসনে বসেন। তাঁহার বাল্যকালের স্বপ্ন ও যৌবনের সাধনা শত মৃত্যুভয়াল বিপদ বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অবশেষে বাস্তবে রূপ লাভ করিল।

বিতাড়িত, পলাতক ও গৃহহীন যাযাবর তাঁহার উচ্চাভিলাষের শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইলেন। লেনপুল সাহেব আবদুর রহমানের এই সাফল্যকে অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন। "যৌবনে যে আকাঙ্ক্ষাকে সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা এখন বাস্তবে পূর্ণ এবং একক শক্তি লইয়া তিনি একটি রাষ্ট্র অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন।"[১]

জীবনের দীর্ঘ দিনের অধ্যবসায়, ধৈর্য আর পরিশ্রমের ফলে দামেস্ক, জেরুজালেম, আফ্রিকা ও সিউটায় বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার বেড়াজাল উত্তরণ করিয়া আবদুর রহমান অবশেষে স্পেনের মাটিতে তাঁহার আজন্ম সাধ ও সাফল্য রূপায়িত করিলেন। স্পেনে উমাইয়া বংশ বিপদমুক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্য তাঁহাকে সুদীর্ঘ বত্রিশ বৎসর ব্যাপী সতর্কতা অবলম্বন করিয়া কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

শাসক হিসাবে আবদুর রহমান

আবদুর রহমান শাসক হিসেবে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র দেশটিকে ছয়টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রাদেশিক শাসন ব্যাপারে গভর্ণরদিগকে তিনটি বিষয়ের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন। এইগুলি হইল, সামরিক শক্তির যথা প্রয়োগ, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাজস্ব সংগ্রহ। তিনি কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক যন্ত্রকেও শক্তিশালী করিয়া তোলেন। রাজকার্যের সুবিধার জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ আপন আপন দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত থাকিতেন। হাজিব, প্রধানমন্ত্রী, কাতিব বা সেক্রেটারী, কা'য়েদ আল-জামা'ত বা প্রধান বিচারপতি, কা'য়েদ বা সেনাধ্যক্ষ এবং সাহিব আল-সূরহ্‌তাহ্‌ বা পুলিশ প্রধান। তাহাছাড়া রাজ্যের বিজ্ঞ ও চিন্তাশীল ও বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের লইয়া একটি পরামর্শ পরিষদ গঠন করেন। বিশেষ জরুরী সমস্যার সঠিক সমাধানের জন্য সময়ে সময়ে এই পরিষদের সভা আহবান করা হইত। এইভাবে আবদুর রহমান সামরিক ও বেসামরিক উভয় ক্ষেত্রে তাহার আসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। জনসাধারণের সুখ দুঃখের সংবাদ জানিবার জন্য তাহার উদ্বেগ ছিল যথেষ্ট। তাই

---

১. Lane Pole—Moors in Spain P—67

দেখা যায় যে, প্রায়ই তিনি দেশ সফর করিয়া ব্যক্তিগতভাবে জনগণের সুখদুঃখের সংস্পর্শে আসিতেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে তিনি গভীরভাবে ভালবাসিতেন। দীন-দুঃখীর দুয়ারে যাইতেন সাহায্যের কথা লইয়া এবং আর্তজনের পাশে বসিতেন সান্ত্বনার বাণী লইয়া। সদয় ব্যবহার ও দয়ার্ত চিত্তের জন্য তাঁহার খ্যাতি ছিল প্রচুর। কিন্তু বিদ্রোহীদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। অনুগত ও বন্ধুজনকে আলিঙ্গন করিতেন উদার হৃদয়ে এবং ষড়যন্ত্রকারী ও শত্রুদের প্রতি আঘাত হানিতেন নিষ্ঠুরভাবে। তাঁহার চরম দুর্দিনের সহযাত্রী ও সঙ্গী বদরকেও সন্দেহ বশে তিনি ক্ষমা করেন নাই। অর্থাৎ তাঁহার চলমান গতিপথের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে তিনি একক শক্তি লইয়া নির্মূল করেন।

সামরিক বাহিনী

দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, পৌণ-পৌণিক বিদ্রোহ দমন ও বৈদেশিক শত্রুর সঙ্গে সার্থকরূপে মোকাবেলার জন্য আবদুর রহমান এক বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। সৈন্যদের সংখ্যা ছিল প্রায় দুই লক্ষের মত। মুক্তদাস ও বার্বারগণই ছিল সৈন্য বাহিনীর প্রধান অংশ। তাঁহার অধীনে বহু খ্যাতনামা সমরাধিনায়ক ছিলেন। ইহাদের মধ্যে বদর, তামাম বিন আল কামাহ, হাবিব ইবনে আবদুল মালেক কোরেশী ও আসিম বিন মুসলিম সাকেফী অন্যতম। কিন্তু অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ রণক্ষেত্রে আবদুর রহমান স্বয়ং সেনাপতির দায়িত্ব পালন করিতেন। যে ক্ষিপ্রগতি, অবিচল মতি ও অব্যর্থ লক্ষ্য লইয়া স্পেন অধিকার করেন সে সম্পর্কে আব্বাসীয় খলিফা আল মনসুর বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে Falcon of the Quraish.[১] নামে অভিহিত করেন।

অন্যান্য গুণাবলী

বিভিন্নমুখী প্রতিভা ও অপূর্ব কৃতিত্বে আবদুর রহমানের চরিত্র সমৃদ্ধ। তিনি একাধারে ছিলেন সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ব্যক্তি, কর্দোবা জুমা মসজিদের ইমাম, বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি ও রণক্ষেত্রে প্রধান সেনাপতি। তিনি নিছক আমির উপাধি লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। কারণ তিনি মনে করিতেন যে, মক্কা ও মদীনা নগরীদ্বয়ের অধিকর্তাগণই খলিফা হওয়ার অধিকারী।

বহুবিধ জনহিতকর কার্যদ্বারাও তিনি তাঁহার প্রতিভার পরিচয়কে বহুলাংশে প্রসারিত করেন। কৃষিকার্যের সুবিধার্থে তিনি সেচ প্রকল্পের প্রচলন করেন। খাল খনন ও পানি সেচের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, চলাচল ও যোগাযোগের সুবিধার্থে তিনি সড়ক নির্মাণ ও সংস্কার করেন। কর্দোবাতে প্রাসাদ, সরকারী ইমারত মসজিদ, সেতু ও উদ্যান প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কার্যের দ্বারা রাজধানীকে সুসজ্জিত করেন। ৮০,০০০ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয়ে কর্দোবার জামে মসজিদ নির্মাণ করেন।

---

১. Dozy—Spanish Islam P—207

পয়ঃপ্রণালী ও স্নানাগার প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া নগরবাসীর জীবন যাত্রাকে উন্নত করিয়া তোলেন। দেশী বিদেশী মনোরম ও মনোহারিনী লতা গুল্ম ফল ও ফুলের দ্বারা উদ্যান রচনা করিয়া তাহার সৌন্দর্য ও সুরুচি জ্ঞানের পরিচয় দেন।

তিনি জ্ঞানী, গুণী ও পণ্ডিতগণকে যথেষ্ট সমাদর ও শ্রদ্ধা করিতেন। ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়া, ঈসা বিন দীনার, শায়খ আবুমুসা হাওয়ারী ও সাঈদ বিন হাসান প্রমুখ মনীষীগণ তাহার দরবার অলঙ্কৃত করেন। এই সব জ্ঞানী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ছিলেন উদার ও অকৃপণ। তাঁহার মধ্যে মাঝে মাঝে কঠোরতা প্রকাশ পাইলেও প্রধানতঃ তিনি ছিলেন সদয়, সহানুভূতিশীল ও উন্নতরুচি সম্পন্ন। আমির আবদুর রহমান সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবনুল আসির এক অনবদ্য ও নিখুঁত চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন।

সেই বর্ণনায় ঐতিহাসিক আমির আলী History of Saracens. গ্রন্থে বলেন— তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়, কৃশ, সুঠাম দেহের অধিকারী, বিদ্বান, কবি, বীর্যবান, প্রখর বুদ্ধি ও দূরদর্শিতাসম্পন্ন, কর্তব্যপরায়ণ, দানশীল ও উদার। অধ্যবসায় ও শাসন দক্ষতায় তিনি মনসুরের সমকক্ষ ছিলেন।

উত্তরাধিকারী নির্বাচন ও মৃত্যু

মৃত্যুর পূর্বে তিনি কর্দোবার প্রাসাদ কক্ষে তলেদো, মেরিদা, সারাগোসা, ভ্যালেনসিয়া ও মুরসিয়ার গভর্ণর ও মন্ত্রীগণ কেন্দ্রীয় প্রধান মন্ত্রী, সেক্রেটারী, প্রধান বিচারপতি, প্রধান সেনাপতিসহ আরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে আহবান করেন। সেই কক্ষে শাহাজাদা হিশামকে উপস্থিত করিয়া ভাবী আমির বলিয়া ঘোষণা করেন। অতঃপর উপস্থিত প্রত্যেকেই তাহাকে ভাবী আমীর হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। হিশামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয় সুলাইমান ও আবুদল্লাহকে যথাযথভাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। উত্তরাধিকার মনোনয়ন পর্ব শেষ করিয়া আবদুর রহমান পুত্র আবদুল্লাকে কর্দোবায় রাখিয়া ভাবী আমীর হিশামকে সঙ্গে লইয়া মেরিদায় গমন করেন। সেখানে সামান্য অসুস্থতায় তিনি ৭৮৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ছিল ৫৯ বৎসর ২ মাস ৪ দিন। তাহাকে কর্দোবাতে সমাধিস্থ্ করা হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

হিশাম (প্রথম) –(৭৮৮-৭৯৬)

[**সার সংক্ষেপ ঃ** সূচনা ❑ হিশাম (১ম) ❑ ভ্রাতৃবিদ্রোহ ❑ পূর্ব স্পেনে বিদ্রোহ ❑ ফ্রান্স অভিযান- ❑ মালেকী মজহাবের পৃষ্ঠপোষকতা ❑ উমাইয়া বংশের বুনিয়াদ দৃঢ়করণ ❑ মৃত্যু।]

আবদুর রহমান আদ-দাখিলের মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র হিশাম ৩২ বৎসর বয়সে স্পেনের আমির হইয়া পূর্ণ জাঁকজমকের সহিত অশ্বারোহী বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করেন এবং জুমার নামাজে রাজধানীর জামে মসজিদে নিজ নামে খুতবা পাঠ করেন। তাঁহার নম্র, শান্ত ও অমায়িক ব্যবহার, ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিপালনে অবিচল নিষ্ঠা ও গভীর অনুরাগ, ন্যায় বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় এবং জন কল্যাণের আন্তরিক আগ্রহ সমগ্র স্পেনে তাঁহাকে অতিশয় জনপ্রিয় করিয়া তোলে। ধার্মিকতা ও ন্যায়পরায়নতার ক্ষেত্রে তিনি উমাইয়া খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজের সমতুল্য ছিলেন। তাঁহার শান্তিপূর্ণ রাজত্বকালে কতিপয় বিদ্রোহ ও বৈদেশিক আক্রমণ তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তোলে। তবে উপযুক্ত সময়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার ফলে সেইগুলি সার্থকরূপে প্রশমিত হয়। স্পেনে বসবাসরত বিভিন্ন গোত্র ও দলগুলি আত্মকলহ ও আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে সব সময়ই সিদ্ধহস্ত ছিল। কিন্তু দক্ষ ও কঠোর শাসনের নিকট মাথা নত করিতেও তাহারা বিলম্ব করিত না। তাই ধর্মগত কোমল প্রাণ হিশামের রাজত্বকালে তাহারা কিছু সময়ের জন্য পূর্ব স্পেনে গোলযোগ সৃষ্টি করে। ভ্রাতৃবিদ্রোহ ও ফ্রান্স অভিযান হিশামের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ভ্রাতৃবিদ্রোহ

আবদুর রহমানের সিরীয় বেগমের গর্ভে সোলায়মান ও আবদুল্লাহ নামে দুই পুত্র এবং হুলাল নামীয় স্পেনীয় বেগমের গর্ভে হিশাম সর্বাপেক্ষা যোগ্য ছিলেন। তাই আবদুর রহমান তাঁহার মৃত্যুর পূর্বেই হিশামকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। পিতার উপস্থিতিতেই সুলায়মান ও আবদুল্লাহ হিশামের মনোনয়নকে সমর্থন করেন এবং আমির রূপে স্বীকৃতিও দেন। কিন্তু আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর হিশাম যখন আমির হইয়া

কর্দোবার শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করিলেন তখনই তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয় তাঁহার বিরুদ্ধাচারণ শুরু করেন। উভয়েই হিশামকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্য বিভিন্ন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। একটি পরিকল্পনা মোতাবেক উভয়ে এক বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করিয়া তলেদোতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। হিশাম তাহার ভ্রাতাদিগকে অনর্থক লোকক্ষয় না করিয়া একটি সম্মানজনক ও শান্তি চুক্তি করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের অনমনীয় মনোভাবের জন্য হিশামের চেষ্টা সফল হয় নাই। অতঃপর সামরিক শক্তি পরীক্ষায় উভয় পক্ষ বুলক প্রান্তরে সমবেত হয়। হিশামের বিশ হাজার সৈন্য ও ভ্রাতৃদ্বয়ের পনের হাজার সৈন্য এই ভ্রাতৃযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধে সুলায়মান পরাজিত হইয়া মুরসিয়াতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আবদুল্লাহ বাধ্য হইয়া বশ্যতা স্বীকার করেন। আমির হিশাম তাহাকে তলেদোর সন্নিকটে জায়গীর প্রদান করেন। সুলায়মান পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করিতে পারেন নাই। তাই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মুরসিয়াতে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেন। হিশাম তাহার ভ্রাতার পুনরায় বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপে বিশেষ দুঃখিত হন। তাহার পুত্র মুয়াবিয়াকে একদল সৈন্যবাহিনী দিয়া মুরসিয়াতে প্রেরণ করেন। সুলায়মানের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না। তিনি লোরসার রণক্ষেত্রে ৭৯০-৯১ সালে ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকটেও পরাজয় বরণ করেন। সুলায়মান অতঃপর তাহার কৃতকর্মের জন্য হিশামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। হিশাম তাঁহাকে ক্ষমা করেন এবং স্পেন ত্যাগ করিবার নির্দেশ প্রদান করেন। সুলায়মান হিশামের নিকট তাঁহার জায়গীর ষাট হাজার স্বর্ণ মুদ্রায় বিক্রয় করিয়া তানজিয়ারে গমন করেন। আবদুল্লাহও তাঁহার ভ্রাতার সহিত তানজিয়ারে গমন করেন। এইভাবে হিশাম ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইয়া তলেদো ও মুরসিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

পূর্ব স্পেনে বিদ্রোহ

ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করিয়া সাঈদ বিন হুসাইন বিন ইয়াহয়া আল আনছারী তরতোসাতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইয়াহয়া রাজস্ব সংগ্রাহক ইউসুফ কায়সীকে বিতাড়িত করিয়া সেখানে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। হিমারীয়দের এহেন দেশদ্রোহী মূলক কার্যকলাপে ক্ষিপ্ত হইয়া মুধারীয়গণ তাঁহাদের নেতা মুসার নেতৃত্বে আমির হিশামের অনুকূলে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে হিমারীয় বিদ্রোহী নেতা নিহত হইলে মুসা তরতোসার ক্ষমতা দখল করেন। বিদ্রোহীগণ নিহত নেতার সহকারী হাজারের নেতৃত্বে আবার গোলযোগ শুরু করে। এই সময়ে সুলায়মান বিন আকজানের পুত্র মাতরূহ বারসিলোনাতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মুসা এই বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া পরাজিত ও নিহত হন। ফলে তরতোসা, বারসিলোনা, হিউসকা ও তারাগোনা হিশামের হাত ছাড়া হইয়া যায়। বিদ্রোহীগণ এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি দখল করিবার পর বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে। তাহাদের ক্রমবর্ধমান শক্তি কর্দোবার শাসন ক্ষমতাকে অতিশয় শঙ্কিত করিয়া তোলে। কিন্তু হিশাম বিদ্রোহীদের শক্তিতে মনোবল হারান নাই। ইহাদের গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সংবাদ লাইয়া অতি দ্রুত গতিতে ভ্যালেনসিয়ার গভর্ণর আবু উসমান উবাইদুল্লাহকে এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী লইয়া বিদ্রোহীদের মোকাবেলার নির্দেশ প্রদান

করেন। আবু উসমান উবাইদুল্লাহ্ প্রথমে সারাগোসা আক্রমণ করিয়া মাতৃরূহকে পরাজিত ও নিহত করেন। মাতৃরূহের নিহতের পর অবশিষ্ট অঞ্চলগুলি অতি অল্পসময়ের মধ্যে উসমান পুনরায় কর্দোবার শাসনে আনিতে সক্ষম হন।

ফ্রান্স অভিযান

আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধান করিয়া হিশাম ফ্রান্সের দিকে দৃষ্টি দেন। নারবোঁ ও ইহার চতুপার্শ্বস্থ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় ফ্রান্সগণ অবিরামভাবে হত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসকার্য চালাইতে থাকে। তাহারা প্রায়ই দলবদ্ধভাবে অতর্কিতে মুসলিম পল্লীতে হানা দিত। অগ্নিসংযোগ লুটতরাজ ও হত্যা দ্বারা পল্লীগুলিকে জনশূন্য করিয়া তুলিত। মধ্যে মধ্যে ক্ষেতের ফসলহানি করিয়া মুসলমানদিগকে চরম সঙ্কটে নিক্ষেপ করিত। এইভাবে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের দ্বারা মুসলিম জনপদগুলিতে তাহারা দারুণ সন্ত্রাস কায়েম করে। সেই সময় এমন অবস্থা বিরাজ করিতেছিল যে, একদিকে ছিল মুসলিম সভ্যতা এবং অন্য দিকে ছিল খ্রিস্টানদের বর্বরতা। খ্রিস্টানদের নির্মমতার হাত হইতে মুসলমানদের উদ্ধার করিবার জন্য আমির হিশাম ৭৯২ সালে আবু উসমানের নেতৃত্বে একদল সৈন্যবাহিনী দক্ষিণ ফ্রান্সে প্রেরণ করেন। এই সৈন্যবাহিনীর একাংশ আবদুল মালিক বিন আবদুল ওয়াহিদের নেতৃত্বে কারদেনজ অধিকার করিয়া নারবোঁতে পরাজিত করেন। সুদীর্ঘ বত্রিশ বৎসর পরে নারবোঁতে পুনরায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল জেরোনাতেও মুসলিম আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে শার্লেমেন কিংবা তাহার পুত্র লুইস কেহই মুসলমানদিগকে বাধা প্রদান করিতে পারেন নাই। কারণ তাঁহারা তখন জার্মানী ও ইটালীতে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। টুলুসের ডিউক উইলিয়াম মুসলমানদিগকে বাধা প্রদান করেন কিন্তু প্রবল আক্রমণের মুখে টিকিতে না পারিয়া পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। ফলে আবার সপ্ত নগরী (সেপটিমনিয়া) মুসলমানদের দখলে আসে। চল্লিশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী লইয়া আবদুল করিম বিন আবদুল ওয়াহিদ আস্তুরিয়া ও গ্যালিসিয়া আক্রমণ করেন। বারমুডা (১ম) ও আলফানসো (২য়) মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা করিতে আসেন। কিন্তু কয়েক দফা যুদ্ধের পর তাহারা উভয়েই পরাজিত হন। ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুসলমানদের দখলে আসে। মুসলমানদের অব্যাহত বিজয়ে শঙ্কিত হইয়া তাঁহারা আমির হিশামের সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন।

ফ্রান্সের সহিত মুসলিম স্পেনের সম্পর্ক কোন দিনই ভাল ছিল না কারণ খ্রিস্টানগণ সব সময়ই চাহিত যে মুসলিম শাসন ফ্রান্স হইতে উচ্ছেদ হউক। মুসলমানদের সভ্যতা আর সমৃদ্ধি তাহারা সহ্য করিতে পারিত না। তাই মুসলমানদের উৎখাতের জন্য সর্বদা সামরিক শক্তি লইয়া উদ্যত থাকিত। সুদীর্ঘ ৩২ বৎসর খ্রিস্টানগণ ক্রমাগত অত্যাচার ও অবিচারের পর এই প্রথমবার তাহাদের বিরুদ্ধে সার্থক অভিযানে বিজয় লাভ করিবার ফলে রাজধানী কর্দোবাতে জনগণের মধ্যে দেখা দেয় বিজয় উল্লাস। আমির হিশামের প্রতি তাহারা জানায় প্রাণঢালা অভিনন্দন। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর প্রত্যাবর্তন পথে খ্রিস্টানগণ অতর্কিত হামলার ফলে বহু মুসলিম সৈন্য নিহত হয়। তবুও ফ্রান্সে মুসলিম আধিপত্য পূর্ব হইতে অনেক

দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আমির হিশাম বহু মূল্যবান যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদি লাভ করেন। এইগুলির মূল্য ছিল প্রায় ৪৫,০০০ স্বর্ণ মুদ্রা। এই অর্থ হইতে তিনি সৈন্যবাহিনীর নির্ধারিত অংশ বন্টন করিয়া অবশিষ্টাংশ জনহিতকর কার্যে ব্যয় করেন।

মালেকী মাজহাবের পৃষ্ঠপোষকতা

হিশাম অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ আমির ছিলেন। তাহার চরিত্রের বড় দুর্বলতা ছিল যে, তিনি এক জ্যোতিষীর নিকট শুনিয়াছিলেন যে, মাত্র ৮ বৎসর তিনি রাজত্ব করিতে পারিবেন। এই জন্য নিজেকে সর্বোতভাবে প্রস্তুত রাখতেন কখন তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইবে। তিনি অত্যধিক নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মের অনুশাসনগুলি পালন করিতেন। ধর্মের জন্য নিবেদিত ও উৎসর্গিত ব্যক্তিগণকে তিনি রাজকোষ হইতে অর্থ সাহায্য করিতেন। অন্ধকার রজনীতে বাদলধারা ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুদ্ধ আবহাওয়া উপেক্ষা করিয়া যাহারা মসজিদে ইবাদতের জন্য উপস্থিত হইতেন, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ ছিল সর্বাধিক। নিজে যেমন যত্ন সহকারে ধর্মের বিধান পালন করিতেন তেমনি অপরকেও তাহা পালনের জন্যে নির্দেশ দিতেন। এই সময় পবিত্র নগরী মদীনাতে প্রখ্যাত ইমাম বিন আনাস ধর্ম প্রচার ও ধর্মীয় বিধান রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য এশিয়া, আফ্রিকা ইউরোপ পর্যন্ত প্রসার লাভ করে।

কিন্তু আব্বাসীয় খলিফা আল মনসুর ইমাম মালিক বিন আনাসের মতবাদ অনুসারী না হওয়ায় ইমামের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতেন। তবে ইমাম সাহেব খলিফার অনুগ্রহ অথবা নিগ্রহ কোনটারই পরওয়া করিত না। কোরআন ও সুন্নাহর শিক্ষাকে সমুন্নত রাখিবার জন্যই তিনি সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখিতেন। এই বিখ্যাত হাদীস শাস্ত্রবিদের নিকট হাদীস ও ইসলামের বাণী শিক্ষার জন্য বহু দেশ হইতে বহু ছাত্র উপস্থিত হইত। ইমাম সাহেবের পাণ্ডিত্যের কথা শ্রবণ করিয়া আমির হিশাম অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং ইমাম সাহেবকে স্পেনে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু ইমাম সাহেব পবিত্র নগরী ছাড়িয়া কোথাও যাইতে সম্মত ছিলেন না। অগত্যা আমির তাঁহার দেশের শিক্ষার্থীগণকে পবিত্র নগরীতে গিয়া ইমাম সাহেবের নিকট শিক্ষা লাভ করিবার জন্য ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেন। ইমাম মালেকের মাজহাবকে হিশাম রাষ্ট্রীয় মাজহাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার অধীনে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিত জনকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। ইমাম মালেককে স্পেনীয় দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। ইমাম মালেকের স্পেনীয় ছাত্রগণের মধ্যে ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়া, ঈসা বিন দীনার ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত খ্যাতিমান ছাত্রদের দ্বারা ইমাম সাহেবের শিক্ষা ও তাঁহার সঙ্কলিত হাদিস "কিতাবুল মোয়াত্তা" স্পেনের সর্বত্রই প্রচারিত হয়। হিশাম ফকিহ বা আইন শাস্ত্রবিদগণকে বিশেষ সমাদর ও সম্মান করিতেন। এই জন্য রাজদরবারে আলেম ও ফকিহদের প্রভাব বিশেষ বৃদ্ধি পায়। আমির যদি ইসলামের খুঁটিনাটি আচার পালনে উদাসীন হইতেন তবে আলেমগণ তাঁহাকে তিরস্কার করিতে দ্বিধা করিতেন না। এমনিভাবে মালেকী মাজহাবের ফকিহগণ আমিরকে প্রভাবিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

জনগণের দুঃখ দুর্দশা মোচনের জন্য হিশাম ছিলেন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। জনগণের সেবা করিবার জন্যই যে রাষ্ট্রনায়কদের ক্ষমতা গ্রহণ, সে কথা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন এবং জনসেবার জন্য নিজেকে একান্তভাবে উৎসর্গ করেন। "অত্যন্ত সাধারণ পরিচ্ছদে নিজেকে আবৃত করিয়া তিনি একাকী রাজধানীর পথে ভ্রমণ করিতেন। সাধারণ জনগণের সংগে মিলিতেন, রোগীর শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হইতেন, দরিদ্রের কুঠীরে প্রবেশ করিয়া আপন জনের ন্যায় সান্ত্বনার বাণী শুনাইতেন এবং সুখ-দুঃখ ও অভাব অভিযোগের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হইতেন।"[১] ন্যায়পরায়ণতা, দানশীলতা ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন ছিল তাঁহার চরিত্রের ভূষণ। মাঝে মাঝে দরিদ্র কুঠীরে খাদ্যের বস্তা লইয়া উপস্থিত হইতেন। রুগ্ন ব্যক্তির পার্শ্বে বসিয়া একান্ত আপনজনের ন্যায় সান্ত্বনার বাণী শুনাইতেন। অত্যাচারিত অথবা দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিতেরা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজিয়া পাইত তাহার নিকট। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, সদাশয় ও মহানুভব আমির। সত্যিকারে তিনি ছিলেন ধার্মিক ও গুণের প্রতিমূর্তি।[২]

জ্ঞানী ব্যক্তিদের তিনি যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেন এবং তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষতায় তিনি ছিলেন উদার ও অকৃপণ। তাহার রাজত্বকালে প্রখ্যাত কবি আমির বিন আলী গাফফার, বিখ্যাত ফকিহ ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়া ও ঈসা বিন দীনার প্রমুখ মনীষীগণ তাঁহার দরবার অলঙ্কৃত করেন। "যৌবনে তাহার প্রাসাদ বিজ্ঞানী, কবি ও ধর্মশাস্ত্রবিদগণের দ্বারা অলঙ্কৃত থাকিত।"[৩]

উমাইয়া বংশের বুনিয়াদ দৃঢ়করণ

আবদুর রহমান আদ দাখিল উমাইয়া বংশের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই ভিত্তির উপর ইমারত গঠনের ভার পড়ে তাঁহার উত্তরাধিকারীদের উপর। হিশাম অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করেন। ভ্রাতৃবিদ্রোহ ও পূর্ব স্পেনের গোলযোগ তিনি সাফল্যের সঙ্গে মোকাবেলা করিয়া উমাইয়া বংশের আসন্ন বিপদ দূর করেন। শুধু তাহাই নহে আভ্যন্তরীণ, গোলযোগ, বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দমন করিয়া তিনি বংশের গৌরব বৃদ্ধির জন্যও প্রচেষ্টা করেন। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযান অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়। সামরিক প্রতিভার দিক দিয়া খ্যাতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুদীর্ঘ ৩২ বৎসর পরে তিনি ফ্রান্সের পুনরায় মুসলিম জনপদে লুপ্ত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া মুসলিম গৌরব সমুন্নত করেন। দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ তাঁহার তিন পুত্র যথাক্রমে উমায়েদ আল মালেক, মুয়াবিয়া ও হাকাম তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য ও সহায়তা করেন। তাহা ছাড়া আবদুল ওয়াহিদ আল মুগিসের পুত্র আবদুল মালেক ও আবদুল করিম এই ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করেন।

তাঁহার রাজত্বকাল অল্প হইলেও তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া জনকল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি পিতার নিযুক্ত কর্মচারীগণকে অহেতুক বদলী না করিয়া পূর্বপদে

---

১. Dozy—Spanish Islam P—242

২. Ameer Ali—History of Saracens P—479

৩. Lane Pole—Moors in Spain P—71

বহাল রাখেন। তবে অসৎ ও কর্তব্যে উদাসীন কর্মচারীগণকে চিরদিনের জন্য বরখাস্ত করেন। তিনি শরীয়ত বিরোধী কোন কর আরোপ বা আদায় করেন নাই। ইসলামী বিধান মোতাবেক জাকাত ও সদকা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করেন। ধার্মিক, সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিদের সরকারী কার্যে নিয়োগ করেন। কাজী বা বিচারকগণকে তিনি ধার্মিকতার গুণে নিয়োগ করিতেন। তাঁহার সময়ে মোসাব বিন ইমরান কর্দোবার প্রধান কাজী ছিলেন। ব্যবসা বাণিজ্য ও যাতায়াতের সুবিধার জন্য সড়ক ও সেতু নির্মাণ করিয়া কর্দোবার গুরুত্ব তিনি বহুলাংশে বৃদ্ধি করেন। তাঁহার সময়ে স্থাপত্য শিল্পের নির্দশন কর্দোবার জামে মসজিদ সম্প্রসারণ। একলক্ষ ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে তিনি এইটি সম্প্রসারিত করেন। ইহা ব্যতীত দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, সরকারীভবন ও পুষ্পউদ্যান নির্মিত হয়। ৮ বৎসর রাজত্বকালে তিনি প্রশাসন, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি ও ব্যবসা বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি বিধান করেন।

মৃত্যু

মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে ৭৯৬ সালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার পুত্র হাকামকে ভাবী আমির মনোনীত করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হাকাম (প্রথম) (৭৯৬-৮২২)

[**সার সংক্ষেপ ঃ** সূচনা, হাকাম (১ম) ❑ ফকিহদের বিদ্রোহ ❑ পিতৃব্য বিদ্রোহ ❑ ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে অভিযান ❑ গথ সীমারেখা ❑ তলেদোর হত্যাকাণ্ড ❑ ভগ্নীপতির প্রতি ভুল ধারণা ❑ কর্দোবাবাসীদের বিদ্রোহ ❑ চরিত্র ও কৃতিত্ব ❑ মৃত্যু ।]

মহানুভব হিশামের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অত্যন্ত জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে কর্দোবার আমির হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ২২ বৎসর। ঐতিহাসিক ইবনুল আসির তাহাকে বিজ্ঞ, সাহসী ও অত্যন্ত মার্জিত রুচি সম্পন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। স্পেনের তিনিই প্রথম আমির যিনি নিজেকে অত্যন্ত সুন্দর ও নিখুঁতভাবে সাজ সজ্জা করিয়া রাখিতে ভালবাসিতেন। উত্তম পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সুগন্ধি দ্রব্যাদি মাখিয়া জাকজমকের সঙ্গে থাকিতেন। জাঁকজমকের প্রতি তাঁহার এত বেশি আকর্ষণ ছিল যে, রাজধানী যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সরকারী বাহিনী ও বিদ্রোহীগণের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় রাজধানী প্রকম্পিত, এহেন বিপদ মুহূর্তে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কেশবিন্যাস করিয়া পরিমল সুগন্ধি দিয়া নিজেকে পরিপাটি করিয়া সাজগোছ করিতেছেন যেন মহোৎসবে যোগদান করিবেন। তাঁহার এক সঙ্গী তাঁহাকে এহেন মুহূর্তে এমন অবস্থায় দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়াছেন— আপনার প্রাসাদ শত্রু কবলিত, সৈন্যগণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত আর আপনি নির্বিকারে কেশ্যবিন্যাসে নিমগ্ন ? উত্তরে হাকাম বলিয়াছিলেন— শত্রু সৈন্য দ্বারা যদি রণক্ষেত্রে নিহত হই তবে অসংখ্য মৃতদেহের মধ্যে তোমরা তোমাদের আমিরের মস্তককে চিনিবে কি করিয়া যদি দেহ হইতে সুগন্ধ সুরভিত না হয় অথবা কেশ বিন্যস্ত না থাকে ? তিনি শিকার ও প্রমোদ আহলাদে বিহার করিতে ভালবাসিতেন। আইনজ্ঞ ও ফকিহ বা শাস্ত্রবিগদগণ অপেক্ষা কবি, গায়ক ও অন্যান্য জ্ঞানী গুণীদের সঙ্গ বেশি পছন্দ করিতেন। তিনি অধার্মিক ছিলেন না। কিন্তু মদ্যপান তাঁহার চরিত্রের একটি কুঅভ্যাস ছিল।

তাঁহার সময়ে ফকিহদের বিদ্রোহ, পিতৃব্য বিদ্রোহ, ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে অভিযান, গথ সীমারেখা নির্ধারণ, তলেদোর হত্যাকাণ্ড, কর্দোবা বাসীর বিদ্রোহ প্রভৃতি ঘটনা সবিশেষে উল্লেখযোগ্য।

ফকিহদের বিদ্রোহ

আমির হিশাম ফকিহদিগকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়া রাজ্যশাসন ব্যাপারে তাঁহাদের মতামতের গুরুত্ব প্রদান করিতেন। তাই ফকিহগণ রাজ্যশাসন ব্যাপারে আমিরের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেন। রাজ্যশাসনে ধর্মের সার্থক সংগতি রক্ষা করিয়া তাঁহারা ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। এই ধর্ম শাস্ত্রবিদ এবং ফকিহগণের মধ্যে ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়া এবং ঈসা বিন দীনার প্রমূখ নেতৃস্থানীয় ছিলেন। কিন্তু হাকাম আমির ফকিহদের ক্ষমতা হ্রাস করেন এবং রাজ্য শাসন ব্যাপারে তাহাদের মতামত উপেক্ষা করিয়া চলিতে থাকেন। ইহা ব্যতীত আমির হিশামের চরিত্র হাকাম হইতে ভিন্ন ছিল। ফকিহদের দৃষ্টিতে নূতন আমিরের কার্যকলাপ ধর্মীয় অনুশাসন বহির্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইত। সুরাসক্ত, সংগীত প্রিয়, বিলাস ও প্রমোদবিহারী হাকামকে ফকিহগণ কোনক্রমেই সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহারা হাকামের চরিত্রে ও ব্যবহারে ক্ষুদ্ধ হইয়া খুতবাতে তাঁহাকে অভিশাপ দিতে শুরু করেন। আমিরের অনৈসলামিক কার্যকলাপ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করিতে থাকেন। এই সময়ে ফকিহগণ নওমুসলিমদের দাবীদাওয়া লইয়াও সোচ্চার হইয়া উঠেন। নওমুসলিমগণের সামরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সমভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহারা আন্দোলন শুরু করেন। তাঁহারা ফকিহগণকে খুবই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তাই আমিরের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিতে তাঁহারা ফকিহগণকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিলেন। দরবারের এক শ্রেণীর অমাত্যবর্গও ফকিহদের সমর্থনে সাড়া দেন। ফলে ফকিহদের শক্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। ফকিহগণ মুহাম্মদ বিন কাসিম (ইসলাম) নামক এক ব্যক্তিকে আমির করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম আমিরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পরিণতি ও ফকিহদের শক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেবহাল ছিলেন। তাই তিনি বিদ্রোহীদের সমস্ত ষড়যন্ত্র আমিরের নিকট ফাঁস করিয়া দেন। আন্দোলন দানা বাঁধিবার পূর্বেই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া হাকাম ইহাকে অংকুরেই বিনষ্ট করিবার ব্যবস্থা করেন। কর্দোবার প্রখ্যাত দুইজন অমাত্যসহ ৭২ জন ফকিহ ও অন্যান্য বিশিষ্ট নেতাকে হত্যা করেন। ফকিহ শ্রেষ্ঠ ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়া ও ঈসা বিন দীনার কোনক্রমে তলোদেতে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করেন। এইভাবে হাকাম ফকিহদের প্রাথমিক বিদ্রোহ দমন করেন।

পিতৃব্য বিদ্রোহ

হিশামের মৃত্যুর পর তাঁহার বিতাড়িত ভ্রাতৃদ্বয় সুলায়মান ও আবদুল্লাহ পুনরায় স্পেনের ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় মাতিয়া উঠেন। তানজিয়ার হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভ্যালেনসিয়া ও তলেদোতে নিজেদের স্বপক্ষে সমর্থন সংগ্রহ করিতে থাকেন। তাঁহারা জনগণের মধ্যে নিজেদের যোগ্যতা সম্পর্কে বলিতে গিয়া বলেন, যে, আবদুর রহমান আদ-দাখিলের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিধায় তাহাদের ক্ষমতাদখল প্রশ্ন ন্যায়সংগত ও বৈধ। হিশাম ও তাঁহার পুত্র হাকাম অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করিয়াছেন। প্রচারের মাধ্যমে নিজেদের দলে বেশ কিছু সমর্থক সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। সুলায়মান তাঁহার বন্ধুবান্ধবের সহায়তায় তলেদো, ভ্যালেনসিয়া

ও তুদমির হইতে অর্থ ও বেশ কিছু সৈন্য সংগ্রহ করেন। জনগণ ও সৈন্যদের এই বলিয়া প্রলোভিত করেন যে ক্ষমতা দখলের পর তাহাদিগকে উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত করা হইবে। আবদুল্লাহও তাঁহার পুরাতন গুণগ্রাহীদের লইয়া তলেদোতে বেশ শক্তি সঞ্চয় করেন। তাঁহারা উভয়েই হাকামের সামরিক শক্তি সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখিতেন না। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যদি সিংহাসন দখল নাও করা যায় তথাপিও বেশ কিছু অঞ্চল হস্তগত করা সম্ভব হইবে। প্রথমে আবদুল্লাহ তলেদোতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। হাকামকে সিংহাসনচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি ফ্রান্সের শার্লেমেনের নিকট সাহায্য কামনা করেন। এই সময়ে সুলায়মানও তাঁহার বিপুল সমর্থকসহ তলেদোতে আবদুল্লাহর সঙ্গে যোগ দেন। উভয়ের সম্মিলিত সৈন্য লইয়া হাকামের অপেক্ষায় তাগুস নদের তীরে অপেক্ষা করিতে থাকেন। হাকাম পিতৃব্যদের বিদ্রোহের বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া এক বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হন। ৮০১ সালে উভয়পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হন। কতিপয় খণ্ডযুদ্ধের পর কারীসার রণক্ষেত্রে হাকাম সুলায়মানকে পরাজিত করেন। সুলায়মান পরাজিত হইয়া মেরিদার দিকে পলায়ন করেন। কিন্তু পলায়ন পথে তিনি ধৃত হইয়া নিহত হন। তাহার বহু সৈন্যও নিহত হয়। তাঁহার পরিবার পরিজনকে সারোগোসায় আনিয়া হাকাম জায়গীর প্রদান করেন। আবদুল্লাহ ভ্যালেনসিয়াতে পলায়ন করেন। তাহার দুই পুত্র আসবাগ ও কাসেমকে কর্দোবাতে জামিনস্বরূপ রাখেন। হাকাম আসবাগের সংগে আপন ভগ্নীর বিবাহ দিয়া তাহাকে মেরিদার গভর্ণর নিযুক্ত করেন।

ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে অভিযান

পিতৃব্যদের বিরুদ্ধে সমরায়োজনের সময় ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলে মুসলিম জনপদে ফ্রাঙ্কদের অত্যাচারের সংবাদ হাকামকে অত্যধিক বিচলিত করে। শার্লেমেনের পুত্র লুইস অত্যন্ত নির্মমভাবে নারবোঁ ও জেরোনা মুসলমানদিগকে উৎখাত করে। হিউসকা ও লেরিদার গভর্ণরদ্বয়ও ফ্রাঙ্কদের সঙ্গে যোগ দেয়। ফ্রাঙ্কদের এই নির্যাতনমূলক কার্যকলাপ রোধের জন্য তিনি অবিলম্বে সেনাপতি আবদুল করিমকে এক বিশাল বাহিনী দিয়া ফ্রান্সে প্রেরণ করেন। প্রখ্যাত সেনাপতি আব্দুল করিম অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া ফ্রাঙ্কদিগকে পরাজিত করিয়া হৃত জেরোনা হিউসকা এবং লেরিদা পুনরুদ্ধার করেন। এইভাবে হাকাম ফ্রাঙ্কের বিরুদ্ধে বিপুল সাফল্য অর্জন করিয়া তিনি তাহার প্রভাব ও ক্ষমতাকে আরও সুদৃঢ় করিতে সক্ষম হন।

গথ সীমারেখা নির্ধারণ

শার্লেমেনের তীব্র বাসনা ছিল সমগ্র স্পেন বিজয় করা। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার জন্য সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। তবে মুসলিম শক্তির অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করা ও বারংবার তাহাদের হাতে পরাজয় বরণের হাত হইতে নিষ্কৃতির একটি ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করেন। ৭৯৮ সালে স্পেনের দিকে পীরেনীজ পাদদেশে একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সীমানা চিহ্নিত করে। এই অঞ্চলটি ছিল পীরেনীজ হইতে এবরোনদ ও প্যাম্পপ্লোনা

হইতে বারসিলোনা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ভূভাগে ফ্রাঙ্কের আধিপত্য কায়েমের বিবিধ কারণ ছিল। প্রথমতঃ মুসলমানদের পীরেনীজ অতিক্রম করিয়া ফ্রান্সে প্রবেশ প্রতিহত করা এবং দ্বিতীয়তঃ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া স্পেন গ্রাস করা। অকিটেন অধিপতি লুইসের তত্ত্বাবধানে এই অঞ্চলের প্রথম গভর্ণর হইলেন বোরেল। ৮০১ সালে খ্রিস্টানগণ বারসিলোনা দখলের উদ্দেশ্যে এক ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সেনাবাহিনীর একদল নগর অবরোধ ও অন্যদল রাজধানী কর্দোবা হইতে সাহায্যস্বরূপ সৈন্য আগমনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

ফ্রাঙ্কদের গৃহীত ব্যবস্থা বিশেষ ফলদায়ক হয়। অবরোধ চলাকালীন নগরবাসী খাদ্য ও রসদের অভাবের সম্মুখীন হয়। হাকামের সাহায্য বিলম্বে আসিবার দরুণ নগরবাসীদের প্রতিরক্ষার প্রচেষ্টা বিফল হয়। ফ্রাঙ্কগণ অতি সহজেই বারসিলোনা দখল করে। বারসিলোনা দখলের পর ফ্রাঙ্গগণ দ্রুতগতিতে হিউসকা, তারাগোনা ও অন্যান্য জনপদগুলিও দখল করে। এইবার তাহারা তলেদোর দিকে অগ্রসর হয়। আমির হাকাম এইবার সুযোগতম ফ্রাঙ্কবাহিনীর সমুচিত শিক্ষার জন্য একদল সৈন্য নগর রক্ষায় রাখিয়া ফ্রাঙ্কদের মোকাবেলা করেন। মুসলিম বাহিনীর তীব্র আক্রমণে ফ্রাঙ্ক বাহিনী পরাজয় বরণ করিয়া আপন দেশে প্রাণরক্ষাকল্পে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর হাকাম সমস্ত হৃত এলাকা পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু বারসিলোনা ফ্রাঙ্কদের অধিকারে থাকিয়া যায়। ৮০৬ সালে লুইস পুনরায় মুসলিম রাজ্যে আক্রমণ চালান কিন্তু আমিরজাদা আব্দুর রহমানের নিকট পরাজয় বরণ করেন। ৮০৭ সালে আবার ফ্রাঙ্কগণ মুসলিম সীমান্তবর্তী দুর্গগুলির উপর আঘাত হানে। এইবার আমির স্বয়ং ফ্রাঙ্কের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়, কিন্তু এইবারও ফ্রাঙ্কগণ পরাজিত হয়। ইহার পর ফ্রাঙ্কদের সংগে হাকামের এক শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। ফলে পরবর্তী ৭ বৎসরের মধ্যে আর ফ্রাঙ্ক-মুসলিম সংঘর্ষ হয় নাই।

তলেদোর হত্যাকাণ্ড

তলেদো স্পেনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। গথদের সময় তলেদো ছিল স্পেনের রাজধানী। তাই রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও আভিজাত্যের দিক হইতে মুসলিম রাজধানী কর্দোবার পরেই ইহার স্থান। এখানকার জনসংখ্যার মধ্যে ছিলেন আরব, নওমুসলিম, খ্রিস্টান ও কিছু সংখ্যক বার্বার। নওমুসলিমগণ আরবীয় মুসলমানদের মত সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতেন না। তাঁহারা এজন্য খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন। অন্যদিকে খ্রিস্টানগণ মুসলিম শাসন উৎখাত করিয়া হৃত শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যই সচেষ্ট ছিল। তবে তাহারা তাহাদের সেই বাঞ্ছিত আশা গোপন রাখিয়াই চলিত। নওমুসলিম ও খ্রিস্টানদের সমর্থনে উবায়দা বিন হামিদ তলেদোতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। হাকাম এই সংবাদ পাইয়া তালভিরার গভর্ণর আমরুস বিন ইউসুফকে তথায় বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করেন। যথাসময়ে আমরুস প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৈন্যবাহিনী লইয়া তলেদো অবরোধ করেন। তবে আমরুসকে বেশি কষ্ট করিতে হয় নাই। কারণ এই সময় বনু কাসীগণ কৌশলে উবায়দকে হত্যা করে। ফলে সহজে বিদ্রোহ দমন করিয়া আমরুস তলেদোতে শান্তি স্থাপন করেন এবং আমির

হাকামের নিকট হইতে ইহার গভর্ণর পদ লাভ করেন। তবে সদা চঞ্চলমতি তলেদোবাসী পুনরায় কবি গালিবের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। জনগণ অর্থাৎ তলেদোবাসীর নিকট গালিবের প্রভাব এতই বেশি ছিল যে, তাঁহার জীবদ্দশায় গভর্ণর তলেদোতে শান্তি স্থাপন করিতে পারেন নাই। কবি গালিবের মৃত্যুর পর আমরুস বিদ্রোহীদের শান্ত করিতে সমর্থ হন। তলেদোতে ভবিষ্যতে কোনরূপ বিদ্রোহ না দেখা দেয় এইজন্য আমরুস এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করেন। এই বিশিষ্ট কৌশল হাকামও অনুমোদন করেন। কৌশলটি হইল যে, আমিরজাদা আবদুর রহমান তলেদোতে রাষ্ট্রীয় সফরে আগমন করিবেন এবং সেই উপলক্ষে তলেদোর নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ করে হত্যা করা হইবে। ভোজসভার শেষে অভিনব উপায়ে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে হত্যা করা হইবে। যথাসময়ে আমিরজাদা তলেদোতে আগমন করেন এবং দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। বিশেষভাবে নবনির্মিত দুর্গে প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করা হয়। ভোজ উপলক্ষে এক এক জনকে ভোজকক্ষে প্রবেশ করানো হয় এবং তাহাদের সেখানেই প্রাণনাশ করা হয়। তাহাদের প্রাণহীন দেহগুলিকে একটি গর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে এইভাবে নৃশংস উপায়ে হত্যা করিয়া আমরুস ও আমির হাকাম বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেন। এই হত্যাকাণ্ডকে অনেকে Day of Ditch (Fosse) বলেন। "নিহত নেতৃবৃন্দের সংখ্যা বিভিন্ন বর্ণনায় ৭০০ হইতে ৫০০০ হাজারের অধিক দেওয়া হইয়াছে।"[১] এই নির্মম ষড়যন্ত্রমূলক হত্যার কবলে পড়িয়া তলেদোর যে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির জীবন অবসান হয় তাহা সত্য। সংখ্যা যেইটিই সঠিক হউক, কোনটাই কম নহে। এই সংখ্যার পর আর তলেদোতে নেতৃস্থানীয় লোক থাকিবার কথা নহে। তাই দেখা গিয়াছে যে তলেদোতে পরবর্তী ৭ বৎসরের মধ্যে আর কোন গোলযোগ বা বিদ্রোহ দেখা দেয় নাই। এইভাবে আমির হাকাম তলেদোতে শান্তি স্থাপন করেন।

ভগ্নীপতির প্রতি ভুল ধারণা

হাকাম তাঁহার ভগ্নীপতি আসবাগকে মেরিদার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। গভর্ণর হিসাবে আসবাগ প্রচুর দক্ষতা ও সুনাম অর্জন করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই প্রধান উজিরের সংগে তাহার মতবিরোধ দেখা দেয়। উজিরের ইচ্ছা ছিল আসবাগের পদচ্যুতি ঘটানো। তাই তিনি এই মর্মে হাকামকে অবহিত করাইলেন যে—আসবাগ বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনভাবে মেরিদায় শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। হাকাম আসবাগের নিকট হইতে কোন তথ্য সংগ্রহ না করিয়াই উজিরের পরিবেশিত সংবাদে বিচলিত হইয়া একদল সেনাবাহিনী মেরিদায় প্রেরণ করেন। আমিরের সৈন্যরা আসবাগের নিকট পরাস্ত হয়। এইবার হাকাম নিজেই সৈন্যবাহিনী লইয়া মেরিদায় উপস্থিত হইলেন। অহেতুক রক্তপাতের ও প্রাণনাশের আশংকায় ভীত হইয়া হাকামের ভগ্নী নিজেই তাঁহার তাঁবুতে উপস্থিত হন। বিষয়টি

---

১. Dozy—Spanish Islam P—248

বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিবার ফলে হাকাম প্রকৃত ঘটনা উপলব্ধি করেন এবং একটি শান্তিপূর্ণ সমঝোতায় উপনীত হন। ইহার এক বৎসর পর বেজাতে আবার বিদ্রোহ দেখা দেয়, কিন্তু সে বিদ্রোহ দমন করিতে তিনি সফল হন।

কর্দোবাবাসীদের বিদ্রোহ

ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে ফকিহ্গণের সংগে হাকামের সম্পর্ক ভাল ছিল না। ফকিহ্গণ কোন প্রকারেই আমিরকে ন্যায়সংগত ও শাস্ত্র অনুমোদিতভাবে স্বীকার করিতে পারিতেছিলেন না। চর্তুদিকে বিদ্রোহের দরুণ হাকাম নিজের নিরাপত্তার বিষয়ে একটু বেশি কড়াকড়ি ব্যবস্থা করেন। তিনি তাঁহার দেহরক্ষী বাহিনীতে বিপুল সংখ্যক নিগ্রো ও খ্রিস্টানদের নিয়োগ করেন। ইহার ফলে ফকিহ্গণ আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, হাকাম ৬০০০ হাজারের এক বিশাল দেহরক্ষী বাহিনী গঠন করেন। এই বিপুল সংখ্যক অতিরিক্ত বাহিনীর জন্য ব্যয়ভারও ছিল প্রচুর। তাই আমির বিভিন্ন করের মাধ্যমে কর্দোবাবাসীর নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেন। উপরন্তু নিগ্রো ও খ্রিস্টানগণ আরবী ভাষা জানিত না বলিয়া তাহাদিগকে মুক বলা হইত। দেহরক্ষী বাহিনীর সদস্যরাও নগরবাসীগণের সংগে ভাল ব্যবহার করিত না। একদা একজন দেহরক্ষী একজন কর্মকারের নিকট তাহার তলোয়ার ধারালো করাইবার জরুরী তলব দেয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে কর্মকার কাজটি দিতে অক্ষমতা জানাইলে সঙ্গে সঙ্গেই দেহরক্ষীটি তাহাকে হত্যা করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া জনসাধারণ বেশ উত্তেজিত হয়। তাহাছাড়া আমিরের ব্যবহারেও কর্দোবাবাসী বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল না। এই সমস্ত কারণে ফকিহ্গণ ও জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া একযোগে একদা আমিরের প্রাসাদ আক্রমণ করেন। বিক্ষুব্ধ জনগণ আমিরকে হত্যা করিবার সংকল্পে বদ্ধপরিকর হয়। আমির অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কৌশলের দ্বারা এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সার্থক মোকাবেলা করেন। তিনি তাঁহার বাহিনীকে দুইদলে বিভক্ত করেন। একদল বিদ্রোহীদের সংগে যুদ্ধ শুরু করে এবং একই সময়ে অন্যদল বিদ্রোহী যুদ্ধরত ব্যক্তিদের আবাসিক এলাকা "আরব-দেল-সুর" এ অগ্নিসংযোগ করে। তখন পরিবার পরিজনদিগের রক্ষায় বিদ্রোহীরা তাহাদের বাসভবনের দিকে অগ্রসর হয়। ফলে উভয়দিক হইতে তাহারা রাজকীয় বাহিনীর আক্রমণের মুখে নিক্ষিপ্ত হইয়া পরাস্ত হয়। এই যুদ্ধে বহু লোক হতাহত হয়। ৩৬ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিসহ ৩০০ জনকে নিম্নমুখী করিয়া ঝুলাইয়া প্রাণ হরণ করা হয়। আমিরের নির্দেশে "আরব-দেল-সুরের" ৮০০০ হাজার পরিবারকে তিন দিনের সময় দিয়া উচ্ছেদ করা হয়। এই নিষ্ঠুরতার হাত হইতে ফকিহ্প্রধান ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়া রেহাই পান। এই অসংখ্য ছিন্নমূল পরিবারগুলি মরক্কোতে আশ্রয় গ্রহণ করে। অসংখ্য বার্বার পরিবারকেও উচ্ছেদ করা হয় এবং তাহারা কেহ কেহ উদ্বাস্তু হইয়া ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপে অথবা আফ্রিকাতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপগুলিতে অভিযান

হাকাম নৌবহরের সাহায্যে ভূমধ্যসাগরীয় বেলারিক দ্বীপপুঞ্জে অর্থাৎ মের্জকা, ইভিকা ও সারদিনীয়াতে স্বীয়, আধিপত্য বিস্তার করেন।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

রাজ্যে পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহের জন্য আমির হাকামকে যথেষ্ট কঠোর ও নির্মম হইতে দেখা গিয়াছে। দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে তিনি কঠোরতম ব্যবস্থা লইতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। কোন প্রকারের গোলযোগ ও বিদ্রোহকে প্রশ্রয় দেয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন না। গুপ্তচর বাহিনীর মারফত রাজ্যের খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধেও সদা সর্তক দৃষ্টি রাখিতেন। উমাইয়া বংশকে স্পেনে প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রমূলক গুপ্তহত্যার আশ্রয় গ্রহণকে পর্যন্ত তিনি বৈধ হিসাবে পরিগণিত করিয়াছেন। কর্দোবা ও তলেদোর হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে শত শত পরিবারকে উচ্ছেদের দ্বারা তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, যে কোন পন্থার আশ্রয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠাই কাম্য। তাঁহার নিজের উক্তি হইতে তাঁহার চরিত্রের কিছুটা ইংগিত পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন– "যথার্থই একজন দর্জি যেমন টুক্‌রা টুক্‌রা বস্ত্রখণ্ডগুলিকে সুচের সাহায্যে জোড়া দেয় তেমনি আমি তরবারির সাহায্যে বিভক্ত ও বিছিন্ন প্রদেশগুলিকে সংহত ও একত্রিত করিয়াছি। কারণ ক্ষমতাপ্রাপ্তির সংগে সংগে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণার বস্তু ছিল খণ্ডবিখণ্ড রাজ্য .... শান্তিপূর্ণ প্রদেশ সমূহ তোমাকে অর্পণ করিলাম। হে পুত্র! এইগুলি আরামদায়ক আসনের ন্যায়, যেখানে কোনরূপ অশান্তি দেখিবে না। যাহাতে তোমার সুখ নিদ্রা ব্যাহত হইতে না পারে তাঁহার ব্যবস্থা করিয়াছি।"[১] তাঁহার চরিত্রে কঠোরতা ও নির্মমতা প্রকাশ পাইলেও ন্যায়বিচারে তাঁহার খ্যাতি ছিল প্রচুর। তিনি বিজ্ঞ, জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ ও চরিত্রবান ব্যক্তিদিগকে বিচারক পদে নিয়োগ করিতেন। বিচারকগণও ভয়-ভীতি ও স্বজন প্রীতি উপেক্ষা করিয়া আইনের রক্ষক হিসাবে বিচার কার্য পরিচালনা করিতেন। একদা আমিরের বিরুদ্ধে জায়েনের একজন ক্রীতদাসের মালিক প্রধান বিচারপতি মুসাবের নিকট এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, আমির তাঁহার একজন ক্রীতদাসকে ছিনাইয়া লইয়াছে। বিচারপতি হাকামের প্রতি নির্দেশ জারি করেন যে অবিলম্বে আসল মনিবকে যেন ক্রীতদাসটি ফিরাইয়া দেওয়া হয়। আমির বিচারপতি মুসাবের নির্ভীক বিচারকার্যে প্রীত ও মুগ্ধ হন এবং আদেশ পালন করিয়া ন্যায়বিচারের প্রকৃষ্ট নজীর স্থাপন করেন।

রাজ্যে সতত বিদ্রোহ দমনের জন্য তাঁহার এক বিশাল নিয়মিত সৈন্যবাহিনী রাখিতে হইত। তিনিই সর্বপ্রথমে সৈন্যবাহিনীকে নিয়মিত বেতন দিয়া সামরিক শক্তির যথাযোগ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন। সৈন্যদের সুযোগ সুবিধার দিকও তাঁহার দৃষ্টি ছিল প্রখর। রাজধানীর সন্নিকটস্থ গোয়াদাল কুইভার নদীর তীরে দুইটি সেনানিবাস স্থাপন করেন। সেনাবাহিনীতে নিগ্রো, খ্রিস্টান, বার্বার ও আরবগণকে জাতিধর্মনির্বিশেষে ভর্তি করেন। যাহা হউক,

১. Dozy—Spanish Islam P—249

সামরিক শক্তির সাহায্যেই তিনি আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বৈদেশিক আক্রমণকে যথার্থরূপে মোকাবেলা করিতে পারিয়াছিলেন। রাজ্যে ফকিহ্ বা উলামা অসন্তোষের দরুণ তিনি কোন সময়েই শান্তিতে ঘুমাইতে পারেন নাই। উলামাদের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষমূলক ব্যবহারই ইহার জন্য দায়ী। শেষজীবনে তিনি তাঁহাদের প্রতি কিছুটা উদারতা প্রদর্শন করেন এবং জায়েদ বিন আবদুর রহমান ফকিহর সঙ্গলাভে সমর্থ হন।

হাকাম অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনের জন্য শিকার, সংগীত আসরে যোগদান এবং কবিদের লইয়া কাব্যচর্চা করিতেন। তিনি জাঁকজমক ও চাকচিক্যময় পরিচ্ছদে বিভূষিত থাকিতে পছন্দ করিতেন। তাঁহার এই গুণগুলি তাহার উত্তরাধিকারী পুত্র আবদুর রহমানের মধ্যেও প্রকাশ লাভ করে।

মৃত্যু

সুদীর্ঘ ২৬ বৎসর রাজত্ব করিবার পর এই বিচিত্র চরিত্রের অধিকারী আমির ৪৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে গভর্ণর, সেনাপতি, সেক্রেটারী, মন্ত্রী ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমাবেশে তিনি তাঁহার পুত্র আবদুর রহমানকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান।

সপ্তম অধ্যায়

আবদুর রহমান (দ্বিতীয়) ৮২২-৮২৫

[**সার সংক্ষেপ ঃ** সূচনা, আবদুর রহমান (২য়) ❑ আবদুল্লাহর বিদ্রোহ ❑ তুদমির ও মেরিদার বিদ্রোহ ❑ তলেদোতে বিদ্রোহ ❑ খ্রিস্টান নেতাদের দুঃসাহসিকতা ❑ নরম্যান জল দস্যুদের উপদ্রব ❑ খ্রিস্টানদের আন্দোলন ❑ আবদুর রহমানের সভাসদবৃন্দ ❑ ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়া ❑ জিরাব ❑ নাসের- , সুলতানা তারুব ❑ বৈদেশিক দূত বিনিময় ❑ আবদুর রহমানের কৃতিত্ব ও চরিত্র ❑ মৃত্যু।]

আমির হাকামের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আবদুর রহমান কর্দোবার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল ৩১ বৎসর ৩ মাস ৬ দিন। শৌর্যবীর্য ও পাণ্ডিত্যে তাহার প্রতিভা ছিল অতুলনীয়। তিনি প্রাসাদ, উদ্যান, মসজিদ, ইমারত, সেতু, সড়ক, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতির দ্বারা কর্দোবাকে সুন্দর ও মনোরমভাবে সুসজ্জিত করেন। সৌন্দর্য চর্চা ও কাব্য-প্রীতিতে তিনি ছিলেন বিশেষ আগ্রহী। তাঁহার বিভিন্নমুখী গুণাবলীতে মুগ্ধ হইয়া বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন সময়ে সুন্দর সুন্দর মন্তব্য করেন। তাঁহার রুচি ছিল মার্জিত এবং প্রকৃতি ছিল ভদ্রতা ও শিষ্টাচারে মণ্ডিত।"[১] "তাঁহার রাজত্বকাল শান্তি ও আড়ম্বরপূর্ণ ছিল ; লোকেরা সমৃদ্ধ ছিল এবং প্রচুর রাজস্ব আমদানী হইত।"[২] "পরবর্তীকালে ইউরোপীয় নাইট সম্প্রদায় যে উন্নত সভ্যতা, পরিমার্জিত বীরত্ব এবং আরব শিষ্টাচারের কমনীয় সৌন্দর্য ও পরিপাট্য অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল তাহা এই যুগ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।"[৩] তবুও তাঁহার শাসন একেবারেই নিষ্কন্টক ছিল না। আবদুল্লাহর বিদ্রোহ, তুদমির, মেরিদা, তলেদোতে বিদ্রোহ, খ্রিস্টানদের দুঃসাহসিকতা, নরম্যান, জলদস্যুদের উপদ্রব, ধর্মান্ধ আন্দোলন প্রভৃতি তাঁহাকে বিশেষভাবে বিব্রত করে। কিন্তু অসীম সাহসিকতা ও রণনিপুণতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ফলে সমস্ত বিদ্রোহ দমন করিয়া তিনি রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন।

---

১. Lane poole—Moors in Spain P—78

২. সৈয়দ আমির আলী—আরব জাতির ইতিহাস পৃ—৪২২

৩. ঐ পুস্তকে—Sedillot এর উক্তি।

আবদুল্লাহর বিদ্রোহ.

আবদুর রহমানের সিংহাসনে আরোহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বহুবার পরাজিত ও যথেষ্ট বয়সে উপনীত আবদুল্লাহ সিংহাসনের দাবী লইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বারংবার ক্ষমতাদ্বন্দ্বে পরাজিত ও বিতাড়িত হওয়ার পরেও তিনি সিংহাসনের আশা ত্যাগ করে নাই। তাই হাকামের মৃত্যুর পর আর একবার ভাগ্য পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন।

"আবদুর রহমানের (১ম) পুত্র আবুদল্লাহ তানজিয়ার হইতে যখন সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আল-হাকামের জীবনাবসান হইয়াছে, তখন ইহাই প্রতীয়মান হইতেছিল যে, বয়সের শুভ্রতা তাঁহার অন্তরের প্রজ্জলিত আকাঙ্ক্ষাকে তখনও সম্পূর্ণভাবে নির্বাপিত করে নাই।"[১]

তিনি তানজিয়ার হইতে বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দ্রুতগতিতে স্পেনে প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিজেকে স্পেনের আমির বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার পুত্রদ্বয় এই সময়ে তাঁহাকে সম্পদ দিয়া সাহায্য করিবে। কিন্তু পুত্রদ্বয় বিদ্রোহী পিতাকে সাহায্য করেন নাই। ফলে রাজকীয় বাহিনীর সঙ্গে তাঁহাকেই যুদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু কয়েক দফা খণ্ড-যুদ্ধের পর আবদুল্লাহ পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। এইবার তাঁহার পুত্রদ্বয় আবদুর রহমানের নিকট পিতার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করেন। আবদুর রহমান অত্যন্ত সদয় হইয়া বৃদ্ধ আবদুল্লাহর প্রতি যথেষ্ট উদারতা প্রদর্শন করে তাঁহাকে মুরসিয়ার শাসনকর্তার পদ প্রদান করেন এবং সেখানেই তিনি বাকী জীবন শান্তির সঙ্গে অতিবাহিত করেন। মাত্র দুই বৎসর পর আবদুল্লাহ মৃত্যুমুখে পতিত হন। এইভাবে সিংহাসন অভিলাষী আবদুর রহমানের প্রথম পুত্র আবদুল্লাহর সংগ্রামী জীবনের অবসান ঘটে।

তুদমির ও মেরিদায় বিদ্রোহ.

আবদুল্লাহর বিদ্রোহ দমনের পর আবদুর রহামন সংবাদ পাইলেন যে, আরবদের গোত্রকলহ আবার শুরু হইয়াছে এবং হিমারীয় ও মুধারীয়গণ পরস্পর অস্ত্রের ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাই অনতিবিলম্বে তিনি সেখানে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। মুধারীয়গণই ছিল বেশি অশান্ত। আবদুর রহমান এইবার অভিনব পন্থা অবলম্ব করেন। তিনি মুধারীয় দলপতি আবুল সামাখ মুহম্মদ বিন ইব্রাহীমকে বাধ্যতামূলকভাবে রাজকীয় সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করিয়া দেন। অতঃপর লোরসা হইতে রাজধানী মুরসিয়াতে স্থানান্তরিত করিয়া স্থায়ী শান্তির পথ প্রশস্ত করেন।

৮২৮ সালে মাহ্মুদ বিন আবদুল জব্বার ও সুলায়মান বিন মারাতিনের নেতৃত্বে মেরিদার খ্রিস্টান ও ইহুদীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহের কারণ হিসাবে তাহারা অধিক কর নির্ধারণ এবং মন্ত্রী ও করসংগ্রাহকদের নির্যাতনের কথা উল্লেখ করে। কিন্তু মূলতঃ এই বিদ্রোহের ইন্ধন যোগায় অকিটেন অধিপতি লুইস। বিদ্রোহীগণ এত বেপরোয়া হইয়া উঠে যে, তাহারা রাজস্ব সংগ্রাহকের বাসভবন পর্যন্ত লুট করে এবং অনেককে হত্যা

১. A. J. Conde—History of the Arabs in Spain Vol. 1. P—268

করে। এই সময়ে বিদ্রোহীদের সংখ্যা চল্লিশ হাজারে পৌঁছায়। এই সংবাদ পাইয়া আবদুর রহমান বিদ্রোহীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য তলেদো হইতে আবদুর রউফের নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। কিছু সময়ের জন্য আবদুর রউফ সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় শান্তিস্থাপন করিতে সক্ষম হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাহারা আবার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে থাকে। বিদ্রোহীদিগকে সমুচিত শিক্ষা প্রদানের জন্য আবদুর রহমান এক বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া মেরিদাতে উপস্থিত হন। তিনি নগর অবরোধ করিয়া রাখেন। বিদ্রোহীদিগকে এইবার উপযুক্ত শাস্তিবিধান করিয়া নগরে শান্তি স্থাপন করেন। সাত হাজার বিদ্রোহীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। কিন্তু দলপতি মাহ্মুদ কৌশলে সারাগোসায় পলায়ন করেন এবং তথায় ৮৪০ সালে দ্বিতীয় আলফান্সো কর্তৃক নিহত হন।

তলেদোতে বিদ্রোহ

মেরিদা ও তুদমিরের বিদ্রোহ দমনের পর আবদুর রহমানকে তলেদোর ঘটনার দিকে মনোনিবেশ করিতে হয়। সেখানে ইহুদী, খ্রিস্টান ও নওমুসলমানগণ একত্রিত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আমির হাকামের রাজত্বকালে কর্দোবার এক কর্মকার পরিবার বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই পরিবারের এক সদস্য হাশিম এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব প্রদান করে। এই পরিবার বিশেষ উদ্দেশ্যে ৮২৯ সালে কর্দোবা হইতে তলেদোতে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। প্রতিশোধ গ্রহণের মানসে হাশিম অন্যান্যদের উত্তেজিত করিয়া বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ শুরু করে। বিদ্রোহীরা আরব ও বার্বারদের বাসগৃহে অগ্নিসংযোগ করে এবং আমরুসের দুর্গ বিধ্বস্ত করিয়া কয়েকজন রক্ষীকে হত্যা করে। আমির সীমান্তের শাসনকর্তা মুহম্মদ ইবনে ওয়াসিমকে হাশিমের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। প্রথমবারে ইবনে ওয়াসিম হাশিমকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু পর বৎসর রাজধানী হইতে প্রেরিত সৈন্য লইয়া তিনি হাশিমকে পরাজিত ও নিহত করেন। তবে বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারেন নাই। বহুবার সেখানে রাজকীয় বাহিনী প্রেরণ করিতে হয়। অবশেষে ৮৩৭ সালে আমিরজাদা ওয়ালিদ বিন হাকাম নগরটিতে সম্পূর্ণরূপে শান্তি স্থাপন করিতে সমর্থন হন। নগরটি বিদ্রোহ মুক্ত করিয়া তিনি জনগণের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। সুদীর্ঘ ৮ বৎসর পর সেখানে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতে থাকে। তিনি ভগ্ন ও বিধ্বস্ত দুর্গগুলি পুনঃনির্মাণ করিয়া সেগুলিকে যথেষ্ট শক্তিশালী করেন।

খ্রিস্টান নেতাদের দুঃসাহসিকতা.

স্পেনে মুসলিম শাসনকে খ্রিস্টানগণ কোনক্রমেই বরদাশ্ত করিতে পারিতেছিল না। এই শাসনকে উচ্ছেদ করিবার মানসে তাঁহারা অবিরতভাবে আক্রমণাত্মক অভিযান চালাইতে থাকে। প্রত্যেক আমিরকে তাহাদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হয়। আবদুর রহমানকেও তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হয়। লিয়োন প্রধান আলফান্সো (২য়) মদিনা-সালিম ও আরাগণের জেলাগুলিতে আক্রমণাত্মক তৎপরতা চালায়। তাহাকে অনুসরণ করিয়া গথসীমারেখার কাউন্ট বোরেল ও মুসলিম সেনাপতি আবদুল করিম বিন

মুগিস ও উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান (১ম) প্রেরিত হন। তাঁহারা সার্থকভাবে অভিযান চালাইয়া খ্রিস্টানদিগকে পরাজিত করেন এবং তাহাদের দুর্গ ও বরুজগুলি ধুলিস্যাত করিয়া দেন। তাহারা আত্মসমর্পণ করে এবং ইতিপূর্বে মুসলিম বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া দেয় ও উচ্চহারে কর দিতে স্বীকৃত হয়। তাহাদের সহিত দশ বৎসরের শান্তিচুক্তি হয়, ফলে ৮৩৮ সাল পর্যন্ত মুসলিম সীমান্ত নিরাপদ থাকে। কিন্তু ঐ সালের পরে মুসলমানদিগকে আবার খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে হয়। কিন্তু এইবার মুসলমানগণ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেন। খ্রিস্টানদের গণ্ডসীমারেখা বিধ্বস্ত করিয়া আস্তুরিয়া, গ্যালেসিয়া, আলভা, ক্যাষ্টাইল এমনকি প্যামপ্লোনা ও বারসিলোনা পর্যন্ত মুসলমানগণ তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করেন। এইভাবে খ্রিস্টানদিগকে বিতাড়িত করিয়া এই অঞ্চলগুলি মুসলমানদের দখলে আসে এবং সমগ্র উত্তরপূর্বে স্পেন খ্রিস্টান প্রভাব বিমুক্ত হয়।

নরম্যান জলদস্যুদের উপদ্রব.

নরম্যান জার্মানদের একটি গোত্র। তাহারা জলদস্যুবৃত্তিতে বিশেষ সিদ্ধহস্ত ছিল। হত্যা, লুন্ঠন ও বর্বরতায় উপকূলবর্তী নগরগুলি সব সময়ই সন্ত্রস্ত থাকিত। তাহাদের নির্মমতার শিকারে নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে নিগৃহীত হইত এবং প্রাণ হারাইত। এমনকি তাহারা গৃহপালিত পশুপক্ষীকেও নির্বিচারে হত্যা করিত। শস্যক্ষেত্র ও ফলবান বৃক্ষাদিও তাহাদের হস্তে বিনষ্ট হইত। তাহাদের নৃশংস অভিযানে বহু নগর শহর ও গ্রাম বিধ্বস্ত ও জনপ্রাণীশূন্য হইয়া পড়ে। ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের নদীবন্দরগুলি প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরিয়া তাহাদের সন্ত্রাস ও বিভীষিকার কবলে নিপতিত হয়। তাহাদের উপদ্রব জার্মানী, ইটালী, স্পেন ও আফ্রিকাতেও বিস্তার লাভ করে। ৮৪৪ সালে আটটি জাহাজ লইয়া নরম্যানগণ লিসবনের উপকূলে হানা দেয়। কাদিজ ও লিসবন লুন্ঠন করিয়া তাহারা সেভিলের অভিমুখে অগ্রসর হয়। সেভিল আক্রমণ করিয়া ৪২ দিন যাবৎ হত্যা, লুন্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাইতে থাকে। আবদুর রহমান এই দস্যুদের বিতাড়িত করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। নরম্যানগণ রাজকীয় সৈন্যের মোকাবেলায় পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। তবে তাহাদের মধ্যে এক হাজার নিহত হয় এবং চারিশত জন বন্দী হয়। তাহারা সেভিল ত্যাগ করিলেও আলজিসিরাসে তাহাদের কয়েক দফা সংঘর্ষও হয়। অতঃপর তাহাদের হাত হইতে স্পেনকে নিরাপদ রাখিবার জন্য আবদুর রহমান বন্দরনগরগুলিকে সুরক্ষিত করেন। স্পেনের মুসলমানগণ তাহাদিগকে ইয়াজুজ মাজুজ বলিত। সম্ভবতঃ তাহাদের নৃশংস কার্যকলাপের জন্য তাহাদিগকে ঐ নামে আখ্যায়িত করিত।

ধর্মান্ধ খ্রিস্টানদের আন্দোলন.

মুসলিম শাসনে স্পেনের খ্রিস্টানগণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করিত। শুধু ধর্মীয় ব্যাপারে নহে, বরং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সুযোগ তাহারা ভোগ করিত। তাহাদের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা সব সময়ে মুসলিম শাসক যথামর্যাদায় স্বীকৃতি দিতেন। তাহা সত্ত্বেও এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ ও গোড়া খ্রিস্টান মুসলমানদিগকে কোনক্রমেই

সহ্য করিতে পারিতেছিলনা। উপরন্তু মুসলমানদের উন্নতমানের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, রীতি-নীতি, ব্যবহার-পদ্ধতি ও সভ্যতা সংস্কৃতিতে মুগ্ধ হইয়া অনেক খ্রিস্টান নিজেদের ধর্ম পরিত্যাগ না করিয়া এই উন্নতমানের মার্জিত জীবন অনুসরণ ও অনুকরণ করিতে থাকে। আরবী সাহিত্য ও কবিতার ছন্দমাধুর্য এবং তামুদ্দুনিক গুণ শহরের অভিজাত শ্রেণীর খ্রিস্টানদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। খ্রিস্টানগণ তাই মুসলমানদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া মুগ্ধ হয় এবং অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু যাহারা মুসলমানদের জীবনযাত্রা গ্রহণ করা সত্ত্বেও আপন খ্রিস্টান ধর্মে অটল থাকে স্পেনীয় মুসলমানগণ তাহাদিগকে মুজাবর নামে অভিহিত করে। খ্রিস্টানদের মধ্য এইরূপ মুসলিম রীতি অনুকরণ প্রবণতা গোঁড়া খ্রিস্টানদের গাত্রদাহের সৃষ্টি করে। এমনিতেই তাহারা মুসলমানদিগকে বর্জন করিয়া চলিত ; তদুপরি স্বজাতির মধ্যে মুসলিম ভাবধারার অনুপ্রেবেশ তাহাদিগকে ভীষণভাবে উত্তেজিত করিয়া তোলে। তাহারা এই ভাবিয়া শংকিত হইয়া উঠিতেছিল যে, দেদীপ্যমান ইসলামের দীপশিখায় তাহাদের জরাগ্রস্ত জীর্ণ খ্রিস্টানধর্মের মূলরূপ তখন পরিবর্তিত হইয়া ধর্মযাজকদের খেয়ালখুশী মর্জির উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছিল। যুগযুগান্তরের স্বার্থ সম্পর্কিত রূপ পরিবর্তন অত্যাসন্ন ভাবিয়া তাহারা মুসলমানদের বিতাড়নের জন্য পথ ও পন্থার অন্বেষণ করিতে থাকে। শংকিত ও বিব্রত ধর্মান্ধ খ্রিস্টানগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে জঘন্য কুৎসা রচনা করিতে থাকে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)- কে জঘন্য ভাষায় গালি দিতে শুরু করে এবং ইসলামকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করিতে থাকে। এই উগ্র ও ক্ষিপ্ত খ্রিস্টানদের নেতৃত্ব দিতেছিলেন পারফেকটাস, ফ্লোরা, আলভারো, আইজ্যাক, সাং কো, লিওক্রাটস ও ইলুজিয়াস প্রমূখ ধর্মীয় নেতারা। তাহারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে শ্রেষ্ঠ ভণ্ড ও শয়তানের নবী (নাউজুবিল্লাহ) জন সমক্ষে প্রচার করিতে শুরু করে। কর্দোবা, তলেদো, সেভিল প্রভৃতি প্রধান শহরে এই ধর্মান্ধদের প্রচারণার কেন্দ্র ছিল। যদিও উদারপন্থীদের পক্ষ হইতে সময় সময় তাহাদের এই সমস্ত কার্য হইতে নিবৃত্ত থাকিবার জন্য ফরমান আসিত, তথাপিও তাহারা প্রবল উৎসাহের সঙ্গে তাহাদের কর্মতৎপরতা চালাইয়া যাইত। এই ফরমানগুলি তাহারা ভ্রূক্ষেপ করিত না। ধর্মান্ধ খ্রিস্টানদের এহেন হীন ও ঘৃণ্য কুৎসা ও জঘন্য প্রচারণা কোনক্রমেই মুসলমানগণ বরদাশ্‌ত করিতে পারেন নাই। প্রথমে আমির ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের তরফ হইতে খ্রিস্টানদিগকে সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকিতে বলা হয়। কিন্তু এই আবেদনে কোন সুফল হয় নাই। বরং তাহারা ধর্মীয় উন্মাদনায় দ্বিগুণভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রচারণা জোরদার করিয়া তোলে। তাহারা নিজদিগকে এই বলিয়া প্রচার করিতে থাকে যে, যদি তাহারা মুসলমানদের হাতে লাঞ্ছিত অথবা নিহত হয় তবে সেইটি হইবে খুবই খুশীর কথা। তাহার জন্য পরকালে তাহাদের বেহেশত অনিবার্য। তাহাদের প্রচারণা যখন জনমনে ভীষণ অসন্তোষ ও প্রতিবাদ সৃষ্টি করিল তখন বিশপ পারফেক্‌টাস, ইসাহাক ও স্যাংকোকে বন্দী করা হয় এবং বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায় তাহাদিগকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। ইহার এক বৎসর পর ফ্লোরাকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এইভাবে আন্দোলনের নেতাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ফলে ধর্মান্ধ আন্দোলন স্তিমিত হইয়া আসে। তবে আবদুর রহমানের মৃত্যুর পরও এই আন্দোলনের ধারা অব্যাহত থাকে। এই শ্রেণীর

উগ্র খ্রিস্টানগণ কখনও মুসলমানদিগকে সুনজরে দেখে নাই। "খ্রিস্টানগণের স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া অন্য ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া আত্মবিসর্জন দেওয়ার পিছনে কোন কারণ ছিল না। কারণ মুসলমানগণ তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম করিবার সুযোগ প্রদান করে। শুধু তাহাই নহে, তাহারা অনেক খ্রিস্টান অপেক্ষা বাইবেল সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখে এবং যীশু খ্রিস্টের নাম উচ্চারণের পর 'খোদা তাহার মঙ্গল করুন' এই কথা কোনসময় বলিতে ভুল করেন না।"[১] তাহারা রাজকীয় সৈন্যবাহিনীতে, "রাজপ্রাসাদের লোভনীয় রাজকর্মে ও কাচারীতে উচ্চপদে সমাসীন ছিলেন, তাহারা কোন অত্যাচারের সম্মুখীন হন নাই। স্বাধীনভাবে ধর্মকর্ম করতে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছিল না।"[২] "খ্রিস্টান ধর্মযাজকগণ মুসলমানদের ধর্ম সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা পোষণ করিত।"[৩]

খ্রিস্টানদের অপপ্রচার হইতে ইসলাম ধর্ম রক্ষা করিবার জন্য আবদুর রহমানের আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রচারের জন্য তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী স্পেনের মাটি ও মানুষের সঙ্গে সংমিশ্রিত করিবার দায়িত্ব যদি স্পেনের আমিরগণ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে শত শত বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করিবার পরও মুসলমানদিগকে স্পেনের ভূমি হইতে অসহায়ভাবে চিরতরে সির্বাসিত হইতে হইত না। এই করুণ দৃশ্য মুসলমানদের ইতিহাসে এক বিরল ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

আবদুর রহমানের সভাসদবৃন্দ

আবদুর রহমান সুধীমণ্ডলী দ্বারা পরিবৃত থাকিতেন। তবে চারজন ব্যক্তি তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেন। তাঁহারা হইলেন যথাক্রমে ফকিহ্ ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া, সঙ্গীতজ্ঞ জিরাব, মহীয়সী তারুব ও খোজা নাসের। এই চারজনই আপন আপন বিষয়ে যুগস্রষ্টা ছিলেন এবং আমিরকে নিজেদের প্রতিভাবলে প্রভাবিত করিতে সক্ষম হন।

ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া

আমির হিশামের রাজত্বকালে ইয়াহ্ইয়া মদীনাতে ইমাম মালিক বিন আনাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি একজন একনিষ্ঠ শিক্ষার্থী ছিলেন এবং ইমাম মালিকের ছাত্রদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র হিসাবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। স্পেনে তাঁহার পাণ্ডিত্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। হিশাম তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদরও সম্মান করিতেন এবং রাজ্যশাসন ব্যাপারে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু আমির হাকাম তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব মর্যাদা প্রদান করিতে অসম্মত হওয়ায় জনগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে এবং ইয়াহ্ইয়াকেও হাকামের বিরুদ্ধে কয়েকবার আন্দোলন করিতে হয়। যদিও হাকাম তাঁহাকে যথামর্যাদা দিতে চাহেন নাই তথাপিও স্পেনে তাঁহার জনপ্রিয়তা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় পাই। অতঃপর আবদুর

---

১. Lane poole—Moors in Spain P—86
২. Dozy—Spanish Islam P—264
৩. Ibid—271

রহমানের রাজত্বকালে ইয়াহ্ইয়া যথেষ্ট বয়সে উপনীত হন এবং জনগণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। আমির আবদুর রহমান তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদরে গ্রহণ করেন এবং দরবারের শ্রেষ্ঠ আসন তাঁহার জন্য নির্ধারিত রাখেন। আমির ইয়াহ্ইয়ার মর্যাদা এত বেশি দিতেন যে, জনগণ কোন ফরিয়াদ তাঁহার মাধ্যমে করিলে তিনি তাহা মনজুর করিতেন। ইয়াহ্ইয়া নিজে দরবারে কোন উচ্চপদের প্রত্যাশী ছিলেন না। তবে তাঁহার পরামর্শ আমির অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করিতেন। বিশেষ করিয়া যখন বিচারকপদে কাহাকেও নিয়োগ করিতেন তখন তিনি জ্ঞানবৃদ্ধ ফকিহ্র নিকট পূর্বাহ্নেই পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। "শাস্ত্রজ্ঞ ও ফকিহ্ ইয়াহ্ইয়া নূতন আমিরের মনের উপর নিরংকুশ আসন প্রতিষ্ঠা করেন।"[১] অতএব আমির আবদুর রহমান জনগণের ইচ্ছায় জ্ঞানবৃদ্ধ ফকিহ্কে উপযুক্ত আসনে সমাসীন করেন। ইয়াহ্ইয়া ৮৪৮ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আবুল হাসান বিন নাফে উরফে জিরাব

প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ জিরাব জাতিতে পারসিক ছিলেন। তিনি হারুন-অর-রশীদের দরবারে শ্রেষ্ঠতম গায়ক ইসাহক মৌসুলীর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। সুমিষ্ট কণ্ঠ, ছন্দায়িত সুর, নিরলস সাধনা ও সঙ্গীত রচনায় পারদর্শিতা তাঁহাকে অল্পদিনের মধ্যে বিশিষ্ট করিয়া তোলে। তাঁহার শিল্পী মন সর্বদাই সঙ্গীত সৃষ্টিতে মগ্ন থাকিত। মনপ্রাণ দিয়া তিনি সুরসৃষ্টি করিতেন। কথিত আছে যে, তাঁহার ওস্তাদ ইসাহক তাঁহাকে খলিফা হারুন-অর-রশীদের নিকট উপস্থিত করেন। ওস্তাদের ইচ্ছা তাঁহার শিষ্যের মধ্যে স্বীয় প্রতিভার স্বাক্ষরে মুগ্ধ হন খলিফা। ওস্তাদের নির্দেশক্রমে জিরাব খলিফার সকাশে অপূর্ব সুরের ঝংকার তুলিয়া একটি আপন সৃষ্ট সঙ্গীত পরিবেশন করেন। খলিফা জিরাবের সুর ও ছন্দে এবং সঙ্গীতের সারবুতে এত মুগ্ধ হইয়া যান যে, ইসাহকের সব স্মৃতি ও কীর্তি যেন একেবারেই সেখানে ম্লান হইয়া গেল। কিন্তু ইসাহক ছিলেন যশের ভিখারী ও প্রতিভা বিকাশের প্রতিদ্বন্দ্বী। ইসাহক এখন উভয়সংকটে নিপতিত। একদিকে তাঁহার শিষ্যের যশ অন্যদিকে তাঁহার সুনামের হ্রাস, কোনটিই যেন গ্রহণ করিতে পারিতেছিলেন না। অতঃপর একদা তিনি জিরাবকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার এখানে আর থাকা সম্ভব নয়। কারণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে গুরু-শিষ্যের সংঘাত অনিবার্য। তাই প্রতিভাকে ওস্তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী না করিয়া অন্যত্র বিকাশের পথ গ্রহণ করাই বিধেয়। এইবার জিরাব ওস্তাদের সাহায্য ও উপদেশ বিনীতভাবে গ্রহণ করিয়া সকলের অলক্ষ্যে বাগদাদ ত্যাগ করেন। তিনি ওস্তাদের যশের প্রতিবন্ধক না হইয়া অজানার উদ্দেশ্যে আপন ভাগ্য পরীক্ষার পথে বাহির হন। তিনি বাগদাদ ত্যাগ করিয়া মরক্কোতে আগলাবীয় সুলতানের দরবারে স্থানলাভ করেন। কিন্তু ভাগ্য সেখানেও প্রসন্ন ছিল না। একদা তিনি আগলাবীয় সুলতান জিয়াদাতুল্লাহর (৮১৬-৮৩৭) সমীপে প্রসিদ্ধ কবি আনতারার একটি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তাহাতে সুলতান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিয়া বিতাড়িত করেন। সঙ্গীতটির প্রথম কলি ছিল "আমার মা যদি কাকের মত কালো হতো"। ঘটনাচক্রে সুলতানের মাও কালো

১. Lane poole—Moors in Spain P—81

ছিলেন এবং সুলতান মনে করিয়াছিলেন যে, গায়ক তাঁহার মায়ের দেহের রং লইয়া উপহাস করিতছেন। গায়কের কি ইচ্ছা ছিল সেটা না জানা গেলেও এটা সুস্পষ্ট যে, রাজ অনুগ্রহপুষ্ট গায়কের এতদূর দুঃসাহস হওয়ার কথা নহে যাহা হউক, ভাগ্য বিড়ম্বিত গায়ক জিরাব স্পেনে খলিফা হাকামের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া পত্রপ্রেরণ করেন। হাকাম তাঁহাকে স্পেনে আমন্ত্রণ জানান। কিছুদিনের মধ্যে হাকামের মৃত্যু হওয়ায় জিরাব ইতস্ততঃ করিতেছিলেন নূতন আমির তাঁহাকে কিরূপে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু স্পেনে গমনের পর জিরাবের অজানা আশংকা মুহূর্তে তিরোহিত হইল। রাজকীয় সম্মানে তাঁহাকে রাজদরবারে গ্রহণ করা হইল। তাহার বসবাসের জন্য যুবরাজ-বসবাসযোগ্য সুরম্য প্রাসাদ অর্পণ করিলেন। এইবার আমির আবদুর রহমান তাঁহাকে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতে বলিলেন। জিরাব তাঁহার দেহমন উজাড় করিয়া নিবেদন করিলেন অপূর্ব ছন্দে তাঁহারই রচিত একখানি সঙ্গীত। আমির মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতিভার যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়া তাঁহাকে বার্ষিক ২৪০০০ স্বর্ণমুদ্রা বৃত্তি প্রদান করেন।

জিরাবের প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ ও বহুমুখী। ভিন্ন ছন্দ ও সুরে তাঁহার এক হাজার সঙ্গীত কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি শুধু সঙ্গীতে সকলের সেরা ছিলেন তাহাই নহে, বরং কবিতা, ইতিহাস, জ্যোর্তিবিজ্ঞান ও ভূগোলে তাহার অসাধারণ দখল ছিল। তিনি স্পেনের ইতিহাসে এক চাঞ্চল্যকর অধ্যায়ের রচনা করেন তাঁহার অপূর্ব মার্জিত রুচি ও উন্নত ব্যবহারিক জ্ঞানে। অঙ্গসজ্জা, রূপচর্চা, গৃহসজ্জা, বসন-ভূষণ, ভোজন ও আচার অনুপম পরিবর্তন আনয়নে তাহার অবদানই ছিল সর্বাধিক। "সমগ্র স্পেন জিরাবের ন্যায় মার্জিত রুচিসম্পন্ন, প্রত্যুৎপন্নমতি ও সংলাপে মিষ্টভাষী আর কেহ ছিলনা শীঘ্রই তিনি আন্দালুসিয়ার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হন।"[১] "স্পেনের বিভিন্ন মৌসুমে তিনি বিভিন্ন আরামদায়ক পোষাক ব্যবহারের রীতি প্রচলন করেন।"[২] খাবার টেবিলে সাজগোজ হইতে শুরু করিয়া দরবারের কার্পেট বিছানো রীতি পর্যন্ত আমূল পরিবর্তন করেন। তিনি যে রীতি প্রচলন করিতেন, রুচিশীল জগৎ সেটাই গ্রহণ করিত।

সঙ্গীতশিল্পেরও তিনি যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করেন। তিনি বিভিন্ন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া সঙ্গীতশিল্পের যথেষ্ট উন্নতিবিধান করেন। বিভিন্ন রকমের সুর ও ছন্দ এবং এইগুলি আয়ত্ত করিবার বিভিন্ন কলাকৌশলও তিনি উদ্ভাবন করেন। তিনি স্পেনে একটি সঙ্গীত নিকেতন স্থাপন করেন। আবদুর রহমান তাঁহার উপর এত প্রীত হইয়াছিলেন যে, প্রায়ই খাবারের সময় তাঁহাকে সঙ্গে লইতেন। জিরাবের সুখ-সমৃদ্ধি ও সম্মান বৃদ্ধির জন্য আমির সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করেন। জিরাব যেন আমিরের অন্তরে ও বাহিরে সর্বক্ষণ বিরাজ করিতেন।

খোজা নাসের

খোজা নাসের একজন অনারব ক্রীতদাস ছিলেন। অসামান্য প্রতিভাবলে তিনি আমির আবদুর রহমানের অনুগ্রহভাজন হইয়া উঠেন এবং প্রধান সচিবের পদ লাভ করেন।

১. Lane Poole—Moors in Spain P—82

২. Dozy—Spanish Islam P—264

রাজকর্মে তাঁহার দক্ষতা ছিল প্রচুর। তাঁহার উপর রাজকার্যের সার্বক্ষণিক দেখা শুনার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া আমির প্রায়ই সঙ্গীতজ্ঞ জিরাবের সঙ্গীত আসরে চিত্তবিনোদন করিতেন। মহীয়সী সুলতানা তারুবও তাঁহাকে অত্যধিক পছন্দ করিতেন। ফলে দরবারে তাঁহার প্রভাব ছিল সর্বত্র। সুলতানার লোভ ছিল মাত্রাধিক! কোন কিছুতেই তাঁহার লোভাতুর মন শান্ত হইত না। অবশেষে তিনি প্রধান সচিব নাসেরকে দিয়া ভাবী সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আমিরজাদা মুহাম্মদকে বিষ প্রয়োগে প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করেন। তিনি চাহিয়াছিলেন নিজের পুত্র আবদুল্লাহকে সিংহাসনে বসাইবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই ষড়যন্ত্র ফাঁস হইয়া পড়ে। আবদুর রহমান নির্দেশ প্রদান করেন যে, "যে বিষ মুহাম্মদের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল সেই বিষ প্রয়োগে যেন নাসেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।" আমিরের নির্দেশ যথাযথরূপে প্রতিপালিত হয় এবং এইভাবে হতভাগ্য খোজা নাসেরের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে নিজহাতে বিষপানের মাধ্যমে।

সুলতানা তারুব

সুলতানা তারুব ছিলেন অপরূপ সুন্দরী আবদুর রহমানের পত্নী। হেরেম অঙ্গরূপলাবণ্যে তিনি ছিলেন অনন্যা ও অতুলনীয়। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের বড় বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি স্বর্ণ ও অলংকারের দ্বারা সব কিছুর বিচার করিতেন। তাঁহার অসাধারণ লোভ ও নিষ্ঠুরতাই আমিরকে সাংঘাতিক ভাবে পীড়ন করিত। স্বর্ণমোহ তাঁহার এত অধিক ছিল যে, তাঁহার কণ্ঠহারের মূল্য ছিল দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা। স্বর্ণ ছাড়া তাঁহার আর কিছু কামনা ও বাসনার বস্তু ছিল না। ইহা ব্যতীত তিনি পুত্রের সিংহাসন দখলের জন্য যে নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে। আবদুর রহমান এই ষড়যন্ত্রের পর হইতে সুলতানা তারুবকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে দেখিতেন। সুলতানারও প্রভাব দিন দিন হ্রাস পাইতে থাকে।

এইভাবে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, আমির আবদুর রহমানের দরবার একজন শাস্ত্রবিদ ও ফকিহ্, একজন সঙ্গীতজ্ঞ, একজন প্রধান সচিব ও একজন রমণীদ্বারা প্রভাবিত ছিল।

বৈদেশিক দূত বিনিময়

আবদুর রহমান অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা দমন করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে সক্ষম হন। বিদেশেও তাঁহার খ্যাতি ছিল প্রচুর। তাঁহার সমসাময়িক আব্বাসীয় খলিফা আল-মুতাসিম-বিল্লাহ আল-ওয়াসিক-বিল্লাহ ও আল-মুতাওয়াকিল আলাল্লাহ-এর সঙ্গে কেমন সম্পর্ক ছিল তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে কনষ্টান্টিনোপল সম্রাট থিওপোলিস মোতাসিমের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের জন্য আবদুর রহমানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত পাঠান। কিন্তু আবদুর রহমান কোন সাহায্য প্রেরণ করেন নাই। তবে তিনি প্রতিদূত হিসাবে ইয়াহ্য়া বিন হাকাম আল গাজ্জালীকে বাইজানটাইন দরবারে প্রেরণ করেন। এই সময় ন্যাভারির কাউন্ট ফ্রান্সের

অধীনতা ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতার জন্য কর্দোবার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কাউন্টকে লিখিয়া পাঠান যে, ফ্রান্সে মুসলিম বাহিনীর প্রবেশের জন্য তিনি যদি সক্রিয় সাহায্য করেন তবে তাঁহাকেও সাহায্য করা হইবে। যাহা হউক কাউন্ট আবদুর রহমানের সঙ্গে একটি দ্বিপাক্ষিক শান্তি চুক্তি করেন।

আবদুর রহমানের কৃতিত্ব ও চরিত্র

আবদুর রহমান শাসনকার্যে প্রভূত উন্নতিবিধান করিয়া আপন যোগ্যতা সার্থক রূপে প্রমাণ করেন। তাঁহার কৃতিত্ব তাঁহার শাসনকার্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিহিত। তাঁহার সমগ্র শাসনকার্যকে প্রশাসনিক, বিচার বিভাগীয়, সামরিক ও জনকল্যাণ দফতরে বিভক্ত করিয়া নিম্নে আলোচিত হইল।

প্রশাসন

সমগ্র দেশকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার জন্য প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণকে বিশেষ যোগ্যতার ভিত্তিতে তিনি নিয়োগ করিতেন। প্রাদেশিক শাসনকার্যের সঙ্গে কেন্দ্রের যোগাযোগ ছিল অবিছিন্ন ও সার্বক্ষণিক। প্রতিটি প্রদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে কেন্দ্রের যোগাযোগ ছিল নিবিড়। আমির আবদুর রহমান কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে সুবিন্যস্ত করিয়া বিভিন্ন দফতরকে উপযুক্ত ক্ষমতা প্রদান করেন। প্রতিটি দফতরের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণভার অর্পণ করেন প্রধান মন্ত্রী বা হাজিবকে। আবার হাজিবকে সক্রিয় সাহায্য করিতেন প্রধান সচিব। আমির আবদুর রহমান অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ছিলেন যে, তিনি প্রখ্যাত সেনাপতি ও সুযোগ্য মন্ত্রী আবদুল করিম ইবনে মুগিসকে পাইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া ঈসা বিন সাইদ, আবদুর রহমান বিন রুস্তম, ইউসুফ বিন বখ্‌ত ও মুহাম্মদ বিন সলিম প্রমূখ ব্যক্তিগণকে লাভ করিয়াছিলেন প্রতিটি দফতরকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য। তাহাদের সহযোগিতা ও কর্মদক্ষতার জন্য তিনি শাসন কাঠামোকে জনকল্যাণমুখী করিতে সক্ষম হন। তিনি নিজেই গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগ্য লোক নিয়োগ করেন। তাঁহার সময়ে প্রধান খাজাঞ্জী ছিলেন জুদাইর। তাঁহার হিসাব নিরীক্ষায় অপূর্ব দক্ষতা ছিল। একদা আমির প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ জিরাবকে ৩০,০০০ দিনার দেওয়ার জন্য খাজাঞ্জীকে নির্দেশ দেন। এই অর্থ জিরাব লাভ করিয়াছিলেন সুন্দর একটি গানের মাধ্যমে আমিরকে মুগ্ধ করিয়া। কিন্তু যেহেতু আমির ব্যক্তিগত আনন্দ ও তৃপ্তিলাভের জন্য এই অর্থ পুরস্কার দিয়েছেন সেহেতু সরকারী কোষাগার হইতে এই অর্থ দিতে খাজাঞ্জী অস্বীকার করেন। আমির পরবর্তীকালে এই অর্থ ব্যক্তিগত তহবিল হইতে প্রদান করেন। এইভাবে রাষ্ট্রের স্বার্থ সংরক্ষণে খাজাঞ্জী যে নিষ্ঠা, সতর্কতা ও দেশপ্রেমিকতার পরিচয় দেন, সেই জন্য আমির তাঁহার উপর অত্যন্ত খুশী হন। সুশাসন ও দক্ষ প্রশাসনের জন্য রাষ্ট্রীয় কর ৬০,০০০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১০ লক্ষে পৌঁছায়। তিনি কর্দোবার টাকশালটি সংস্কার করেন। প্রতিটি প্রশাসনিক দফতর তিনি তদারক করিতেন এবং বিভাগীয় প্রধানকে উপযুক্ত নির্দেশাবলী প্রদান করিয়া প্রশাসনযন্ত্রকে সতর্ক রাখিতেন।

বিচার বিভাগ

আমির বিচার বিভাগকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য এবং বিচার বিভাগকে নিরপেক্ষ, বাহিরের হস্তক্ষেপশূন্য ও স্বাধীন রাখিতে হইবে। এইখানে উপযুক্ত ব্যক্তির প্রয়োজন সর্বাধিক। তাই প্রখ্যাত ফকিহ্ ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়ার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বিচারকগণকে নিয়োগ করিতেন, যোগ্যতা, দক্ষতা, সততা, বিচক্ষণতা, নির্ভীকতা, স্বাধীনচেতা ও ধার্মিকতার ভিত্তিতে। বিচারকগণ ন্যায় নীতিকে সমুন্নত রাখিয়া বিচার কার্য পরিচালনা করিতেন। এবং অভিযুক্তদিগকে আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার সুযোগ প্রদান করিতেন। সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইত যেন নিরপরাধ ব্যক্তি সাজা না পায়। ধর্মান্ধ আন্দোলনের জন্য অভিযুক্ত বিশপ পারফেকটাসকে কাজীর নিকট হাজির করিলে কাজী তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করেন। অথচ তিনি দরবারে দাঁড়াইয়াও তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলিই সগর্বে ঘোষণা করিতে থাকেন। যাহা হউক, আইনের চোখে সকলেই সমান এই নীতির উপরই বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

সামরিক

সামরিক বিভাগটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা বিধান ও বৈদেশিক আক্রমণ হইতে সীমান্তকে নিরাপদ রাখা এবং নূতন অঞ্চল অধিকার করিবার জন্য সামরিক শক্তির প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। আমিরকে এই বিভাগটির শক্তি বৃদ্ধি ও শৃঙ্খলা বিধানের জন্য বেশি সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইত। কারণ একাধিক সময়ে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমন করিতে সামরিক শক্তির প্রয়োজন হইয়াছে। যেমন তুদমির, মেরিদা, তলেদো ও নরম্যানদের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর সাহায্য লইতে হইয়াছিল। তিনি তাঁহার পিতার অনুসৃত নীতি মোতাবেক সৈন্যবাহিনীর পুণর্গঠন, বেতন ও ভাতা নির্ধারণ করেন। সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করিবার পিছনে সেনাপতি আবদুল করিম বিন মুগিসের অবদান ছিল যথেষ্ট।

জনকল্যাণ ও পূর্ত বিভাগ

আবদুর রহমানের জনকল্যাণমুখী কর্মসূচী ছিল ব্যাপক। প্রজা সাধারণের সুখ-সুবিধার দিকে সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তিনি সেতু, সড়ক, পয়ঃপ্রণালী, ঝর্ণা, নগর, দুর্গ ও প্রাসাদ প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া রাজ্যের রাজধানী কর্দোবাকে সুসজ্জিত ও অনুপম করিবার জন্য তাঁহার প্রচেষ্টা ছিল নিরলস। উদ্যান, পুষ্পকানন, সেতু ও কৃত্রিম ঝর্ণাধারা দিয়া কর্দোবাকে আরো রমণীয় করিয়া তোলেন। বিখ্যাত কর্দোবার জামে মসজিদকে আরও সুন্দররূপে সংযোজন, সংস্কার ও সুসজ্জিত করেন। জায়েন, সারাগোসা, সেভিল প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ শহরও তাঁহার স্থাপত্য শিল্পপ্রীতির যথেষ্ট স্বাক্ষর বহন করে। মসজিদ, সেতু, দুর্গ ও প্রাসাদ দ্বারা তিনি শহরগুলিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন। নরম্যানদের লুণ্ঠনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত সেভিলের নগর প্রাচীর ও দুর্গ পুনঃনির্মাণ করেন।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। জনগণের দুঃখ মোচনের জন্য তাঁহার কোমল অন্তর সদা জাগ্রত ছিল। সারাগোসা বন্যাকবলিত হইয়া পড়িলে সেখানে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য আমির খাদ্য সরবরাহ করিতে বিলম্ব করেন নাই। তিনি শহরে ও নগরে দাতব্য-চিকিৎসালয় ও স্কুল স্থাপন করেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভক্ত ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিভিন্ন ভাষায় বইগুলি আবার আরবীতে অনুবাদ করিবার ব্যবস্থাও করেন।

আবদুর রহমান জাঁকজমক ভালবাসিতেন এবং পূর্বদেশীয় মার্জিত রুচি, নিয়ম, আচার-ব্যবহার তিনি দরবারে প্রচলন করেন। তিনি নিজে একজন উঁচুদরের কবি ছিলেন। প্রখ্যাত কবি উবাইদুল্লাহ বিন কারিমান ও আবদুর রহমান বিন শিমার তাঁহার দরবার অলংকৃত করেন। অতএব আবদুর রহমানের ৩০ বৎসর রাজত্বকালের সার্বিক ঘটনা বিবৃত করিয়া এতটুকু বলাই যথেষ্ট হইবে যে, বিদ্রোহ দমনে গোলযোগ দূরীকরণে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধানে, স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষ সাধনে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ও জ্ঞানী-গুণী মনীষীদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং জনকল্যাণে হাকামের পুত্র আবদুর রহমানের নাম স্পেনের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছে।

মৃত্যু

৮৫২ খ্রিস্টাব্দে সামান্য অসুস্থতায় স্পেনের উমাইয়া বংশের চতুর্থ আমির আবদুর রহমান ৬১ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি উজির, অমাত্যবর্গ, সেনাপতি ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের উপস্থিতিতে তাঁহার পুত্র মুহাম্মদকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

অষ্টম অধ্যায়

মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান (২য়) ৮৫২-৮৮৬

[**সার সংক্ষেপ ঃ** সূচনা ❑ মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান (২য়) ❑ তলেদোর বিদ্রোহ ❑ মালেকী ও হাম্বলী দ্বন্দ্ব ❑ ধর্মান্ধ খ্রিস্টানদের আন্দোলন ❑ গ্যালিসিয়া ও ন্যাভারীতে যুদ্ধ ❑ বনু কাসী ❑ মেরিদায় স্বাধীনতা ঘোষণা ❑ নরম্যানদের হামলা ❑ ওমর বিন হাফসুন ❑ কৃতিত্ব ও চরিত্র ❑ মৃত্যু।]

পিতার মৃত্যুর পর মুহাম্মদের পক্ষে কর্দোবার সিংহাসন পুষ্পসজ্জা ছিল না। বিদ্রোহ এবং গোলযোগের বেষ্টনীতে বন্দী ছিল তাঁহার সমগ্র জীবন। তলেদোর বিদ্রোহ, ধর্মান্ধ খ্রিস্টানদের আন্দোলন, কাসীদের অভ্যুত্থান ও ওমর বিন হাফসুনের দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি তাহাকে ভীষণ সংকটজনক পরিস্থিতিতে নিক্ষেপ করে। স্বীয় রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও সামরিক শক্তি দ্বারা উল্লেখিত জটিল সমস্যাগুলিকে সমাধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার প্রচেষ্টা আশানুরূপ সফল হয় নাই।

তলেদোর বিদ্রোহ

মুসলিম স্পেনে তলেদো ঠিক লাভাউৎক্ষিপ্ত আগ্নেয়গিরি সদৃশ ছিল। কোন আমির তলেদোর শাসন লইয়া নির্বিঘ্নে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তলেদোবাসী সব সময় সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকিত কখন তাঁহারা কর্দোবার অধীনতা ছিন্ন করিবে। কারণ তলেদোতে মিশ্র জাতির উগ্র মস্তিষ্কের কার্য সর্বদাই চলিত। এখানে বসবাস করিত খ্রিস্টান, ইহুদি, আরব অভিজাত শ্রেণী, বার্বার ও নওমুসলিমগণ। তবে খ্রিস্টান ও নওমুসলিমদের দ্বারা বিদ্রোহাত্মক কার্যাবলী প্রায়ই সংঘটিত হইত। মুহাম্মদ যখন শাসনভার গ্রহণ করিলেন তখন নওমুসলিমগণ অন্যান্য উগ্রপন্থী নাগরিকদের সহায়তায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহী নেতা সিন্দোলা লিয়োনের রাজা অরডোনর (১ম) সাহায্য কামনা করেন। লিয়োন রাজ সুযোগ বুঝিয়া বৃহত্তর স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে বায়ারজোর কাউন্ট গ্যাটনের নেতৃত্বে একদল সেনাবাহিনীর প্রেরণ করেন। আমির স্বয়ং এই সম্মিলিত বিদ্রোহী বাহিনীর মোকাবেলায় সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন। উন্নত রণকৌশলের দ্বারা তিনি

বিদ্রোহী বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধ এত ভীষণ রক্তক্ষয়ী ছিল যে, ৮০০০ খ্রিস্টান রণক্ষেত্রেই নিহত হয় এবং অসংখ্য সৈন্য আহত অবস্থায় পলায়ন করে। তলেদোর ভূতপূর্ব গভর্ণর বিদ্রোহীদের সহযোগিতা করিবার জন্য তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেন। মুহাম্মদ আমিরজাদা মুনজিরকে তলেদোর গভর্ণর নিযুক্ত করেন। মুনজির অত্যন্ত দক্ষতার সহিত শাসন সংস্কারও পুর্নগঠন করিয়া তলেদোতে শান্তি শৃঙ্খলা বিধান করেন।

মালেকী ও হাম্বলী মাজহাবী দ্বন্দ্ব

আমির মুহাম্মদকে পরস্পর বিরোধী মালেকী ও হাম্বলী মাজহাবের সমর্থকদের সংঘাতের মোকাবেলা করিতে হয়। বিশেষ করিয়া কর্দোবাতে ইমাম মালেক বিন আনাস (৭১৩-৭৯৫) ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের (৭৮০-৮৫৫) অনুসারীদের মধ্যে ব্যাপক আকারে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান প্রতিপালনে উভয় মাজহাবের মধ্যে কিছু বৈসাদৃশ্য আছে এবং এই মতভেদ লইয়াই কলহের সূত্রপাত। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের প্রখ্যাত ছাত্র আহমদ বিন আবদুর রহমান বাকী স্পেনে তাঁহার ওস্তাদের মতবাদ প্রচার করিতে শুরু করিলে জনসাধারণের মধ্যে অনুকূল সাড়া জাগে। ফলে স্পেনের মালেকী মাজহাবের ফকিহগণ অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন। ইতিপূর্বে অর্থাৎ আমির হিশামের রাজত্বকাল হইতে স্পেনে মালেকী মাজহাব এককভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তাই তাহারা নবাগত হাম্বলী মতবাদকে কোনক্রমেই স্বীকৃতি দিতে সম্মত ছিলেন না। বরং মালেকী উলামাবৃন্দ হাম্বলী মতবাদ যাহাতে কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার না করিতে পারে তাহার জন্য চরমভাবে বিরোধীতা শুরু করেন। তাঁহারা আমিরকে জানাইলেন যে, হাম্বলীগণ কোরআন ও সুন্নাহ বিরোধী মতবাদ প্রচার করে এবং তাহাদের সমর্থনে রহিয়াছেন ১৩০০ জন ফকিহ অপরপক্ষে হাম্বলীদের দলে আছেন ২১৪৬ জন। মোট কথা মালেকী ফকিহগণ সম্পূর্ণ বিদ্বেষপ্রসূত ধারণা লইয়া হাম্বলী মতবাদকে স্পেন হইতে উচ্ছেদের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইতে থাকেন। সুবিচারক ও বিজ্ঞ আমির মালেকীদের একতরফা বক্তব্যে কর্ণপাত না করিয়া উভয় দলকে আহবান করেন স্ব স্ব দলের বক্তব্য পেশ করিবার জন্য। উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া আমির রায় ঘোষণা করিলেন যে, উভয়ই কোরআন ও সুন্নাহর স্বপক্ষে আছেন, তবে যে মতবিরোধ দেখা দিয়াছে সেটা নিতান্তই তুচ্ছ ও সামান্য ব্যাপার। অতএব আত্মকলহে নিজেদের শক্তি ও সংহতি বিনষ্ট না করিয়া খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ দুর্বার আন্দোলন গড়িয়া তোলা একান্ত বিধেয়। আমিরের উদাত্ত আহবানে মুসলিমদের মাজহাবী দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। একক শক্তি লইয়া সকলেই ইসলামের সুমহান বাণী প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং জেহাদী তৎপরতা শুরু করেন।

ধর্মান্ধ খ্রিস্টান আন্দোলন

আমির আবদুর রহমানের সময় হইতে ধর্মান্ধ খ্রিস্টানগণ যথেচ্ছভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও কুৎসা রটনা করিতে শুরু করে। তাহাদের বিরুদ্ধে আবদুর রহমানকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয় এবং আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের অনেককেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা

হয়, ফলে আন্দোলন স্তিমিত হইয়া আসে। তবে যাঁহারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা এখন দ্বিগুণ শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করিয়া পূর্ববৎ প্রচারণায় আত্মনিয়োগ করেন। ধর্মান্ধ খ্রিস্টানগণ ইলুজিয়াসকে নেতা করিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াইতে শুরু করে। তাহারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অন্তরালে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হাসিলের জন্য ফ্রান্স অধিপতি চার্লসকে স্পেনে আমন্ত্রণ জানায়। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের দুইজন বিশপ রাজধানী কর্দোবায় অবস্থান করিয়া অনেক গোপন তথ্য সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। মুহাম্মদ খ্রিস্টানদের এহেন দেশদ্রোহী আচরণ কোনক্রমেই বরদাশ্‌ত করিবার পাত্র ছিলেন না। তাহাদের প্রতি বিন্দুমাত্র দয়া প্রদর্শন না করিয়া সামরিক বাহিনীর সাহায্যে তাহাদের শক্তিকে পর্যুদস্ত করেন। ৮৫৯ সালে ধর্মান্ধ নেতা ইলুজিয়াস, আলভারো ও লিওক্রিটাসকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া হত্যা করা হয়। ইহার পর হইতে ধর্মান্ধ আন্দোলনের অবসান ঘটে।

গ্যালিসিয়া ও ন্যাভারিতে যুদ্ধ

আবদুর রহমানের (২য়) রাজত্বকালে ফ্রাঙ্কদের সঙ্গে শক্তির ভারসাম্য শান্তিপূর্ণভাবে বজায় ছিল। কিন্তু তাহারা কোন সময়ই মুসলিম স্পেনের মঙ্গল কামনা করে নাই। মুহাম্মদ শাসনভার গ্রহণ করিয়া যখন আভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিরসনে ব্যাপৃত তখন ফ্রাঙ্কগণ মুসলিম সীমান্তে অনুপ্রবেশ করিয়া লুটতরাজ শুরু করে। তাহাদের এই কর্মে যোগ দেয় গ্যালিসিয়ান ও ন্যাভারিগণ। মুহাম্মদ মেরিদা ও সারাগোসার গভর্ণরদ্বয়কে নির্দেশ দেন তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে। যাহা হউক, এই সময় গথসীমারেখায় খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া মুসলিমগণ সফলতা অর্জন করেন। প্যাম্পপ্লোনা হইতে খ্রিস্টানগণ যখন দেখিল মুসলিম বাহিনী প্রত্যাবর্তন করিয়াছে তখন তাহারা আবার দুর্গ হইতে বাহির হইয়া মুসলিম অধ্যুষিত জনপদে দস্যুবৃত্তি শুরু করিয়া দেয়। তাহাদের বেপরোয়া হামলার মুখে বহুলোক নিহত, অনেক গৃহ ভস্মীভূত ও বিস্তর শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট হয়। এই দুঃসংবাদে মুহাম্মদ কর্দোবা হইতে বিশাল অশ্বারোহী বাহিনী লইয়া খ্রিস্টানদের মোকাবেলায় উপস্থিত হন। আমিরের সঙ্গে মেরিদা ও সারাগোসার গভর্ণরদ্বয়ও যোগ দেন। ফলে মুসলমানদের প্রচণ্ড শক্তির মুখে খ্রিস্টানগণ পর্যুদস্ত হইয়া পলায়ন করে। ৮৬৫ সালে লিয়োন প্রধান বিনাশর্তে আমিরের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে তিনি তাহার সঙ্গে শান্তি চুক্তি করেন।

বনু কা'সী

বনু কা'সী গথ জাতির একটি প্রাচীন শাখা। তাঁহারা পরবর্তীকালে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের সংখ্যা আরাগণে ছিল খুবই বেশি। শক্তিতেও তাঁহারা প্রবল ছিলেন এবং স্বাধীনতা ভোগ করিবার মানসে জায়েদের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। জায়েদ সারাগোসার ভূতপূর্ব গভর্ণর ছিলেন এবং তিনি সুযোগ বুঝিয়া বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং সারাগোসা অধিকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি সারাগোসাকে রাজধানী হিসাবে গ্রহণ করেন। তুদেলা, হিউসকা ও তলেদোর বিদ্রোহীগণও তাঁহার সঙ্গে

যোগ দেয়। তিনি ন্যাভারিদেরও সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করেন। বারসিলোনা ও ক্যাষ্টাইল তাঁহার অধিকারে চলিয়া আসে। পীরেনীজ পর্বত অতিক্রম করিয়া তিনি চার্লসকে তাঁহার সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করিতে বাধ্য করেন। বস্তুতঃ কা'সী বংশ বারসিলোনা হইতে শুরু করিয়া তলেদো পর্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগে তাহাদের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করে। কা'সী শাসক মুসা প্রকৃতপক্ষে স্পেনের আর একজন আমিরের মর্যাদা লাভ করেন। ৮৬২ সালে তাঁহার মৃত্যুর পর মুহাম্মদ যদিও সারাগোসা, তুদেলা দখল করেন তথাপি দশ বৎসর পরে এইগুলি আবার হস্তচ্যুত হয়। এই স্থানেই আমির মুহাম্মদের ব্যর্থতার চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়। তাঁহার সামরিক শক্তির সময়োচিত ব্যবহার না করিবার ফলেই তাঁহাকে এহেন সংকটজনক অবস্থায় পড়িতে হয়। মুহাম্মদকে একমাত্র রাজধানী কর্দোবা ছাড়া সর্বস্থানেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য উদ্বিগ্ন থাকিতে হয়।

মেরিদায় স্বাধীনতা ঘোষণা

সারাগোসার পথ অনুসরণ করিয়া মেরিদার প্রভাবশালী নওমুসলিম নেতা আবদুর রহমান বিন মারওয়ান ৮৬৮ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সারাগোসাতে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার পরিচয় পাইয়া আবদুর রহমান বিশেষ উৎসাহী হইয়া উঠেন এবং এই দুঃসাহসিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া আবদুর রহমানের পিতা মারওয়ান ইতিপূর্বে মেরিদার গভর্ণর ছিলেন। ফলে জনগণ ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে তাঁহার যোগাযোগ ও প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশি। আবদুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার সংবাদ রাজধানীতে পৌঁছাইলে আমির একদল সৈন্যবাহিনী মেরিদাতে প্রেরণ করেন। বিদ্রোহীগণ রাজকীয় বাহিনীর নিকট শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ না হইয়া আত্মসমর্পণ করে। আবদুর রহমান বশ্যতা স্বীকার করিলে আমিরের দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হিশাম বিন আবদুল আজিজের ব্যবহারে অপমানিত হইয়া তিনি রাজধানী হইতে পালায়ন করেন। পরে সাদুন নামক আর একজন বিদ্রোহীর সহিত মিলিত হইয়া মেরিদাতে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। তিনি মেরিদাতে ক্রমে ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকেন এবং লিয়োন অধিপতি আলফানসো (২য়) এর সহায়তায় পুনরায় আমিরের বাহিনীর মোকাবেলা করেন। এইবার তিনি আমিরের বাহিনীকে পরাজিত করেন। সেনাপতি হিশামকে বন্দী করিয়া পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে লিয়োন দরবারে প্রেরণ করেন। দুই বৎসর পর হিশাম ১০,০০০ দিনার প্রদান করিয়া মুক্তিলাভ করেন। ইহার পর বস্তুতঃ ইবনে মারওয়ানকে বাধ্য হইয়া স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিতে হয়। এমনিভাবে মেরিদাও কর্দোবার শাসনমুক্ত হইয়া যায়।

নরম্যানদের হামলা

আবদুর রহমানের (২য়) সময়ে নরম্যানগণ লিসবন হইতে শুরু করিয়া সেভিল পর্যন্ত তাহাদের হত্যা লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। আমিরের সৈন্যবাহিনী সেই সময়ে নরম্যানদিগকে স্পেন হইতে বিতাড়িত করেন। কিন্তু মুহাম্মদ যখন আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা নিরসনে ব্যাপৃত তখনই এই বার্বার বাহিনী আবার ৮৫৯ সালে ৭০ খানা জাহাজ

লইয়া স্পেনের বন্দরে হানা দেয়। তাহারা উপকূলীয় বন্দর রায়া, কর্তামা ও মালাগাসহ আরও অনেক বাণিজ্য কেন্দ্রের উপর হামলা চালায়। তাহারা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সাহস পায় নাই তবে তাহাদের যাত্রাপথের যাবতীয় সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন রাখিয়া যায়। তাহারা আমিরের অশ্বারোহী বাহিনীর আগমন বার্তায় দ্রুত স্পেন ত্যাগ করিয়া আফ্রিকার উপকূলে পলায়ন করে।

ওমর বিন হাফসুনের উত্থান

বোবাষ্ট্রে পর্বতের পাদদেশে ওমর বিন হাফসুনের অভ্যুত্থান ঘটে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে। তিনি জাতিতে গথ ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁহার বংশ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেও তাঁহার মনটি অতৃপ্ত উগ্র বাসনায় উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহাকে শান্ত ও নীরবজীবন যাপন হইতে অনেক দূরে রাখে। দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করিয়া তিনি পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হন। দুর্লজ্ঘ্য পবর্তপাদদেশে গহীন বনানীর মধ্যে দস্যুদলের সহিত মিলিত হইয়া তিনি শুরু করেন তাঁহার দস্যুজীবন। বহুদিন ধরিয়া তিনি এই বৃত্তিতে জীবন অতিবাহিত করেন। একদা তিনি জীবনের মোড় পরিবর্তন করিয়া আফ্রিকার উদ্দেশ্যে স্পেন ত্যাগ করেন। আফ্রিকাতে তিনি এক দরজীর দোকানে কাজ করিতে থাকেন। দোকানে কর্মরত অবস্থায় একদিন এক বৃদ্ধ আসিয়া তাঁহাকে বোবাষ্ট্রের অশান্ত পরিস্থিতির সংবাদ পরিবেশন করেন। বৃদ্ধ ওমরকে চিনিতেন এবং তিনি তাঁহার উদ্দেশ্যে বলিলেন—'তোমার দীনজীবনে স্বচ্ছলতা আনিবে কি সুই ফোঁড় দিয়া ? দেশে প্রত্যাবর্তন করে, তরবারি চালাইয়া উমাইয়াদের সন্ত্রাস হইয়া এক বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ কর।' অপরিচিত এই বৃদ্ধের মুখে তেজোদ্দীপ্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়া ওমর অত্যন্ত বিচলিত হন। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন, ব্যক্তিজীবন নহে সমষ্টি জীবনে প্রবেশ করিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ তিনি দুইখানি রুটি সম্বল করিয়া আফ্রিকা ত্যাগ করিয়া আবার মাতৃভূমি স্পেনে ফিরিলেন। পিতৃব্য মুজাহিরের নিকট উৎসাহ ও সাহায্যপুষ্ট হইয়া তিনি চল্লিশ জনের এক দুঃসাহসী দস্যুদল লইয়া ৮৮০ সালে বোবাষ্ট্রেতে প্রত্যাবর্তন করেন। রোমানদের পরিত্যক্ত পুরাতন দুর্গে তিনি তাঁহার আস্তানা প্রতিষ্ঠা করেন। বহু নওমুসলিম ও মুজারব তাঁহার দলে যোগ দেয়। তিনি একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমে রাজপথে লুণ্ঠনবৃত্তি, পরে চারণভূমিতে চৌর্যবৃত্তি এবং পরিশেষে নগর লুণ্ঠনে মনোনিবেশ করেন। ধীরে ধীরে নগরের বিদ্রোহীগণও তাহার দলে যোগ দেয়। বর্ধিত শক্তিতে ওমর উৎসাহী হইয়া একদা রিজিও আক্রমণ করিয়া গভর্ণরকে পরাজিত করেন। ইহা ব্যতীত তিনি আমিরের বাহিনীকেও দুইবার পরাজিত করেন। অতঃপর প্রধানমন্ত্রী হিশামই তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত পরাজিত করেন। আমির ওমরের সামরিক প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া ৮৮৩ সালে তাঁহাকে তাঁহার সেনাবাহিনীর একজন অফিসার হিসাবে গ্রহণ করেন। বনু কা'সী গোত্র ও খ্রিস্টানদের মোকাবেলায় সেনানায়ক হিসাবে ওমর বিন হাফসুন কয়েকবার তাঁহার সামরিক শৌর্যের পরিচয় প্রদান করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ওমরের বীরত্ব ও কৃতিত্বে আমির মুহাম্মদ

অত্যন্ত খুশী হন। কিন্তু কর্দোবার নগর প্রধানের সঙ্গে তাঁহার মনোমালিন্য ঘটে এবং নগরপ্রধান তাঁহাকে অপমান করেন। ফলে ওমর ক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহার দলবল লইয়া বোবাষ্ট্রর উদ্দেশ্যে ৮৮৪ সালে অকস্মাৎ রাজধানী ত্যাগ করেন। বোবাষ্ট্রতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি দুর্গগুলি সুরক্ষিত করেন এবং অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নিজেকে মজবুতরূপে তৈয়ার করেন। তিনি নওমুসলিমদের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহার দলের জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি করেন। তিনি বোবাষ্ট্রতে স্বাধীনভাবে বসবাস করিতে থাকেন, তবে পার্শ্ববর্তী জায়েন ও ইজনাজার জেলাগুলিতে দস্যুবৃত্তি অব্যাহত রাখেন। আমির জায়েদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে একদল সৈন্যবাহিনী ওমরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ওমর রাজকীয় বাহিনীর মোকাবেলা না করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় লইয়া রাত্রিতে হঠাৎ তিনি রাজকীয় বাহিনীর উপর আক্রমণ করিয়া সেনাপতি জায়েদকে হত্যা করেন। ৮৮৬ সালে মুনজির এক বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া ওমরকে সমুচিত শিক্ষা দিতে আসেন। এই সময়ে ওমরের একজন সহযোগী আবদুল মালিক আলহামাতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মুনজির তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার ছিন্ন মস্তক রাজধানীতে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে ওমরও শরীক ছিলেন কিন্তু তিনি আহত অবস্থায় পলায়ন করেন। ঠিক এই সময়ে পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মুনজির রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

কৃতিত্ব ও চরিত্র

মুহাম্মদ উমাইয়া বংশের পঞ্চম আমির। তিনি সুদীর্ঘ ৩৪ বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করেন। তাঁহার এই দীর্ঘ রাজত্বকাল সর্বাপেক্ষা বেশি গোলযোগপূর্ণ ছিল। তিনি সাহসী ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন কিন্তু সংকীর্ণমনা ও অদূরদর্শিতার জন্য তাঁহাকে বহু দুর্ভোগ পোহাইতে হয়। অভিজ্ঞ ও উচ্চ বেতনভুক্ত কর্মচারীর বদলে অনভিজ্ঞ, নূতন ও স্বল্প বেতনের কর্মচারী নিয়োগ তাঁহার প্রশাসনকে দুর্বল করিয়া তোলে। কর্মচারীদের বেতন অন্যান্য সুযোগ সুবিধা হ্রাস করিবার ফলে কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা হ্রাস পায় এবং চরম ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ৮৫২ সালে তিনি গোমেজকে তাঁহার সেক্রেটারী হিসাবে নিয়োগ করেন। বহু খ্রিস্টান কর্মচারী ও সৈনিক তিনি ছাঁটাই করেন। তিনি খুবই হিসাবী ছিলেন। রাজ্যের আয়-ব্যয় নিজেই তদারক করিতেন। সামান্য ভুলত্রুটি যাহা অভিজ্ঞ কর্মচারী বাহির করিতে পারিতেন না তাহা তিনি নিজেই করিয়া দিতেন। সর্বক্ষেত্রে তাঁহার হস্তক্ষেপের ফলে এক শ্রেণীর কর্মচারীরা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেন। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও খ্রিস্টানদের সমুচিত শাস্তি বিধানের জন্য ফকিহগণ তাঁহার উপর খুবই খুশী ছিলেন। তিনি একজন কবি, লেখক ও বক্তা ছিলেন। কর্দোবার জামে মসজিদে তিনি প্রায়ই ধর্মীয় উপদেশ দিতেন। কোরআন ও হাদীসের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। হাদীস সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট পড়াশুনা করেন। হাম্বলী ও মালেকী মাজহাবের আত্মঘাতী কলহ তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে নিষ্পত্তি করেন।

পিতার ন্যায় তিনি ছিলেন সৌন্দর্যে অনুরক্ত। তাই ইমারত ও অন্যান্য মনোরম ভবন

নির্মাণের দ্বারা রাজধানীকে আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া তোলেন। তিনি কর্দোবার জামে মসজিদের স্থাপত্যশিল্পের শ্রীবৃদ্ধি করেন। মসজিদ সম্প্রসারণ ও মাকসুরা নির্মাণের কাজটি সম্পূর্ণ করেন। জনগণের অভাব-অভিযোগ ও দুঃখ মোচনের জন্য তাঁহার হৃদয় ছিল উন্মুক্ত। দুর্ভিক্ষের দিনে অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুহূর্তে তিনি সাহায্যের সামগ্রী লইয়া উপস্থিত হইতেন দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের মাঝে। সমগ্র জীবন তাঁহার অতিবাহিত হয় গোলযোগ দমনে ও যুদ্ধ-বিগ্রহে। তথাপিও পুত্রের জন্য তিনি সিংহাসনটিকে নিষ্কন্টক করিতে পারেন নাই।

মৃত্যু

৮৮৬ সালের ৪ঠা আগষ্ট তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

নবম অধ্যায়

মুনজির (৮৮৬-৮৮৮)

[সার সংক্ষেপ ঃ সূচনা ❑ মুনজির ❑ ওমর বিন হাফসুন ❑ মৃত্যু ।]

মুহাম্মদ মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় পুত্র মুনজিরকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। ফলে পিতার মৃত্যুর পর মুনজির রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সাহসী, বুদ্ধিমান ও সমরকুশলী। তাঁহার রাজত্বকাল ছিল মাত্র দুই বৎসর। তাই তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে নাই। তবে পিতার জীবদ্দশায় তলেদোর শাসন ও শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং দুর্ধর্ষ ওমর বিন হাফসুনের সঙ্গে সার্থক মোকাবেলা তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে। অকাল মৃত্যু তাঁহার উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ বিনষ্ট করিয়া দেয়। "দীর্ঘতম জীবন পাইলে তিনি যে রাজ্যে পূর্ণ শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে পারিতেন ইহাতে কোন সন্দেহ ছিল না।"[১]

ওমর বিন হাফসুন

মুহাম্মদের মৃত্যুর সময় মুনজির রাজধানীতে ছিলেন না। তিনি তখন ওমর বিন হাফসুনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। আমিরের মৃত্যুর সংবাদে তিনি অতি দ্রুত কর্দোবাতে প্রত্যাবর্তন করেন। মুনজির রাজধানীর প্রাথমিক অসমাপ্ত কাজগুলি সম্পন্ন করিবার অবসরে ওমর আপন অবস্থা সুরক্ষিত করিতে কিছুটা সুযোগ ও সময় পান। তিনি তাঁহার অনুচরদের লইয়া নূতন করিয়া অনেকগুলি জনপদ দখল করেন। ফলে তাঁহার অধিকৃত অঞ্চলের সীমারেখা এবারো নদের তীরভূমি হইয়া সারাগোসা ও হিউসকা, তলেদো পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তলেদোর কতিপয় খ্রিস্টান গোত্রের সঙ্গে সখ্যতা থাকায় ওমর অতি সহজেই নগরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। তলেদোর জনগণকে বশ করিবার জন্য ওমর দরিদ্র লোকজনকে অকাতরে অর্থ বিতরণ করেন। এই সংবাদে বিচলিত হইয়া আমির সেনাপতি হাশিম বিন আবদুল আজিজকে তলেদোতে প্রেরণ করেন। রাজকীয় বাহিনীর সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত না হইয়া ওমর একদল সৈন্যবাহিনী নগরে রাখিয়া নবার ত্যাগ করেন এবং একটি বন্ধুত্বমূলক চুক্তি করিবার জন্য আবেদন করেন। আমিরের নির্দেশে হিশাম কাজ না করিয়া ওমরের ছলনা ও ধূর্তামির শিকার হন। তিনি নগরে প্রবেশ করলে ওমরের অনুচরগণ অতর্কিতে তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। ইহাতে অনেক রাজকীয় সৈন্য হতাহত

১ Syed Ameer Ali—History of Saracens P—492

হয়। ইহার পর ওমর নিজ অবস্থাকে আরও সুসংহত করেন। মুনজির এইবার ভ্রাতা আবদুল্লাহসহ ওমরকে দমন করিবার জন্য তলেদোতে পৌঁছান। নগর অবরোধের ভার ভ্রাতার উপর অর্পণ করিয়া আমির ওমরের আস্তানা বোবাস্ত্রের দিকে অগ্রসর হন, ৮৮৮ সালের বসন্তকালে মুনজির বোবাস্ত্রের পার্শ্বস্থ অনেক অঞ্চল শত্রুমুক্ত করেন এবং আর্চিদোনা অবরোধ করেন। দুর্গাধিপতি আইসুন আমিরকে খুবই দুঃসাহস দেখাইয়া ঘোষণা করে যে, আমির তাহাকে পরাজিত করিলে একটি কুকুর ও একটি শুকরের মাঝখানে রাখিয়া তাঁহাকে যেন হত্যা করা হয়। সে রাজকীয় বাহিনীকে নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া এহেন উদ্ধত উক্তি করে। আমির অতি সহজেই নগর দখল করেন এবং আইসুনকে বন্দী করিয়া তাহারই পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক নিহত করেন। আর্চিদোনা দখলের পর তিনি বোবাস্ত্রি দুর্গ অবরোধ করেন। দুর্গটি ছিল খুবই দুর্ভেদ্য। ওমর এইবারও আমিরের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি বোবাস্ত্রি ত্যাগ করিয়া কর্দোবাতে বসবাস করিবেন এবং রাজকীয় বাহিনীতে যোগ দিবেন। তাঁহার পুত্রগণ আমিরের নিকট জামিন হিসাবে রক্ষিত থাকিবে। ওমর আরও প্রার্থনা করেন যে, তাঁহার আসবাবপত্র বহনের জন্য আমির যেন তাঁহার জন্য একশত খচ্চর প্রেরণ করেন। আমির তাঁহাকে এইবারও বিশ্বাস করিয়া নামমাত্র অনুচরসহ একশত ভারবাহী খচ্চর বোবাস্ত্রিতে প্রেরণ করেন। ওমর রাত্রির অন্ধকারে আমিরের তাঁবু হইতে পলায়ন করিয়া আপন আস্তানায় চলিয়া আসেন এবং স্বীয় দলবল লইয়া উক্ত একশত খচ্চর সহজেই হস্তগত করেন। ওমর বিন হাফসুনের শৃগাল ধূর্তামিতে মুনজির ভীষণ ক্রোধান্বিত হইয়া বোবাস্ত্রি অধিকারের বজ্রদৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যু তাঁহার সংকল্প বাস্তবায়িত করিতে দেয় নাই।

মৃত্যু

তাঁহার মৃত্যু সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ঐতিহাসিক ডজি বলেন যে, তাঁহার ভ্রাতা আবদুল্লাহ সিংহাসন দখলের জন্য তাঁহাকে কৌশলে চিকিৎসকের সাহায্যে বিষ প্রয়োগে নিহত করেন। আবার কেহ বলেন যে, যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হইয়া ৮৮৮ সালে প্রাণত্যাগ করেন। "আমির অতিশয় তেজস্বী, বুদ্ধিমান এবং সাহসী ছিলেন। উমাইয়াগণ মনে করিতেন যে, যদি তিনি আরও একটি বৎসর জীবিত থাকিতেন তবে দক্ষিণের সমস্ত বিদ্রোহীদিগকে অস্ত্রত্যাগ করিতে বাধ্য করিতেন।"[২]

২. Dozy—Spanish Islam P—321

দশম অধ্যায়

আবদুল্লাহ (৮৮৮-৯১২)

[সার সংক্ষেপ ঃ সূচনা ❑ আবদুল্লাহ ❑ এলভিরায় বিদ্রোহ ❑ সেভিলে বিদ্রোহ ❑ ওমর বিন হাফসুন ❑ শেষ জীবন ❑ মৃত্যু।]

মুনজিরের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর ৮৮৮ সালে আবদুল্লাহ স্পেনের সর্বাপেক্ষা সংকটময় মুহূর্তে কর্দোবার সিংহাসনে উপবেশন করেন। চতুর্দিকে বিদ্রোহ আর অশান্তি যেন কুণ্ডলী পাকাইয়া স্পেনের আকাশকে ধূম্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। আরব, অনারব, মুধারীয়, হিমারীয়, মুসলিম, নওমুসলিম, খ্রিস্টান, বার্বার, মুজারব প্রভৃতি দল ও গোত্রের মধ্যে চলিতেছিল তীব্র সংঘর্ষ। "গোত্রীয় কলহ রাষ্ট্রীয় সংহতিকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল।"[১] আভ্যন্তরীণ গোলযোগের মধ্যে জায়েন ও এলভিরায় স্পেনীয় ও আরবদের সংঘর্ষ, লোরসা ও সারাগোসায় আরব প্রভুত্বের প্রতাপ, সেভিলে হাজ্জাজ বংশের অভ্যুত্থান এবং ওমর বিন হাফসুনের বিদ্রোহ প্রভৃতি আবদুল্লাহকে বিশেষভাবে বিব্রত করে।

এলভিরায় বিদ্রোহ

আরব ও স্পেনীয়দের সংঘর্ষের ফলে আবদুল্লাহ আরবদিগকে এলভিরা হইতে বহিষ্কার করেন। আরবগণ ইয়াহয়া বিন সাকুল্যাকে নেতা নির্বাচন করিয়া গ্রানাদার উত্তর পূর্ব দিকে মনতিজিকারে নিজদিগকে শক্তিশালী করিতে থাকে। কিন্তু তাহাদের নেতা ইয়াহয়া ৮৮৯ সালে স্পেনীয়দের হস্তে নিহত হয়। অতঃপর আরবগণ সাওয়ারের নেতৃত্বে আবার শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে। স্পেনীয়গণ এলভিরার গভর্ণর জা'দের নেতৃত্বে আরবদের মোকাবেলা করে কিন্তু আরবদের নিকট তাহারা পরাজয় বরণ করে। ইহার পর আরবগণ আরও শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আরবদের সমর্থন লাভ করিতে থাকে। স্পেনীয়গণ এইবার আমিরের সাহায্য কামনা করে কিন্তু আবদুল্লাহ সাওয়ারের সঙ্গে একটি সমঝোতায় আসেন। সাওয়ারকে এলভিরার শাসনকার্যে অংশ প্রদান করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সাওয়ারের সঙ্গে ওমর বিন হাফসুনের সংঘাত শুরু হয়। সাওয়ার পরাজিত হইয়া আলহামরা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। স্পেনীয়গণ সাওয়ারের সঙ্গে দ্বন্দ্বে পরাজিত হইয়া বোবাষ্ট্রেতে পলায়ন করে। যাহা হউক, কয়েক বৎসর ধরিয়া চলে স্পেনীয়

১. Dozy—Spanish Islam P—324

ও আরবদের মধ্যে সংঘর্ষ। ৮৯৩ সালে আমিরজাদা মোতারিফের সরাসরি হস্তক্ষেপের ফলে এলভিরার দীর্ঘদিনের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থার অবসান ঘটে এবং ইহা পুনরায় কর্দোবার শাসনাধীনে পরিচালিত হয়।

সেভিলে বিদ্রোহ

এলভিরাতে গোলযোগের সুযোগ লইয়া সেভিল ও কর্দোবার অধীনতা ছিন্ন করে। এখানকার অবস্থা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে। সেভিল মুসলিম বিজয়পূর্বে গথ ও রোমানদের জন্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। এখানে বহু প্রভাবশালী খ্রিস্টানদের বসতি ছিল। মুসলিমদের রাজত্বকালে খুব কম সংখ্যক মুসলিম এখানে বসতি স্থাপন করে। অতএব ব্যবসা-বাণিজ্য এবং রাজনীতিতে খ্রিস্টানদের প্রভাব ছিল সর্বাধিক। এখানে নওমুসলিমদের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। তাহারাও কর্দোবার আমিরের নিকট হইতে সব সময়ে যথাযথ ব্যবহার পাইত না। তাহা ছাড়া যে আরব সম্প্রদায় এখানে বসবাস করিত তাহাদের মধ্যে ছিল দুইটি বিবাদমান গোষ্ঠী। ইহাদের মধ্যে ছিল বনু হাজ্জাজ ও বনু খলদুন। বনু হাজ্জাজ চিন্তাধারায় আরবীয় হইলেও রক্তধারায় (মাতৃকূলে) ছিল উইটিজা বংশীয়। বনু খলদুন হাদ্রামাউথ গোত্রীয় ছিল। এই দুই গোত্রের জনগণ পল্লী এলাকায় কৃষিকার্যে যেমন প্রচুর আয় করিতেন, তেমনি শহরে শিল্প বাণিজ্যের দ্বারাও বিপুল মুনাফা অর্জন করিতেন। ইহাদের শহরেও সুন্দর সুন্দর বাসভবন ও বাণিজ্য বিতান ছিল। বৎসরের কিছু সময় তাঁহারা শহরেও বসবাস করিতেন। অতএব পল্লী ও শহরের সঙ্গে তাহাদের নিবিড় যোগাযোগ ছিল।

আবদুল্লাহর রাজত্বের শুরু হইতে বনু খলদুন গোত্রপতি কোরাইব আরব গোত্রগুলিকে আমিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য প্ররোচিত করেন। কুরাইবের চরিত্রে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার অদ্ভুত সংমিশ্রণ ছিল। তবে নেতৃত্বদানে ও সংগঠনে তাঁহার যোগ্যতা ছিল প্রচুর। শহরে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। কারণ যখন তিনি আরবদিগকে তাহাদের আদি অভ্যাস স্বাধীনতার জন্য উৎসাহিত করিতেছিলেন, তখন আমিরের প্রতি অনুগত আরবগণ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার বিভীষিকার কথা চিন্তা করিয়া তাঁহাকে সমর্থন দিলেন না। প্রায় সকলেই সুখ-শান্তি ও নিরাপদে ব্যবসা ও বাণিজ্য করিয়া জীবন যাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। অতএব কুরাইবের নিকট যাহা ছিল স্বাধীনতা, আরবদের নিকট তাহাই ছিল উচ্ছৃঙ্খলতা। তাই শহরের লোক তাঁহাকে সমর্থন দেয় নাই।

এইবার তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য চরিতার্থতার জন্য আসিলেন আরব পল্লী এ্যাজারাফে। সেখানে তাঁহার স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার জন্য উত্তেজনামূলক ভাষণ জনমনে সৃষ্টি করিল বিরাট আলোড়ন। জনগণকে এইরূপে তিনি প্রস্তুত করিলেন যে, তাহারা তাঁহার আদেশের অপেক্ষায় সম্পদ, সম্মান ও জীবন পর্যন্ত প্রস্তুত রাখিল। ইহার পর কুরাইব, বনু হাজ্জাজ, নিয়েবলা, সিদোনা ও কারমোনার বার্বার গোত্র সকলকে লইয়া একটি লীগ বা জোট গঠন করেন। তাঁহার এই জোট গঠনের উদ্দেশ্য হইল আমিরের অধীনতা ছিন্ন করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করা এবং স্পেনীয়দের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা। তিনি

নওমুসলিমদিগকে এবং মেরিদা ও মেদলিনের বার্বারদিগকেও প্ররোচিত করেন। ৮৯১ সালে বার্বারগণ তালাইতা অধিকার করিলে সেভিলের গভর্ণর মেরিদার বার্বারদিগকে শাস্তি প্রদান করিবার জন্য তথায় গমন করেন। কুরাইব ও বার্বারদের সঙ্গে গোপন চুক্তি করিয়া গভর্ণরকে প্রতারণা করিবার জন্য তাঁহার সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়া মেরিদায় গমন করেন। সেখানকার সংঘর্ষে গভর্ণর প্রতারিত হইয়া পরাজয় বরণ করেন এবং বার্বারগণ প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ তালাইতাতে প্রত্যাবর্তন করেন। বাদোজের নওমুসলিম প্রধান ইবনে মারওয়ানও মেরিদাতে যথেষ্ট ধ্বংস কার্য চালান। নগরবাসী তাহাদের অপদার্থ গভর্ণরের বিরুদ্ধে আমিরের নিকট অভিযোগ পেশ করেন এই মর্মে যে, তিনি তাহাদের জানমাল রক্ষা করিতে ও বিদ্রোহীদের দমন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। আমির গভর্ণরকে অপসারিত করিয়া উমাই বিন আলগাফির আল খালিদকে তথায় নিযুক্ত করেন। কিন্তু নবনিযুক্ত গভর্ণরও এই দুর্ধর্ষ বার্বারদের দস্যুবৃত্তি দমন করিতে পারেন নাই। ফলে জনগণ আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। এই দস্যুদলের নেতা ছিল কারমোনার তামাশেকা। সে রাজপথে দস্যুবৃত্তির মাধ্যমে জনমনে সন্ত্রাস কায়েম করে। অতঃপর এছিজার নওমুসলিম প্রধান মুহাম্মদ বিন গালিব আমিরকে এই মর্মে আশ্বাস দিলেন যে, যদি তাঁহাকে এছিজা ও সেভিলের মধ্যে সাইটি টোরেস নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করিতে দেওয়া হয় তবে তিনি দস্যুদের দমন করিতে পারিবেন। আমির এই প্রস্তাবে সম্মত হন। মুহাম্মদ ইবনে গালিব অত্যন্ত কঠোরতার সহিত দস্যুদিগকে দমন করিয়া সেভিলে জননিরাপত্তা ফিরাইয়া আনেন কিন্তু এই শান্ত অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই।

একদা রাত্রিতে খলদুন গোত্রের একটি লোক মুহাম্মদের সৈন্য দ্বারা নিহত হয়। ইহাতে কুরাইব অত্যন্ত ক্ষিপ্র হইয়া আমিরের নিকট মুহাম্মদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। এই বিষয়টি নিষ্পত্তির দায়িত্ব আমিরজাদা মুহাম্মদের উপর অর্পিত হয়। কিন্তু মুহাম্মদ বিষয়টি ফয়সালা করিতে বিলম্ব করিলে কুরাইব বনু হাজ্জাজ গোত্রকে সঙ্গে লইয়া কারিয়া ও কারমোনা দখল করেন। অশান্ত আরবদিগকে দমন করিবার জন্য আমির এলভিরার গভর্ণর জা'দকে মুহাম্মদ ইবনে গালিবের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। অতঃপর জা'দ কুটকৌশলের আশ্রয়ে মুহাম্মদ ইবনে গালিবকে হত্যা করেন এবং বনু হাজ্জাজের নিকট হইতে কারমোনা দখল করেন। অতঃপর জা'দ তাঁহার ভ্রাতা উমাইয়া এবং আমিরজাদা মুহাম্মদের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য সেভিলের দিকে অগ্রসর হন। ওমর বিন হাফসুন এইবার একটি সুযোগ লাভ করেন। তিনি জা'দের বিরুদ্ধে জনতাকে উস্কানি দিয়া উত্তেজিত করেন। মুহাম্মদ ইবনে গালিব হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য ওমরের আহবানে জনতা বিপুলভাবে সাড়া দেয়। জা'দ প্রাসাদে নিজের নিরাপত্তার সন্ধিহান হইয়া ভ্রাতা হাশিম ও আবদুল গাফিরসহ পলায়ন করেন। কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে গালিবের ভ্রাতাগণ কর্তৃক ধৃত হইয়া জা'দ সিয়েটা ফিলা নামক স্থানে নিহত হন। গভর্ণর উমাইয়া ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য বনু খলদুন বনু হাজ্জাজকে স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন। স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ আরবগোত্রদ্বয় পাইকারীহারে স্পেনীয়দের হত্যা করে। নিহতের সংখ্যা ছিল ২০,০০০ এবং আরও অনেকে পলায়নের সময় নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়।

স্পেনীয়দের প্রভাব বিলুপ্ত করিয়া বনু খালদুন ও বনু হাজ্জাজ সেভিলের সর্বময়

ক্ষমতার অধিকারী হইয়া বসে। আমির কুরাইবের প্রভাব হ্রাস করিয়া কর্দোবার নিরঙ্কুশ আধিপত্য সেভিলে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন না। অথচ গভর্ণর উমাইয়াকে সেভিলের বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ হারাইতে হইল। এইবার আমির পিতৃব্য হিশামের সঙ্গে আর একজন গভর্ণর প্রেরণ করেন সেভিলে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনিও শান্তিস্থাপনে ব্যর্থ হন। এইবার কুরাইবের ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বারা হিশামের পুত্র হাদী নিহত হয়। গভর্ণর নিরূপায় হইয়া বনু খলদুনকে শায়েস্তা করিবার জন্য আমিরের নিকট সাহায্য চাহিয়া বার্তা প্রেরণ করেন। কিন্তু গভর্ণর প্রেরিত বার্তা বনু খলদুন হস্তগত করে। তাহারা গভর্ণরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রাসাদ আক্রমণ করে এবং তাহাকে বন্দী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করে। ৮৯১ সালে এমনি এক মারাত্মক পরিস্থিতি সেভিলে বিরাজ করিতে থাকে।

৮৯৫ সালে আবদুল্লাহর পুত্র আমিরজাদা মুহাম্মদ সেভিলে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালান। কিন্তু তাঁহার প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। কুরাইব ও ইব্রাহিম ইবনে হাজ্জাজ সেভিলকে দুইভাগে ভাগ করিয়া নিজেরা দখল করিতে থাকেন। তবে তাঁহাদের ক্ষমতা বেশিদিন স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। আমির সেভিলকে কর্দোবার দখলে আনিবার জন্য এক শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করেন। রাজকীয় বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহীগণ যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হয়। কুরাইব ৮৯১ সালে নিহত হন এবং ইব্রাহিম বিন হাজ্জাজ শর্তসাপেক্ষে আত্মসমর্পণ করেন। ইব্রাহিম সেভিলের গভর্ণর কাসিমের সঙ্গে সংযুক্তভাবে সেভিলের প্রশাসনিক ক্ষমতা অধিকার করেন। পরে ওমর বিন হাফসুনের সহায়তায় ইব্রাহিম কাসিমকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া নিজে এককভাবে সেভিলের শাসনভার গ্রহণ করেন। দীর্ঘ দিনব্যাপী সেভিলবাসী বিদ্রোহ আর বিশৃঙ্খলা, অশান্তি আর নিরাপত্তাহীন জীবন লইয়া চরম সঙ্কটে কালযাপন করিতে থাকে। এইবার ইব্রাহিম নির্বিঘ্নে সেভিলবাসীকে শান্তি ও সমৃদ্ধির আশ্বাস দিয়া শাসন পরিচালনা করিতে থাকেন। বহুদিন পর সেভিলবাসী যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। ইব্রাহিম দেশের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক নূতন অধ্যায় শুরু করিলেন। তিনি কবি ও সঙ্গীতজ্ঞদিগকে লইয়া সেভিলে আনন্দমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করিলেন। দীর্ঘদিনের গৃহযুদ্ধে ক্লান্ত আরব, বার্বার ও নওমুসলিমগণ একটি শৃঙ্খলা ও শান্তিপূর্ণ শাসনে বসবাস করিতে থাকেন। মেনতেছা, মেদিনা, সিদোনা, লোরসা ও সারাগোসায় আরবগণ প্রভুত্ব বিস্তার করেন এবং আলগারব, বেজা, মুরসিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বার্বারগণ প্রাধান্য লাভ করে। এইভাবে দেখা যায় যে, আবদুল্লাহর রাজত্বকালে বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থান কর্দোবার কেন্দ্রীয় শাসন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আমিরের দুর্বলতার সুযোগে খ্রিস্টানগণের আগ্রাসন নীতিও বৃদ্ধি পায় এবং ওমর বিন হাফসুনের কর্মতৎপরতাও বৃদ্ধি পায়।

ওমর বিন হাফসুন

আমিরের দুর্বলতার জন্য রাজ্যব্যাপী বিশৃঙ্খলা এবং গোলযোগের সুযোগে ওমর খুবই সতর্কতার সহিত তাঁহার দুর্ভেদ্য বোবাষ্ট্রর দুর্গগুলি মজবুত করেন এবং ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আপন প্রভাব বৃদ্ধি করেন। ৮৮৯ সালে বসন্তকালে আমির ওমরের বিদ্রোহাত্মক কার্যাবলী রোধ করিবার জন্য একটি অভিযান শুরু করেন। সুদীর্ঘ ৪০ দিন ব্যাপী চলে

রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। কিন্তু ওমরকে পরাজিত করিতে না পারিয়া আমির ভগ্নহৃদয়ে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। আমিরের সহিত পরবর্তীকালে ওমরের আরও একটি মোকাবেলা হয় কিন্তু ইহাতে বিশেষ সুবিধা না হওয়াতে আমির ওমরের সঙ্গে একটি চুক্তি করেন। চুক্তিতে উল্লেখ থাকে যে, ওমর তাঁহার অধিকৃত অঞ্চলে নিজ প্রভাব কায়েম রাখিবেন তবে তিনি আমিরের আবাসিক প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করিবেন। কিন্তু ওমরের অনুচরগণ শান্তিপূর্ণ ও তাঁহার নিয়মতান্ত্রিক শাসনে বিশ্বাসী ছিল না, কারণ তাহারা লুন্ঠনবৃত্তিই পেশা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল এবং সেইজন্যই ওমরের প্রতি তাহাদের আনুগত্য ছিল। অতএব তাহারা বেশিদিন শান্তিতে বসবাস পছন্দ করে নাই এবং হঠাৎ আলজিসিরাসের বার্বার প্রধান আবু হারবকে আক্রমণ করিয়া বসে এবং আবু হারবের দুর্গটিও দখল করে। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমির ওমরের নিকট সাহায্য চাহিলে ওমর তাঁহার আসল উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়া রাজকীয় সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন। ওমর জায়েনের ইবনে মাসতানাহর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া আপন বর্ধিত শক্তির বলে আমিরের সেনাপতি ইব্রাহিম বিন খামিরকে বন্দী করেন এবং আরও অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। খ্রিস্টানদের সহায়তায় ওমর রাজধানীতে তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিতে শুরু করেন। তাঁহার শক্তি এতদূর বিস্তার লাভ করে যে, কর্দোবাও ওমরের আগ্রাসনের সম্মুখীন হয়। মূলতঃ ওমর স্পেনের defacto শাসক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এইখানেই ওমরের কৃতিত্বের চূড়ান্ত পর্যায়। এমনকি ওমর বিন হাফসুন আব্বাসীয় খলিফা মু'তাদিদ বিল্লাহর নিকট সনদ প্রার্থনা করিয়া পত্র প্রেরণ করেন। কার্যতঃ দেখা গিয়াছে যে, আমির আবদুল্লাহ ওমর বিন হাফসুনকে তো পরাজিত করিতে পারেন নাই বরং নিজেই তাঁহার নিকট নগণ্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন। এই সময়টি নিঃসন্দেহে উমাইয়া শাসনের পক্ষে খুবই দুঃখজনক ছিল।

এই সংকটময় মুহূর্তে আমিরের মনে জাগরিত হইল বংশীয় মর্যদা রক্ষার দৃঢ় সংকল্প। আমিরের রক্তধারায় প্রবাহিত হইল উষ্ণতার আমেজ। তিনি স্থির করিলেন, দুর্দমনীয় ও দুর্বিনীতি বিশ্বাসঘাতক ও ধূর্ত ওমর বিন হাফসুনকে এ চরম আঘাত হানিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সেনাপতি আবদুল মালিক বিন উমাইয়াকে ৪০০০ হাজার নিয়মিত ও ১০,০০০ সদ্য সংগৃহীত সৈন্য দিয়া পোলি অভিমুখে প্রেরণ করেন। তিনি এই যুদ্ধে সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। ৮৯১ সালে ওমর তাঁহার দুর্ধর্ষ ৩০,০০০ অনুচর লইয়া রাজকীয় বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেন এইবার ভাগ্য আমিরের প্রতি সুপ্রসন্ন ছিল। বারংবার প্রতারণায় দক্ষ দস্যু ও বিশাল এলাকার অধিকর্তা ধূর্ত ওমর রাজকীয় বাহিনীর নিকট এই যুদ্ধে চরমভাবে পরাজিত হন। তিনি পোলি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার অধিকাংশ অনুচর আরবগণ কর্তৃক ধৃত হয়। ইহার পর রাজকীয় বাহিনীর অগ্রাভিযান অব্যাহত থাকে। বিপদ আসন্ন মনে করিয়া ওমর তাঁহার বিশ্বস্ত সঙ্গী ইবনে মাসতানাহকে লইয়া পোলি ও আর্চিদোনা ত্যাগ করিয়া ক্যাবরায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। পোলি অধিকৃত করিবার পর আবদুর রহমান অজস্র ধনসম্পদ ও সমরাস্ত্র লাভ করেন। অতঃপর এছিজা দখল করিয়া বোবাষ্ট্র অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বোবাষ্ট্র অবরোধ করিলেও উহা অনধিকৃত রাখিয়া তাঁহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। তাঁহার রণক্লান্ত সৈন্যগণ আর

অধিককাল রণাঙ্গনে থাকিতে সম্মত ছিল না। আবদুল্লাহ্ সাময়িকের জন্য তাঁহার হৃত গৌরব কিছুটা পুনরুদ্ধার করেন।

পরাজয়ের গ্লানি ওমরের মর্যাদায় আঘাত হানিলেও তিনি নিরুৎসাহ হন নাই। তিনি আমিরের সঙ্গে আরও প্রত্যক্ষ যুদ্ধের সম্মুখীন না হইয়া শান্তি চুক্তির মাধ্যমে কিছুটা অবসর গ্রহণ করেন। ওমর আমিরের ইচ্ছানুযায়ী মৈত্রী চুক্তি করিয়া তাঁহার দত্তকপুত্রকে কর্দোবায় জামিনস্বরূপ প্রেরণ করেন। আমির ওমরের নিকট আপনপুত্র দাবী করিয়া ছিলেন। কিন্তু ওমর ধূর্তামি করিয়া দত্তকপুত্রকে আপন বলিয়া প্রেরণ করেন। এই ধূর্তামি প্রকাশ পাওয়াতে আমির ওমরের নিকট আসল পুত্রের দাবী করেন। কিন্তু ওমর ইহাতে অসম্মত হন। ইহার পর আমির তাঁহার বিরুদ্ধে আবার অভিযান শুরু করেন। ওমর নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ৮৯২ সালে আমিরের বাহিনীর সঙ্গে মোকাবেলা করেন। এইবার ওমর বিরাট সাফল্য অর্জন করেন। অতি দ্রুতগতিতে তিনি হৃত অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করেন। পোলি, এছিজা, আর্চিদোনা ও এলভিরা দখল করেন। গ্রানাদার আরবনেতা সাঈদ বিন জুদীকেও পরাজিত করিয়া গ্রানাদার আপন প্রভাব কায়েম করেন। জায়েনও তাঁহার অধিকারে চলিয়া আসে। ক্রমাগত যুদ্ধের সাফল্যে ওমর বিন হাফসুন অত্যধিক গর্বিত হইয়া উঠেন এবং তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ও ধংসাত্মক ভুল করিয়া বসেন। ৮৯৯ সালে তিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়া খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্তই তাঁহাকে সাফল্যের মোড় পরিবর্তন করিয়া ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে। তাঁহার এহেন কপটতায় সমগ্র মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে বিরাট গণ-অসন্তোষ দেখা দেয়। ওমর মনে করিয়াছিলেন যে, খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণের ফলে হয়ত সমস্ত খ্রিস্টান রাজ্যগুলি তাঁহার সাহায্য ও সমর্থনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করিবে। কিন্তু তাঁহার এই সিদ্ধান্ত যথার্থ হয় নাই। তাঁহাকে খ্রিস্টানগণ বিশ্বাস করিতে পারে নাই যে, সত্য সত্যই ওমর মনেপ্রাণে খ্রিস্টান হইয়াছেন, না কোন কপটতার পোষাকে নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। অতএব ওমর না পাইয়াছে মুসলমানদের সমর্থন আর না পাইয়াছে খ্রিস্টানদের সহানুভূতি। ধর্মান্তরণের ফলাফল শুরু হয় সঙ্গে সঙ্গেই। তাঁহার বিশ্বস্ত অনুসারী ইয়াহয়া বিন আনাতুলি তাঁহার দল ত্যাগ করেন। ক্যানটির বার্বার সর্দার আওছাজা বিন আলখালী আমিরের বশ্যতা স্বীকার করেন। দীর্ঘকাল বিশৃঙ্খলাময় পরিবেশ হইতে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে জনগণও আবদুল্লাহর অধীনতা স্বীকার করিতে শুরু করে। তবে আমির এই সময়ে ওমরের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে নাই। ফলে সুনিশ্চিত সাফল্য হইতে তিনি বঞ্চিত হন।

শেষ জীবন

সিংহাসনে আরোহণের দিন হইতে শুরু করিয়া জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত আবদুল্লাহকে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। জনগণ তাঁহাকে সঠিকভাবে বুঝিতে পারে নাই। তিনিও জনগণের নিকট নিজ প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয়ও প্রদান করিতে পারেন নাই। ফলে, চরম দুর্যোগ নামিয়া আসে কর্দোবার শাসনে ইহার ফল আমিরকেও ভোগ করিতে হইয়াছে এবং জনগণকেও যথেষ্ট মূল্য দিতে হইয়াছে। জনগণ তাঁহার

রাজত্বের শেষের দিকে নিজেদের ভুল বুঝিতে পারে এবং কর্দোবার শাসনাধীনে আসিতে শুরু করে। আমির আবদুল্লাহর চরিত্রের দুর্বলতা ও রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা এবং সমরনীতিতে অপটুতাই তাঁহাকে ব্যর্থতার মধ্যে নিক্ষেপ করে। তাঁহার রাজত্বকালে বনু খলদুন ও বনু হাজ্জাজ এবং ওমর বিন হাফসুন সর্বাপেক্ষা বেশি বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তবে শত্রুদের সঙ্গে দীর্ঘদিন যাবৎ জয়পরাজয়ের পালা বদল করিয়া শত্রুদিগকে তিনি দুর্বল করিয়া ফেলেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীর জন্য শান্তির পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখেন। এইজন্যই যোগ্য সাহসী ও সমরকুশলী আবদুর রহমান (৩য়) তাঁহার বিজয়কেতন কর্দোবার প্রাসাদশিখরে সমুন্নত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মৃত্যু

সুদীর্ঘ ২৪ বৎসর যাবৎ বিদ্রোহবিক্ষুব্ধ পরিবেশে শাসনক্ষমতা পরিচালনা করিয়া ৬৮ বৎসর বয়সে ৯১২ সালে আমির আবদুল্লাহ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

একাদশ অধ্যায়

আবুদর রহমান (তৃতীয়) ৯১২-৯৬১

[সার সংক্ষেপ ঃ সূচনা ❑ আবদুর রহমান (৩য়) ❑ সেভিল ❑ ওমর বিন হাফসুন ❑ ওর বিন হাফসুনের বংশধর ❑ তুদমিরে শান্তি স্থাপন ❑ তলেদাতে বিশৃঙ্খলার অবসান ❑ খ্রষ্টানদের সঙ্গে সংঘর্ষ- , ফাতেমীয়দের সঙ্গে সংঘাত ❑ তাহার কৃতিত্বের মূল্যায়ণ ❑ চরিত্র ও মৃত্যু।]

আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর আমিরজাদা মুহাম্মদের পুত্র আবদুর রহমান ২২ বৎসর বয়সে সিংহাসন লাভ করেন। আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ বিদ্রোহী ওমর বিন হাফসুনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিবার ফলে নিহত হন। আবদুল্লাহর অপর পুত্র মোজাফরের সিংহাসন লাভ করিবার অধিকার ছিল। কিন্তু মুহাম্মদের পুত্র আবদুর রহমান সেই সময়ের জন্য সর্বাপেক্ষা যোগ্য প্রমাণিত হওয়ায় তিনিই শাসনভার গ্রহণ করেন। অমাত্যবর্গ সরকারী কর্মচারীবৃন্দ, আমির পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং রাজ্যের ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই তাঁহার সিংহাসন লাভের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাগত জানায়। বিদ্যা-বুদ্ধি, আচার ব্যবহার, নিয়ম-রীতি এবং আমিরসুলভ সমুদয় গুণরাজিতে তিনি ছিলেন বিভূষিত। তাঁহার সুদর্শন চেহারা ও জ্ঞানোদীপ্ত চাহনিই ভাবী গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল। উমাইয়া বংশের গৌরব যখন অস্তমিত প্রায় ঠিক সেই সময়ে তাঁহার আবির্ভাব সুদৃঢ় প্রত্যয়ে হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার শুধু নহে বরং পুনর্বদ্ধনে তাহার প্রয়াস ছিল সর্বক্ষণ। তাঁহার ক্ষমতাগ্রহণ স্পেনে উমাইয়া বংশের নবযুগের শুভ উদ্বোধন।

আবদুর রহমান অল্প বয়সেই পিতৃহীন হন। কারণ বিদ্রোহাত্মক কার্যের অপরাধে পিতামহ কর্তৃক তাঁহার পিতা নিহত হন। কিন্তু বাল্যবয়স হইতেই লেখাপড়ার প্রতি তাঁহার প্রবল আগ্রহ ছিল। মাত্র ৮ বৎসর বয়সে তাঁহাকে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের বাণী শিক্ষা দেওয়া হয়। ১১ বৎসর বয়সে তিনি ব্যাকরণ, রাজবংশের ইতিহাস ও রাজ্যশাসন পাঠ শিক্ষা করিতে থাকেন। এই একই সঙ্গে তিনি অশ্বচালনা, তীর ও বর্শা নিক্ষেপ এবং তরবারি চালনার প্রাথমিক অধ্যায়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে শুরু করেন। অতএব দেখা যায় যে, যে বয়সে সাধারণ ছেলেরা নিছক খেলাধূলা লইয়া আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত সেই সময়ে গভীর মনোযোগ ও একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আবদুর রহমান জ্ঞান সাধনায় নিমগ্ন এবং রাজ্য পরিচালনা ও রণকৌশল শিক্ষায় প্রশিক্ষণরত। রাজ্য পরিচালনার জন্য যে গুণ ও যোগ্যতার

প্রয়োজন তাহা তিনি ১১ বৎসর ধরিয়া সযত্নে আয়ত্ত করেন। অতএব ২২ বৎসর বয়সে যখন তিনি ভগ্নপ্রায় উমাইয়া শাসন গ্রহণ করেন তখন সকলেই তাঁহার প্রতিভার ও যোগ্যতার উপর দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করে। রাজ্যেররক্ষক হিসাবে তিনি সকলের সমর্থন লাভ করেন। বিদ্রোহীদের প্রতি কঠোরতা, প্রশাসনে দক্ষতা, রণক্ষেত্রে অসীম সাহসিকতা এবং জনকল্যাণে মহানুভবতা প্রদর্শনের ফলে ১৮ বৎসরের মধ্যে বার্বার, নওমুসলিম, আরব, মুজারব, স্পেনীয় খ্রিস্টান ও ইহুদীদের অন্তরে তিনি সম্মানজনক আসন লাভ করিতে সমর্থ হন।

"বহু বৎসরের গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার পর জনগণ সানন্দে নতুন আমিরকে স্বাগত জানায় শস্যক্ষেত্র ও দ্রাক্ষাকুঞ্জ ধ্বংস করিতে পারে এমন কোন দস্যু ছিল না। যদিও সুলতান একক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তথাপিও তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন নাই। দেশবাসী শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে প্রত্যাবর্তন করে এবং জনগণ অন্ততঃপক্ষে বিনা বাধায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ধনলাভ করিবার সুযোগ লাভ করে।"[১]

আবদুর রহমানের পূর্ববর্তী আমিরগণ বিশেষভাবে আবদুল্লাহ, মুনজির ও মুহাম্মদ সুষ্ঠু ও সাহসিকতার সহিত রাজ্য শাসন না করিতে পারায় বহু প্রদেশ কর্দোবার শাসন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া জনগণের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এবং জানমালের বিস্তর ক্ষতিসাধন করে। যাতায়াতের রাস্তাগুলি ভীষণ বিপজ্জনক হইয়া পড়ে। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জনগণের ফরিয়াদ ছিল 'জানমালের নিরাপত্তা চাই', 'দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা হউক।' দীর্ঘস্থায়ী ও ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলা গোলযোগের ফলে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতিতে চরম নৈরাজ্য বিরাজ করিতে থাকে। এমনি সময়ে কীর্তিমান পুরুষ আবদুর রহমান দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য ব্যাপক কর্মসূচী লইয়া স্পেনের রাজনৈতিক গগনে আবির্ভূত হন। তিনি দস্যু ও বিদ্রোহীদের সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রামী মনোভাব লইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। তিনি দুর্বিনীত আরব, স্পেনীয়, নওমুসলিম ও বার্বারদের বিরুদ্ধে সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া তাহাদের বশ করিতে সক্ষম হন।

তিনি বিদ্রোহী ও পার্বত্য দস্যুদের প্রতি ঘোষণা করেন—"আমি তোমাদের কর চাইনা, চাই তোমাদের দুর্গ, অস্ত্র ও আস্তানা।" আবদুর রহমানের এই বজ্রদৃঢ় ঘোষণার মধ্যে ছিল বিদ্রোহীদের আতংকসৃষ্টির অপূর্ব শক্তি। এই সময়টিও আবদুর রহমানের পক্ষে কিছুটা অনুকূল ছিল। কারণ স্পেনের রাজনৈতিক দিগন্তে আলোড়ন সৃষ্টিকারী দুইটি গোত্র ও একজন দুর্ধর্ষ ব্যক্তি তখন পতনের পথে। গোত্র দুইটি হইল বনু খলদুন ও বনু হাজ্জাজ। বনু খলদুনের কুরাইব ও বনু হাজ্জাজের ইব্রাহিম এবং সাঈদ বিন জুদী প্রভৃতি নেতার জীবন অবসান ঘটিয়াছে এবং আর কোন প্রভাবশালী নেতার উদ্ভব হয় নাই। একজন ব্যক্তি দুর্ধর্ষ ওমর বিন হাফসুন। তিনি তখন বৃদ্ধ বয়সে উপনীত ও জীবনের উত্থান ও পতনের পালা বদলে পর্যুদস্ত। অপরদিকে দেশের জনগণও শান্তির জন্য উদ্বিগ্ন। আমিরের দুর্বলতার জন্য জনগণ আমিরদিগকে সমর্থন দিতে পারে নাই অথচ বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করিয়াও নিরাপত্তা পায় নাই। তাঁহারা দেখিয়াছে ক্ষেতের পাকা ফসল, গাছের পাকা ফল, শহরের বাণিজ্যসম্ভার আর জনপদের অসংখ্য জনমানুষ কখনও বা আমিরের সৈন্যদ্বারা আবার

১. Lane poole—Moors in Spain P—113

কখনও বিদ্রোহীদের দ্বারা ধ্বংস হইয়াছে। তাই আবদুর রহমানের মধ্যে তাঁহারা খুঁজিয়া পায় শক্তির দৃঢ়তা এবং শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। জনগণের সহানুভূতি ও সমর্থন আদায়ের বিশেষ গুণে আবদুর রহমান বিভূষিত ছিলেন। জনগণকে খুশী কিংবা হতবাক অথবা শাসন করিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আবদুর রহমান বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া অস্ত্র প্রতিযোগিতায় আমিরের বশ্যতা স্বীকার করিল। জায়েন তাহার নগরকপাট উন্মুক্ত করিল আমিরের জন্য। আর্চিদোনাও অধীনতা স্বীকার করিল। অতএব তাঁহার সিংহাসন আরোহণ স্পেনের মুসলমানদের শাসনের জন্য ছিল এক গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা। নিম্নে তাঁহার রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ দেওয়া হইল।

সেভিল

আবদুর রহমানের সময়ে সেভিলের প্রতাপশালী বনু হাজ্জাজের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা। আত্মকলহ ও গৃহযুদ্ধে তাহাদের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। ইব্রাহিম ইবনে হাজ্জাজের মৃত্যুর পর আবদুর রহমান ও মুহাম্মদ সেভিল ও কারমোনায় যথাক্রমে শাসনক্ষমতা পরিচালনা করেন। আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর মুহাম্মদ শক্তি সঞ্চয় করিয়া সমগ্র বনু হাজ্জাজ শাসিত অঞ্চল আপন কর্তৃত্বে রাখিবার প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্র আহমদ বিন মাসলামাহ তাঁহার এই বাসনাকে নস্যাৎ করিয়া দেন। তিনি মাসলামাহর নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। তথায় তিনি রাজকীয় সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল রাজকীয় শক্তির সাহায্যে সেভিলে শাসনক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা। রাজকীয় বাহিনী সেভিল অবরোধ করিলে ইবনে মাসলামাহ ওমর বিন হাফসুনের সাহায্যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলেন। কিন্তু রাজকীয় বাহিনীর ভীষণ আক্রমণের মুখে তাঁহারা টিকিতে পারেন নাই। এই সংঘর্ষ সংঘটিত হয় ৯১৩ সালে ইতিহাস বিখ্যাত গোয়াদাল কুইভার নদীর তীরে। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আহমদ বিন মাসলামাহ আমির আবদুর রহমানের (৩য়) প্রধানমন্ত্রী বদরের সঙ্গে একটি চুক্তি করেন। এ দিকে মুহম্মদ যখন দেখিলেন বদর সেভিলের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সোপর্দ করিয়াছেন তখন তিনি ব্যর্থ মনোরথে কারমোনায় গমন করেন। অতঃপর আমির ৯১০ সালে তাঁহাকে উজির খেতাবে ভূষিত করিয়া কারমোনাও হস্তগত করেন। এইবার তিনি বিদ্রোহের আখড়া সেভিল ও কারমোনা পুন.ায় কর্দোবার শাসনে লইয়া আসেন।

ওমর বিন হাফসুন

বোবাষ্ট্রের দস্যুসর্দার, দক্ষিণ স্পেনের সন্ত্রাসী নেতা, মুসলিম শাসনের দুর্দমনীয় বিদ্রোহী ওমর বিন হাফসুন এখন রণে ক্লান্ত ও তেজে নিষ্প্রভ। উমাইয়া আমির মুহাম্মদ (১ম) মুনজির ও আবদুল্লাহর রাজত্বকালে তাঁহার বিদ্রোহী শক্তি, অপরূপ রণকৌশল ও বিচিত্র ধূর্তামিতে ভয়াবহ আতংক সৃষ্টি করেন। কিছু সময়ের জন্য তিনি স্পেনের অপরাজেয় শাসকের ভূমিকাও পালন করেন। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে ও অবস্থার পরিবর্তনে তাঁহার মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দেয়। খ্রিস্টান জনগণের সমর্থন ও সাহায্য তাঁহাকে দিকভ্রষ্ট করিয়া

তোলে। ৮৯৯ সালে তিনি ও তাঁহার সহকর্মী ইবনে মাসতানা খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। তাঁহার অধিকৃত অঞ্চলে গড়িয়া তুলিলেন অসংখ্য গীর্জা। তাঁহার মধ্যে যেন দেখা দিল মুসলিম বিদ্বেষের চরম বহিঃপ্রকাশ। মুসলিম ওমর এখন খ্রিস্টান স্যামুয়েলে রূপান্তরিত। কিন্তু তাঁহার এই ধর্মান্তরণ তাঁহার অনুসারীদের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। নওমুসলিম, সার্ব ও ক্রীতদাসগণ তাঁহার দল ত্যাগ করে। তাহারা কোনক্রমেই খ্রিস্টান শাসন কামনা করে নাই। কারণ তাহাদের পূর্বের ইতিহাস তাহাদের নিকট এখন চির ভাস্বর। অতএব স্যামুয়েলের দল ত্যাগ করিয়া তাহারা সমবেতভাবে আমিরের অধীনে প্রত্যাবর্তন করে। স্যামুয়েলের বহু সহচর তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া আমিরের সৈন্যদলে যোগদান করে। স্যামুয়েল এখন খ্রিস্টান। আফ্রিকার সৈন্যদের শক্তির উপর নির্ভরশীল এবং এখান হইতে তাঁহার দ্রুত পতনের পালা শুরু হয়। আবদুর রহমান ওমর বিন হাফসুনের (স্যামুয়েল) সম্বন্ধে খুব ভালভাবেই অবগত ছিলেন। তিনি এইবার সিদ্ধান্ত লইলেন যে ক্রমাগত আক্রমণ চালাইয়া এই পার্বত্য দস্যুদেরকে চিরতরে পরাজিত করিতে হইবে। আবদুর রহমান স্যামুয়েলকে গোয়াদাল কুইভার নদীর তীরে আক্রমণ করেন এবং অতি সহজেই তাঁহাকে পরাজিত করিতে সক্ষম হন। অতঃপর তিনি রিজিও আক্রমণ করিলে খ্রিস্টানগণ প্রাণপণ চেষ্টা চালায় নগর রক্ষায়। কিন্তু রিজিওর পতন ঘটে আবদুর রহমানের হাতে। আমির স্যামুয়েলের আশ্রয়স্থল টোলক্স অবরোধ করেন। প্রবল আক্রমণের মুখে টোলক্স আমিরের হস্তগত হয়। স্যামুয়েলের পুত্রগণ দুর্গরক্ষার যথেষ্ট চেষ্টা করে। কিন্তু পরিশেষে দুর্গ সোপর্দ করিতে তাহারা বাধ্য হয়।

স্যামুয়েল ৯১৭ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ওমর বিন হাফসুনের উত্থান পতন স্পেনের ইতিহাসে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। পর্বত দস্যুর জীবন হইতে শুরু করিয়া তিনি কর্দোবার আমিরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপেও নিজকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার সাংগঠনিক প্রতিভা ও রণকৌশল সত্যই বিস্ময়কর। তিনি বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন যথেষ্ট। কারণ ক্রমাগত ৩০ বৎসর চারিজন আমিরের সঙ্গে তিনি শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। তবে তাহার ধূর্তামি, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বার্থপরতা ও দস্যুবৃত্তি তাঁহার বীরত্বের মহিমাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। ইবনে হাফসুন সুদীর্ঘ ৩০ বৎসরব্যাপী যুদ্ধ করিয়াও তাঁহার উদ্দেশ্য সফল করিতে পারেন নাই। শেষ জীবনের মারাত্মক সিদ্ধান্তই তাঁহার চরম বিপর্যয় ডাকিয়া আনে। তিনি যদি খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ না করিতেন তবে তাঁহার বংশের ইতিহাস আরও বিস্তৃত হইত। আর তিনি যদি তাঁহার অমিতশক্তি ও অফুরন্ত সাররিক প্রতিভা লইয়া আমিরের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিয়া মুসলিম স্পেনের স্বার্থে কাজ করিতেন তবে তাঁহার সাফল্য সুদূরপ্রসারী হইত। অন্যদিকে কর্দোবার শান্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাইত এবং দক্ষিণ স্পেনে খ্রিস্টান উপদ্রবের অবসান ঘটিত।

ওমর বিন হাফসুনের বংশধর

ওমর বিন হাফসুনের চারিজন পুত্র ছিলেন। জাফর, সুলায়মান, আবদুর রহমান ও হাফ্স। পিতার মৃত্যুর পর জাফর তাঁহার আরব্ধ কার্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাধীনতা টিকাইয়া

রাখিতে পারেন নাই। ৯১৯ সালে তিনি আবদুর রহমানের নিকট বার্ষিক কর প্রদানে স্বীকৃত হন। জাফর আবার ইসলামধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন কিন্তু তাঁহার অনুসারীগণ ইহাতেও সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই এবং তিনিও তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিতে ব্যর্থ হন। অধিকন্তু খ্রিস্টানগণ তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ৯২০ সালে তাঁহাকে হত্যা করে। সুলায়মান জাফরের স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু তিনি তাঁহার অনুসারীদের মধ্যে নিজের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করিতে পারেন নাই, কারণ আবদুর রহমানের শান্তিপূর্ণ শাসনের প্রতিশ্রুতিতে জনগণ তাঁহাকে বিপুলভাবে সাহায্য ও সমর্থন দিতেছিল। সুলায়মান ৯২৭ সালে রাজকীয় বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। সুলাইমানের পর হাফ্‌স বোবাষ্ট্রে অধিপতি হন। এইবার দীর্ঘদিন পর বোবাষ্ট্রের দুর্ভেদ্য দুর্গ কর্দোবা বাহিনীর হস্তগত হইল। আবদুর রহমান দীর্ঘ ছয়মাস যাবৎ বোবাষ্ট্রে অবরোধ করিয়া রাখেন। হাফ্‌সের অনুসারীগণ এই সুদীর্ঘ সময় ধরিয়া দুর্গ প্রতিরক্ষা করেন। কিন্তু রাজকীয় বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে হাফ্‌স অবশেষে আত্মসমর্পণ করেন। ইহার ফলে দুর্গের পতন ঘটে। অর্ধশতাব্দীর বিদ্রোহীগণের আস্তানা ইবনে হাফসুনের দুর্ভেদ্য দুর্গ ও কর্দোবার আমিরের সামরিক লক্ষ্য বোবাষ্ট্রে অধিকার করিয়া আবদুর রহমার এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি স্থাপন করিলেন। এইভাবে ওমর বিন হাফসুন ও তাঁহার বংশধরদের ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটিল।

তুদমিরে শান্তি স্থাপন

বোবাষ্ট্রে অধিকার করিবার পর দক্ষিণাঞ্চলের শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এইবার তিনি অন্যান্য গোলযোগপূর্ণ অঞ্চলের দিকে মনোনিবেশ করেন। ৯২৮ সালে আলকানতি অধিপতি আরব শেখ আসলামীকে পরাজিত ও বন্দী করেন। তাঁহাকে সপরিবারে কর্দোবাতে আনয়ন করিয়া এই অঞ্চলে শান্তি স্থাপন করেন।

মেরিদা ও বেজাও বশ্যতা স্বীকার করে। অতঃপর আলগারভ প্রদেশের নওমুসলিম প্রধান খালাফ বিন বকরও আত্মসমর্পণ করে। ৯৩৩ সাল পর্যন্ত বাদাজজের ইবনে মারওয়ান রাজকীয় বাহিনীর সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা চালাইতে থাকেন। কিন্তু তিনি অবশেষে শান্তি স্থাপনে বাধ্য হন।

তাসেদোতে বিশৃঙ্খলার অবসান

আমির এইবার তলেদোর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। দীর্ঘদিন যাবৎ তলেদো শাসন হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। তিনি প্রথমে শান্তি প্রতিষ্ঠার শুভেচ্ছার বাণী দিয়া কয়েকজন ফকিহ্‌কে তলেদোতে প্রেরণ করেন। তাঁহারা নগরবাসীকে এই বলিয়া অনুরোধ জানাইলেন যে, সমগ্র স্পেনে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার শুভ সূচনা শুরু হইয়াছে। অধিকাংশ শহর ও নগর আমিরের অধীনতা স্বীকার করিয়া সুখ-শান্তিতে বসবাস করিতেছে। অতএব এখন তলেদোবাসীর উচিত কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করিয়া আমিরের বশ্যতা স্বীকার করা। কিন্তু ফকিহ্‌দের এ আবেদন ব্যর্থ হয় এবং আমিরও শান্তির পথে তালেদোবাসীকে বশ করিতে পারিলেন না। বনু কা'সীও লিয়োনরাজের প্ররোচনায় তলেদোবাসী যুদ্ধের পথ

অনুসরণ করিল। অগত্যা আমিরকেও তলেদো অধিকারের জন্য সৈন্যবাহিনী লইয়া নগর অবরোধ করিতে হইল। প্রথমতঃ আমির প্রধানমন্ত্রী সেনাপতি সাঈদ বিন মনজিরকে নগর অবরোধের জন্য প্রেরণ করেন। পরে তিনি স্বয়ং এক শক্তিশালী বাহিনী লইয়া তলেদোর অদূরে মো'রা দুর্গ দখল করিয়া সেখানেই ঘাঁটি স্থাপন করেন। তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, নগর অধিকার করিতে বিলম্ব হইবে তখন তিনি তলেদোর সন্নিকটে আলফাতাহ্ নগরী তৈরি করিলেন। তাঁহার পর তিনি সেখান হইতে তাঁহার দৃঢ় সংকল্পের কথা নগরবাসীকে জানাইলেন যে, যতদিন প্রয়োজন হউক নগর দখল না করিয়া তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিবেন না। বলা বাহুল্য, অবরোধ দীর্ঘায়িত হওয়ার দরুণ নগরে ভীষণ খাদ্য ও পানীয়ের অভাব দেখা দেয় এবং ভীষণ দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করিতে থাকে। এই সময়ে নগরবাসীর সাহায্যে লিয়োনরাজও আবদুর রহমানের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসেন। কিন্তু ভীষণভাবে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। নগরবাসীর দুর্দশা চরমে পৌঁছাইলে তাহারা বাধ্য হইয়া নগরদ্বার অর্গলমুক্ত করে। আবদুর রহমান দীর্ঘদিন সংগ্রামের পর অভূতপূর্ব বিজয়ে নগরে প্রবেশ করেন। কারণ এই নগর ছিল আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র। নগর জয় করিয়া তিনি স্রষ্টার অপার মহিমায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আরব স্পেনীয় বার্বার ও নওমুসলিম সকলেই নতজানু হইয়া সংঘবদ্ধভাবে তাঁহার নিকট আনুগত্য প্রকাশ করে। এইবার আবদুর রহমানের জীবনের সাফল্য যে ষোলকলায় পূর্ণ হইল। কারণ যে নগর এতদিন ছিল বিদ্রোহীদের আড্ডা তাহা এখন তাঁহার করতলে। নগর বিজয়ে আবদুর রহমানের সাফল্য সম্পর্কে ঐতিহাসিক ডজি মন্তব্য করেন, "সার্বজনীন নীরবতায় এখন আবদুর রহমানের সর্বময় রাজকীয় ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা সজোরে বিঘোষিত হইল।"

খ্রিস্টানদের সঙ্গে সংঘর্ষ

৯৩২ সাল আবদুর রহমানের রাজত্ব কালের গৌরবময় সীমারেখা। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। এইবার বিদেশী শক্তির সঙ্গে লড়াই। ইহার মধ্যে লিয়োন রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান ও মিশরের ফাতেমীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষ সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

উত্তরাঞ্চলের খ্রিস্টান বাসক জাতি, আরাগন ও ক্যাষ্টাইলবাসীরা সর্বদা মুসলিম সীমান্তে নানা প্রকার উপদ্রব ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিত সময় সময় তাহারা হত্যা, লুণ্ঠন ধ্বংসযজ্ঞও চালাইত। ফলে স্পেনের মুসলিম শাসনের পক্ষে তাহারা ছিল একটি চ্যালেঞ্জ। তাহাদের বিরুদ্ধে আবদুর রহমান যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ৯১৬ ও ৯১৭ সালে আহমদ বিন আবি আবদাহর নেতৃত্বে আবদুর রহমান উপর্যুপরি দুইটি অভিযান প্রেরণ করেন। উত্তরের খ্রিস্টানগণদিগকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য। লিয়োন অধিপতি অরডনো (২য়) সর্বশক্তি লইয়া ক্যাষ্ট মোরোজ দুর্গ রক্ষার্থে অগ্রসর হন। মুসলিম সেনাপতি খ্রিস্টান বাহিনীর সঙ্গে মোকাবেলা করিয়া বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। শুধু তাহাই নহে, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সেনাপতি নিহত হন এবং অরডনো ও স্যাংকো তুদেলা, নাজেরা এবং ভলে ডিয়েরায়

ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। তাহাদের ধ্বংসাত্মক অভিযানে তালিভিরার মসজিদটিও পর্যন্ত ভস্মীভূত হয়। এহেন দুঃখজনক সংবাদে আবদুর রহমান অত্যন্ত অভিভূত হন। তিনি ৯১৮ সালে হাজিব বদরকে এক শক্তিশালী বাহিনী দিয়া খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বদর খ্রিস্টান লুণ্ঠনকারীদিগকে প্রতিহত করেন। ৯২০ সালে আবদুর রহমান ব্যাপক অভিযানকল্পে নিজেই খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে গমন করেন। তাঁহার আগমনবার্তায় খ্রিস্টানগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। অতঃপর তাহারা সম্মুখ সমরের ঝুঁকি না লইয়া পিছনে হটিতে শুরু করে। আবদুর রহমান ক্ষিপ্রতার সহিত ছোটখাটো দুর্গ ও শহর দখল করিয়া দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত ওসমা ও এসর্টিভান দুর্গটিও হস্তগত করেন। আবদুর রহমান ন্যাভারি নেতা স্যাংকোকে কয়েকবার পরাজিত করিয়া বিতাড়িত করেন। কিন্তু বিতাড়িত স্যাংকো, অরডনো এবং অন্যান্য খ্রিস্টান প্রধানদের দ্বারা সংযুক্ত কমাণ্ড আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এইবার খ্রিস্টানগণ বিপুল উৎসাহে মুসলমানদিগকে পরাজিত করিবার জন্য দানকুবাস সমতলভূমিতে উপস্থিত হয়। যুদ্ধ বিগ্রহে তিন মাস অতিবাহিত করিয়া আবদুর রহমান বিজয়ীবেশে রাজধানী কর্দোবাতে প্রত্যাবর্তন করেন। খ্রিস্টানগণ পরাজিত স্যাংকো ও অরডনোর নেতৃত্বে পুনরায় নাজিরা ও ভিগরা দখল করিয়া লুঠতরাজ চালাইতে থাকে। তাহাদের হস্তে বহুলোক নিহত হয় এবং অনেক শিশু ও মহিলাকে তাহারা বন্দী করিয়া লইয়া যায়। আবদুর রহমান আবার তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। বাস্ক ও লিয়োনীদের সমুচিত শিক্ষা দিয়া ন্যাভারি রাজধানী প্যাম্পপ্লোনা পর্যন্ত অগ্রসর হন। তাহাদের বহু দুর্গ আবদুর রহমানের হস্তগত হয়। সমগ্র ন্যাভারী রাজ্য পদানত করিয়া তিনি তাঁহার ক্ষমতাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তোলেন। এই নিরংকুশ বিজয় লাভ করিয়া ৯২৯ সালে আবদুর রহমান আমিরুল মুমিনীন ও আন-নাসির লি-দীন ইল্লাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া নিজেকে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করেন। স্পেনের ইতিহাসে এইজন্য ৯২৯ সাল বিশেষ বিখ্যাত। কারণ স্পেনের মুসলিম শাসকগণ পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিয়াও আমির উপাধিতে সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহারা খলিফা উপধি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই যেহেতু পবিত্র মক্কা ও মদীনা নগরীদ্বয় তাঁহাদের শাসনবহির্ভূত ছিল। আবদুর রহমান ঐ নগরীদ্বয় যদিও দখল করেন নাই তথাপিও ফাতেমীয় খলিফাদিগকেও আবদুর রহমান কোন গুরুত্ব দেন নাই এবং তাঁহাদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে তিনি মনে করিতেন। তাহা ছাড়া তখন আব্বাসীয় খলিফাগণ অত্যন্ত দুর্বল ও অন্যদের হাতের পুতুলে পরিণত হন। তাই তিনি ক্ষমতাশালী খলিফা খেতাব দুর্বলগণের হাতে না রাখিয়া নিজেই গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন।

৯২৪ সালে অরডনোর (২য়) মৃত্যু ঘটে এবং তাহার পর চলে লিয়োনে গৃহযুদ্ধ। ৯৩১ সালে আল ফান্সোর (৪র্থ) ভ্রাতা রামিরো (২য়) লিয়োনের ক্ষমতা দখল করিয়া আপন উদ্যমশীলতা ও রণনৈপুন্যের পরিচয় দিতে থাকেন। তিনি এইবার খলিফার সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবার উদ্যোগী হন। খ্রিস্টান জগত ও সারাগোসায় খলিফা বিরোধী মুসলমানদের দ্বারা একটি শক্তিশালী লীগ তৈয়ার হয়। কিন্তু আবদুর রহমান এই যৌথ সামরিক জোটে ভীত হওয়ার পাত্র ছিলেন না। তিনিও এক শক্তিশালী বাহিনী লইয়া ৯৩৭ সালে সারাগোসায় উপস্থিত হন। অতি সহজেই বিদ্রোহী মুহাম্মদ বিন হাশিম পরাজিত হয় এবং খলিফার নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়া পূর্ণ আনুগত্য সহকারে সারাগোসায় পুনরায়

গভর্ণর নিযুক্ত হন। এইবার তিনি ন্যাভারি অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার আগমন বার্তায় এমন ভীষণ সন্ত্রাস ছড়াইয়া পড়ে যে, চতুর্দিকে কেবল খলিফা নাম উচ্চারিত হইতে থাকে। রাণী থিয়োডা (স্যাংকোর বিধবা পত্নী) পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করিয়া খলিফার আনুগত্য স্বীকার করেন এবং আবদুর রহমানকে ন্যাভারিরও খলিফা বলিয়া স্বীকার করেন। একমাত্র লিয়োন ও কাতালোনিয়া ব্যতীত সমগ্র স্পেন আবদুর রহমানের শাসনাধীনে চলিয়া আসে।

৯৩৮-৩৯ সালে গ্যালিসীয় ও বাস্‌কগণ খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। খলিফা ১ লক্ষ শ্লাভ আরব সৈন্য লইয়া তাহাদের মোকাবেলা করিবার জন্য জামোরা অবরোধ করেন। খলিফার সৈন্যদলে চরম অসন্তোষ বিরাজ করিতে থাকে। কারণ নাজদাহ নামক শ্লাভ খলিফার সৈন্যের সেনাধ্যক্ষ হওয়াতে আরবগণ অসন্তুষ্ট হয়। কারণ শ্লাভ তাহাদের নেতা হইবে এইটা তাহাদের আভিজাত্যের অবমাননা ছিল। তাই বিশাল সৈন্যের বহর থাকা সত্ত্বেও আরবদের যুদ্ধে অনীহা ও পশ্চাদপসারণের জন্য খলিফা মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হন। জামোরা কয়েকটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল এবং অভ্যন্তরে প্রাচীরপার্শ্বে প্রশস্ত পরিখা ছিল। মুসলিম সৈন্যগণ পরিখা পর্যন্ত অগ্রসর হইলে সম্মিলিত বাসক ও গ্যালেসীয় সৈন্যদের তীব্র আক্রমণ প্রতিহত করিতে হয়। যুদ্ধের মহাসংকট মুহূর্তে আরবগণ শ্লাভদের দলত্যাগ করে। এই সুযোগ লিয়োনীরা শ্লাভদের উপর চতুর্দিক হইতে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং পাইকারীভাবে হত্যা করিতে থাকে। তবুও শ্লাভরা বীরবিক্রমে পরিখা অতিক্রম করে। এই যুদ্ধ তরমিস নদীর তীরে আল খন্দক গ্রামের সন্নিকটে সংঘটিত হয়। যুদ্ধে খলিফার বহু সৈন্য নিহত হয়। লেনপুল সাহেবের বর্ণনায় ৫০,০০০ মুর এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে এবং খলিফা মাত্র ৫০ জন অশ্বারোহী লইয়া কোনক্রমে প্রাণরক্ষা করেন। এই যুদ্ধের পর খ্রিস্টানগণ গৃহযুদ্ধের জন্য আর বড় রকমের কোন অভিযান চালাইতে পারে নাই। ৯৪০ সালে বাদাজোজের গভর্ণর আহমদ বিন ই'য়ালা লিয়োনীদের একটা আক্রমণ প্রতিহত করেন। অতঃপর ৯৪৪ সাল হইতে ৯৫৫ সাল পর্যন্ত মুসলিম খ্রিস্টান সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। ৯৫৫ সালে খলিফা তাঁহার বৈদেশিক নীতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করিয়া খ্রিস্টানদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন।

অরডনোর (৩য়) মৃত্যুর পর স্যাংকো তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া খলিফার সঙ্গে ইতিপূর্বে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি বাতিল ঘোষণা করেন। খলিফা এই অপরিণামদর্শী রাজাকে বিশেষ শিক্ষা দেওয়ার মানসে ৯৫৭ সালে তলেদোর গভর্ণর আহম্মদ বিন ইয়ালোকে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে লিয়োনীরা পরাজিত হয়। এবং তাঁহারা ক্যাষ্টাইল অধিপতি গণজালেজ-এর সহায়তায় স্যাংকোকে বিতাড়িত করিয়া অরডনোকে (৪র্থ) সিংহাসনে বসায়। স্যাংকো নিরুপায় হইয়া ন্যাভারিতে তাঁহার পিতামহী রাণী থিয়োডার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখান হইতে তিনি রাজসিংহাসন উদ্ধারের জন্য নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। স্যাংকো খুবই মেদবহুলদেহধারী ছিলেন। এত অস্বাভাবিক স্থূলকায় ছিলেন যেন অপরের সাহায্য ব্যতীত চলাফেরা করিতে পারিতেন না। এই সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে কর্দোবা ছিল ইউরোপের বাতিঘর। তাই তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন কর্দোবার ডাক্তার দ্বারা তিনি চিকিৎসা করাইবেন। অগত্যা রাণীমাতা থিয়োডা খলিফাকে এই মর্মে অনুরোধ জানাইলেন

যে তাঁহার জন্য যেন কর্দোবার একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার প্রেরণ করা হয়। আবদুর রহমান অত্যন্ত বিচক্ষণ ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন খলিফা ছিলেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও ডাক্তার দ্বারা রোগ নিরাময়—এই যুগপৎ প্রয়োজনে তিনি দরবারের বিশিষ্ট ইহুদী ডাক্তার হাসদাইকে প্রেরণ করেন। হাসদাই যথাসময়ে স্যাংকোর সকাশে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, তিনি তাঁহার চিকিৎসায় রোগমুক্ত হইবেন ইহা নিশ্চিত, তবে ইহার প্রতিদানস্বরূপ খলিফাকে কয়েকটি দুর্গ অর্পণ করিতে হইবে এবং তাঁহাকে ও রাণীমাতা থিয়োডাকে খলিফার দরবারে যাইতে হইবে। অগত্যা রাণীমাতা তাঁহার এক পুত্র ও পৌত্র স্যাংকোসহ খলিফার দরবারে উপস্থিত হইলেন। খলিফা তাঁহাদিগকে রাজকীয় সম্মানে অভ্যর্থনা করেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসক হাসদাই স্যাংকোকে চিকিৎসা করিতে থাকেন এবং ধীরে ধীরে স্যাংকোর মেদ হ্রাস পাইতে থাকে এবং শীঘ্রই তিনি সুস্থ হইয়া উঠেন। রাণীমাতা খলিফার সৌজন্যে তাঁহাকে দশটি দুর্গ অর্পণ করেন এবং খলিফাকে অনুরোধ জানান যে, খলিফার সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় স্যাংকো যাহাতে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারেন তাঁহার ব্যবস্থা যেন তিনি করেন।

৯৬০ সালে খলিফার বাহিনীর সাহায্যে স্যাংকো অরডনোকে (৪র্থ) পরাজিত করেন। অরডনো পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন এবং স্যাংকো লিয়োন, গ্যালিসির ন্যাভারিতে আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তাঁহাকে যথারীতি খলিফার আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়।

এইভাবে আবদুর রহমানের (৩য়) রাজনৈতিক সাফল্যের এক উজ্জ্বলময় অধ্যায়ের সূচনা হইল। এতদিন যে খ্রিস্টান শক্তি সর্বদা মুসলিম শাসনকে গ্রাস করিবার জন্য তৎপর ছিল তাহা এখন শক্তিহীন হইয়া মুসলিম প্রাধান্য স্বীকার করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব কোন প্রকারে টিকাইয়া রাখিল। উমাইয়াগণ পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী হইয়া শান্তিপ্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিল। আবদুল্লাহর সময়ে যে রাজধানী বিদ্রোহীদের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিত তাহা তখন শুধু বিদ্রোহমুক্ত নহে বরং ইহার শাসন বহুদূর বিস্তৃত। আবদুল্লাহর শাসন কর্দোবার ক্ষুদ্র সীমারেখায় সীমিত ছিল। কিন্তু তাহা এখন তারাগোনা হইতে আটলান্টিক তীরভূমি এবং এবরো নদ হইতে জিব্রাল্টার প্রণালী পর্যন্ত বর্ধিত। শুধু রাজ্যের সীমানা বর্ধনে নহে বরং সাম্রাজ্যের সর্বাবস্থার উন্নতিবিধানে আবদুর রহমানের কৃতিত্ব অপরিসীম।

ফাতেমীয়দের সঙ্গে সংঘাত

ফাতেমীয় খলিফা উবাইদুল্লাহ আল মেহদী শিয়া মতবাদ ও তাঁহার রাজনৈতিক প্রভাব সুদূর স্পেনে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালান। তিনি বোবাষ্ট্র দস্যু সরদার ওমর বিন হাফসুনের সঙ্গে গোপন আতাঁত করেন। তিনি স্পেনে গুপ্তচর ও শিয়া প্রচারকদিগকে প্রেরণ করেন। তাহারা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রচারকার্যে লিপ্ত থাকে। মাহদীর মতবাদ স্পেনে প্রচারের জন্য অনুকূল ক্ষেত্র ছিল। কারণ সেখানে দর্শনের মুক্ত চিন্তাধারার বহু লোক ছিলেন। তাহাদের মধ্যে কর্দোবার ইবনে মাসারাহ্ অন্যতম। অচিরেই এই নূতন মতবাদ স্পেনে বেশ প্রসারলাভ করিতে থাকে। প্রখ্যাত ভূগোলবিদ ইবনে হাওকল এই মতবাদ সমর্থন করেন। সেভিলের বনু ইছাহাক নেতা আহমদও এই দলে যোগদান করেন। তবে যখন

এই সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়ে যে তিনি শিয়া মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন তখন তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয় এবং পরে দেশদ্রোহিতার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

উবাইদুল্লাহ আল মেহ্দী ধীরে ধীরে তাঁহার শক্তি আফ্রিকাতে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করেন এবং স্পেনীয় উপকূলেও তাঁহার প্রভাব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। খলিফা আবদুর রহমান এইবার ফাতেমীয় শক্তির দিকে দৃষ্টি দিলেন। তিনি দক্ষিণ সীমান্তের ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলবর্তী দুর্গগুলিকে সুরক্ষিত করেন এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে পূর্বাপেক্ষা শক্তিশালী করেন।

জিব্রাল্টার অপর পাড়ে সিউটা দখল করিয়া সেখানে শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি তৈয়ার করেন। উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায় তিনি তাহার প্রভাব কায়েম করিতে সক্ষম হন। বার্বারদের সহায়তায় আলজেরিয়া ও ওরানে উমাইয়া শক্তি সুদৃঢ় করেন। ইহার পার্শ্ববর্তী ফাতেমী বিরোধী আরব গোত্রগুলিও আবদুর রহমানের বশ্যতা স্বীকার করে মাসরাহ গোত্রপতির সাহায্যে তিনি তাহিরাত ব্যতীত সমগ্র মৌরিতা নিয়া দখল করেন। ফাতেমীয় দুর্বল খলিফা আল কায়িমের সময় খলিফা আবদুর রহমান এই বিস্তৃর্ণ অঞ্চল দখল করেন। কিন্তু চর্তুথ ফাতেমী খলিফা আল মুইজ (৯৫২-৯৭৫) ক্ষমতায় আসিবার পর আফ্রিকার উমাইয়া অধিকৃত অঞ্চলের ভাগ্য নূতনভাবে পরিবর্তিত হয়। তিনি যেমন ছিলেন যোগ্য, সুদক্ষ ও সমরকুশলী তেমনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী। তিনি তাঁহার সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার সাহায্যে আফ্রিকা হইতে উমাইয়া শাসন উচ্ছেদ করেন। এই সময়টি আল মুইজের জন্য খুবই অনুকূল ছিল কারণ আবদুর রহমান এই সময়ে উত্তরে খ্রিস্টানদের সঙ্গে ব্যাপৃত ছিলেন। যাহা হউক, ৯৫৫ সালে সিসিলির গভর্ণর মাহদিয়ার উদ্দেশ্যে খলিফা আল মুইজের নিকট একটি জাহাজ প্রেরণ করেন। এই জাহাজে স্পেন আক্রমণের পরিকল্পনা লইয়া দূত খলিফার নিকট গমন করিতেছিলেন। কিন্তু যাত্রাপথে আলেকজান্দ্রিয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরিত স্পেনীয় বাণিজ্য জাহাজ সিসিলীয় জাহাজটিকে আক্রমণ করিয়া বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ইহার প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে আল মুইজ সিসিলির গভর্ণর হাসান বিন আলিকে স্পেনীয় বন্দর লুণ্ঠনের জন্য নির্দেশ দেন। হাসান বিন আলি স্পেনীয় সমৃদ্ধশালী বন্দর আলমেরিয়া আক্রমণ করেন এবং বন্দরটি লুণ্ঠন করিয়া বহু ধনরত্ন লইয়া সিসিলিতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহারা বন্দরের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেন এবং কয়েকজন লোককেও বন্দী করেন। এই সময় আলেকজান্দ্রিয়া হইতে স্পেনীয় জাহাজটিও বিপুল সম্পদ লইয়া স্পেনের বন্দরে ফিরিয়া আসে। লুণ্ঠনকারীরা এই জাহাজটিও লুণ্ঠন করে। ফাতেমীয়দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবদুর রহমান নৌবাহিনী প্রধান গালিবকে প্রেরণ করেন, কিন্তু গালিব ফাতেমীয়দের সঙ্গে বিশেষ সফলতা অর্জন করিতে পারেন নাই। অতঃপর ৭০ খানা যুদ্ধজাহাজ দিয়া আহমদ বিন ই'য়ালাকে আফ্রিকার উপকূলীয় বন্দর আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি উত্তর আফ্রিকার কয়েকটি স্থান দখল করিয়া সুসা ও তাবারকাহ বিধ্বস্ত করেন। প্রকৃতপক্ষে এই অভিযানগুলি খলিফা আবদুর রহমানের জন্য কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিতে পারে নাই। পরস্পর বিবাদমান এই দুইজন শক্তিশালী নরপতি নিজেদের শক্তি পরীক্ষায় জাতীয় সংহতি বিনষ্ট করেন। ইউরোপ বিজয়ের জন্য নিজেদের শক্তিকে যৌথভাবে সম্মিলিত না করিয়া দুইজন প্রতাপশালী নরপতি একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া শক্তির অপচয় করেন।

তাঁহার কৃতিত্বের মূল্যায়ন

স্পেনের উমাইয়া শাসন কর্তাদের মধ্যে আবদুর রহমানের স্থান নিঃসন্দেহে সবার উর্ধ্বে। স্পেনের অভ্যন্তরে যখন গোলযোগ, বিশৃঙ্খলা আর গৃহযুদ্ধ বহির্দেশ হইতে মুসলমানদের জাতশত্রু খ্রিস্টানদের উপর্যুপরি আক্রমণ এবং আফ্রিকার ফাতেমীয়দের স্পেন গ্রাসের হুমকি, সেই জাতীয় সংকটময় মুহূর্তে আবদুর রহমানের সিংহাসনে আরোহণ। অসীম সাহসিকতা, অসাধারণ বীরত্ব, অপূর্ব তেজস্বিতা, অনন্য সাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দুর্লভ ন্যায়পরায়ণতা ও অনড় আত্মপ্রত্যয় লইয়া তিনি সমস্ত দুর্যোগের সার্থক মোকাবেলা করেন। তাঁহার চরিত্রের অপূর্ব গুণাবলীর দ্বারা তিনি জনগণের হৃদয় জয় করিতে সক্ষম হন। অভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতি করিয়া তিনি বহিঃশত্রুর রাজ্যগ্রাসী লালসা বাসনাকে তিরোহিত করিয়া দেন। লিয়োনবাসী ও ন্যাভারিগণ বাধ্য হইয়া নতজানু বেশে আবদুর রহমানের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে। কার্যতঃ তিনি ছিলেন তর্কাতীতভাবে ঘর ও বাহিরের আনুগত্য আদায়ের অধিকারী। তিনি তাঁহার প্রবর্তিত নীতির সাহায্যে স্পেনকে ভিতর ও বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। শুধু নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বিপদমুক্ত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। তিনি অতি দ্রুতগতিতে দেশকে উন্নতি, প্রগতি, সমৃদ্ধি ও শান্তির পথে পরিচালিত করেন। তাঁহার কর্মনিষ্ঠা, পরিশ্রম, উদ্যমশীলতায়, স্পেনে সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনে, শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষি, শিল্প বাণিজ্য ও স্থাপত্যশিল্পে এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করে। সমগ্র ইউরোপে এক মহা আলোড়ন সৃষ্টি হয়। মুসলিম রাজধানী কর্দোবা ইউরোপ নগরী রাণীর মর্যাদা লাভ করে। আবদুর রহমান বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন ; অতএব তাঁহার কৃতিত্ব সঠিকরূপে মূল্যায়ন সম্ভব নহে। তবে নিম্নে তাঁহার কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আলোচিত হইল।

সামরিক

আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমন ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষার জন্য তিনি সুনিয়ন্ত্রিতভাবে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। তাঁহার সুদক্ষ, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও উন্নত রণকৌশলে অভিজ্ঞ সৈন্যবাহিনী মাত্র ১৮ বৎসরের মধ্যে সমস্ত বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটাইয়া দেশে শান্তির পথ উন্মুক্ত করেন। তিনি নিজেই একজন অভিজ্ঞ সেনানায়ক ছিলেন এবং সৈন্যবাহিনী সংগঠনের প্রতিভাও ছিল তাঁহার অফুরন্ত। তাঁহার সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বার্বার, শ্লাভ, খ্রিস্টান, আরব, প্রভৃতি শ্রেণীর লোকের সমাবেশ ছিল। "আবদুর রহমান নিয়মিত সৈন্যসংখ্যা, ১,৫০,০০০-এ উন্নীত করেন এবং অনিয়মিত সৈন্য অসংখ্য ছিল। দেহরক্ষীর সংখ্যা ১২০০০ ছিল, তন্মধ্যে ৮০০০ আশ্বারোহী ছিল।[১] এই বিপুল সংখ্যক উন্নতমানের সৈন্য ইউরোপে আর কোথাও ছিল কিনা সন্দেহ।" এই বিশাল সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী তৎকালে পৃথিবীর মধ্যে সম্ভবতঃ সর্বোৎকৃষ্ট ছিল"[২] আবদুর রহমান সৈন্যবাহিনীর উল্লেখযোগ্য সংস্কার করেন। ইতিপূর্বে জুন্দ বা গোত্রীয় ব্যবস্থাপনায় সৈন্য-সংগৃহীত হইত। যুদ্ধে ও জরুরী অবস্থায় বিভিন্ন গোত্রপতিগণ স্ব স্ব সৈন্যদল লইয়া

১. S. M. Imamuddin—Arab Muslim Administration P —106
২. Dozy—Spanish Islam P—447

আমিরের পতাকাতলে সমবেত হইতেন। তবে অধিকাংশ সময়ে প্রয়োজনমাফিক উন্নতমানের সৈন্য পাওয়া যাইত না। তাছাড়া যেহেতু আমিরকে গোত্রপতিগণ সৈন্যবল দ্বারা সাহায্য করিতেন সেইহেতু তাঁহারা মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেন। তাহাতে রাজ্যের সংহতি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। আমিরগণও তাঁহাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পাইতেন না। তাহার ফলে তাঁহারা দেহরক্ষী বাহিনী গঠন করেন। সামন্ত প্রথায় সৈন্যসংগ্রহ ব্যবস্থা উচ্ছেদ করিয়া আবদুর রহমান একটি বলিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আর আভিজাত্যের মূলে এই ব্যবস্থা মরণাঘাতস্বরূপ ছিল। শুধু তাহাই নহে, আরবদের স্থলে তিনি ব্যাপকহারে বার্বার ও শ্লাভদিগকে সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ করেন। শ্লাভ বা ইসকালাবী সৈন্যগণ. খলিফার অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন। তাঁহারা মূলতঃ ক্রতীদাস ছিলেন। জার্মানগণ ক্রীতদাস হিসাবে তাঁহাদিগকে মুসলমানদের নিকট বিক্রি করেন। মুস-লমানদের সংস্পর্শে ও সাহচার্যে আসিয়া শ্লাভগণ পূর্ণ মানবাধিকার ভোগ করিবার সুযোগ পান। এইজন্য তাঁহারা মুসলমানদের খুবই ভক্ত ও অনুরক্ত হইয়া উঠেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রতিভাবান ছিলেন তাহাদিগকে প্রতিভার পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়া প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হয়। যাহা হউক ; শ্লাভগণ খলিফার সৈন্যবাহিনীতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। আবদুর রহমানের দৃঢ় ব্যক্তিত্বের নিকট সৈন্যবাহিনী সর্বদা বিনীতভাবে সজাগ ও সতর্ক থাকিত। এই সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনীকে যথাযোগ্য পরিচালনার মাধ্যমে তিনি তাঁহার সাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হন।

অর্থনৈতিক

রাজ্যে অশান্তি এবং গৃহযুদ্ধ ও বিদেশী শক্তির সঙ্গে অবিরত যুদ্ধের ফলে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। জনগণের নিরাপত্তা যেখানে নাই সেখানে অর্থনৈতিক কাঠামো গরিয়া উঠিতে পারে না। আবদুল্লাহর সুদীর্ঘ রাজত্বকালটি অতিবাহিত হইয়াছে যুদ্ধবিগ্রহে। কোন সময় দেখা গিয়াছে বিদ্রোহ দমনে রাজকীয় বাহিনী বহু ঘরবাড়ি, শস্যক্ষেত্র ও বাণিজ্যকেন্দ্র বিধ্বস্ত করিয়াছে। আবার দেখা গিয়াছে বিদ্রোহীগণ নগর শহর গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া ভীষণ সন্ত্রাস কায়েম করিয়া জনগণকে সন্ত্রস্ত করিয়াছে। ওমর বিন হাফসুন, বনু হাজ্জাজ, বনু খলদুন ও নরম্যানদের দ্বারা বিশেষভাবে এই সমস্ত ধ্বংসাত্মক কার্য পরিচালিত হইয়াছে। এমনি চরম অরাজকতার মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থার মারাত্মক পরিণতি নামিয়া আসে। কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রায় অচলাবস্থা বিরাজ করিতে থাকে। ফলে আয়ের উৎস রুদ্ধ হইয়া ব্যয়ের খতিয়ান বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এমনি অবস্থায় শাসনভার গ্রহণ করিলেও আবদুর রহমান মোটেই নিরাশ হন নাই। অল্পদিনের মধ্যেই দেশের পরিস্থিতি আয়ত্তে আনিয়া মৃতপ্রায় অর্থনৈতিক অবস্থার কেবল প্রাণ সঞ্চার করিলেন না, বরং ইহাকে সচ্ছলতায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিলেন। আবদুর রহমান ঐ মধ্যযুগেই বাজেটের মাধ্যমে স্বীয় পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করেন। তিনি জাতীয় আয়ের অর্থকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। এক অংশ রাজ্যের স্বাভাবিক ব্যয়ভার বহনের জন্য, অপর অংশ দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে ও জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য এবং অবশিষ্ট অংশ জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিতেন। এ অংশের পরিমাণ ছিল ৬২৩৫০০০ স্বর্ণমুদ্রা। এক পরিসংখ্যানে জানা যায় রাজকীয় তহবিল ৯১৫ সালে ২০ মিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রা মৌজুদ ছিল।

"একজন অর্থশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ভ্রমণকারী উল্লেখ করিয়াছেন যে, সেই যুগে দুইজন শ্রেষ্ঠ ধনশালী নরপতি ছিলেন ; তাঁহাদের মধ্যে একজন আবদুর রহমান ও অপরজন হইলেন মেসোপটেমিয়ার হামদানীয় সুলতান।"[১]

অর্থাৎ আবদুর রহমান শূন্য রাজকোষকে স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ করিয়া দেশের আর্থিক বুনিয়াদকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলেন।

যোগাযোগ

জনসাধারণের চলাচল এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার্থে আবদুর রহমান যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতিবিধান করেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব আরও অধিক ছিল সামরিক প্রয়োজনে। তিনি কেবল পুরাতন ক্ষতবিক্ষত সড়কগুলি সংস্কার করেন নাই বরং বহু নূতন রাজপথও তৈয়ার করেন। পথিক, বণিক ও সৈনিকদের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধানকল্পে প্রয়োজনীয় দূরত্বে রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করেন। ইহার ফলে বিভিন্ন স্তরের জনগণ জানমাল ও ইজ্জত লইয়া নিরাপদে রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গমন করিতে পারিত। জরুরী সংবাদ দ্রুত আদান প্রদানের নিমিত্ত যৌগিক পদ্ধতিতে অশ্বারোহী বার্তাবাহক নিযুক্ত থাকিত। শহর, নগর, বন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ জনপদে শান্তি শৃঙ্খলার নিশ্চয়তার জন্য Watch Tower তৈয়ার করা হইত। অতএব যোগাযোগ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতি বিধান করিয়া আবদুর রহমান জনগণের অশেষ কল্যাণসাধন করেন।

কৃষি

দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কৃষকগণ পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে কৃষিকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। উর্বর অনুর্বর ও পর্বতের ঢালু জমিতে কৃষকগণ চাষাবাদের মাধ্যমে ফল ও ফসল উৎপাদন করিতে শুরু করেন। স্পেনের অনুর্বর ভূমিগুলি যেন আবার তাহাদের উর্বরতা ফিরিয়া পায়। নদীনালা ও পার্বত্য ঝর্ণাধারা হইতে খাল কাটিয়া সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে পতিত ও আবাদী উভয় প্রকার জমিতে পূর্ণোদ্যমে চাষাবাদ শুরু হয়। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ফল, ফসল, ফুল ও পশুতে স্পেনের কৃষি ও চারণভূমিগুলি সতেজ হইয়া দেশের সুখ সমৃদ্ধি বর্ধন করিতে থাকে। সমস্ত কৃষিজাত পণ্যাদির বিপুল পরিমাণ উৎপাদনের ফলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়। পর্বতের ঢালু, জমি ও উপত্যকায় আঙ্গুর, আপেল নাশপাতি, আখরোট ও বাদামের চাষ করা হইত এবং ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। প্রসিদ্ধ ভূগোলবিদ ইবনে হাওকল বর্ণনা করেন যে, ফলমূলের মূল্য এত নিম্নে ছিল যে উহা মুদ্রায় নিরুপণ করা সম্ভব ছিল না। খাদ্যশস্য ও অন্যান্য দ্রব্যমূল্য সুলভ হওয়াতে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য অঞ্চল হইতে

---

১. Dozy—Spanish Islam P—445
মেসোপটেমিয়ার হামদানীয় বংশের (৯২৯-১০০৩) শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন সাইফুদ্দৌল্লাহ (৯৪৪-৯৬৭)। তিনি আলেপ্পোতে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া যুগের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী, ও গুণী ও মনীষীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

বিপুল সংখ্যক লোকজন স্পেনে আসিয়া বসবাস করিতে শুরু করে। এই সময়ে রাজধানী কর্দোবার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া পাঁচ লক্ষে উন্নীত হয়। আবদুর রহমানের রাজত্বকালে কৃষিব্যবস্থার উন্নতির ফলে স্পেনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যে ভরপুর হইয়া উঠে।

"তাঁহার উদার নীতি ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসনব্যবস্থায় কৃষি বিষয়ে যে অভূতপূর্ব উৎসাহ প্রদর্শন করা হইয়াছিল তাহাতে হাস্যময়ী শস্যক্ষেত্র, সুসমৃদ্ধ উদ্যানরাজি ও অপরিমেয় ফলসম্ভার ইহার সাক্ষ্য বহন করে। নলযোগে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং অতীব অনুর্বর ভূমিকে শস্যশালিনী করিতে পারে এইরূপ বৈজ্ঞানিক পানি সেচনের পন্থা পর্যটকদের বিস্ময়ের উদ্রেক করিত।"

শিল্প

কৃষির অগ্রগতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। বিভিন্ন ধরনের শিল্পকারখানা গড়িয়া উঠে কর্দোবা, সেভিল, আলমেরিয়া প্রভৃতি শহর বন্দরে। উন্নতমানের রেশমী ও পশমী জাত উৎপাদনের জন্য স্পেন সমগ্র ইউরোপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। এই বয়নশিল্প এত জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে একটি প্রদেশেই তিন হাজার গ্রামে রেশমশিল্পের জন্য গুটিপোকার চাষ হইত। একমাত্র রাজধানীতেই ১৩০০০ তাঁতশিল্প ছিল। পরবর্তীকালে সেভিল ও আলমেরিয়া বয়নশিল্পে কর্দোবার খ্যাতি ম্লান করিয়া দেয়। মুসলিম স্পেনে বয়নশিল্প চরম উন্নতি উৎকর্ষ সাধন করিয়া সারা বিশ্বের প্রশংসা অর্জন করে। ইহা ব্যতীত চামড়া, লৌহ, ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতুর কারখানাও স্পেনে গড়িয়া উঠে। সমরাস্ত্র বিশেষ করিয়া শিরস্ত্রাণ ও তলোয়ার তৈয়ারিতে স্পেন জগৎজোড়া খ্যাতিলাভ করে। লৌহকপাট ও বাতিনির্মাণেও স্পেনের সুনাম ছিল প্রচুর। চর্ম, স্বর্ণ, রৌপ্য' দস্তা ও বিভিন্ন রং এর মূল্যবান পাথরের নানা প্রকারের ব্যবহার্য দ্রব্য তৈয়ারিতে স্পেনের চর্মকার চর্মনির্মিত দ্রব্যাদি ও সিল্ক গালিচা ইউরোপের বাজারে একচেটিয়া সুনাম অর্জন করে। এখানে বিভিন্ন প্রকারের খনিজ পদার্থও বর্তমান ছিল।

বাণিজ্য

কৃষি, শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সাফল্যজনক অগ্রগতির ফলে স্পেনে বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। কৃষিজাত ও শিল্পজাত পণ্য আমদানী ও রপ্তানীর জন্য স্পেনীয় বণিকগণ জাহাজযোগে সমুদ্র পাড়ি দিতেন বিশ্বের অন্যান্য বাণিজ্য কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে। দামেস্কে ও বাগদাদে বাণিজ্য চলিত উটের কাফেলায়, কিন্তু স্পেনীয় উমাইয়াগণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করিয়া সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করেন। আবদুর রহমানের রাজত্বকালে প্রায় ১০০০ হাজার বাণিজ্য জাহাজ ছিল। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে দেশ-বিদেশের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদানের ব্যাপক সুযোগ ঘটে। ইহার ফলে আবদুর রহমানের সুখ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা রাষ্ট্রের আর্থিক উন্নতি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। আমদানী রপ্তানীর কর আদায় হইত প্রচুর পরিমাণে। "ব্যবসা-বাণিজ্যে এত ব্যাপক উন্নতি হইয়াছিল যে, কাষ্টম ইন্সপেক্টর জেনারেলের রিপোর্ট অনুযায়ী আমদানী ও

রপ্তানী শুল্ক জাতীয় আয়ের এক বিরাট অংশ পূরণ করিত।"[১] ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হওয়াতে জনগণের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রুচির অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দেয়। জনগণ সুন্দর পোষাক পরিধান করিয়া পদব্রজের পরিবর্তে যানবাহনে চলিতে শুরু করেন। অবশ্য স্থল পথে যানবাহন ছিল উষ্ট্র, অশ্ব ও খচ্চর। "কৃষকদের পরিহিত পোষাকের পারিপাট্য ও অশ্বারোহণের সার্বজনীন প্রথা, এমন কি দরিদ্রতম ব্যক্তিরও অশ্বারোহণের গমন, জনগণের সাধারণ সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করে।"[২]

শিক্ষা-সংস্কৃতি

এই সময়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা হয়। তিনি শিক্ষা ও শিক্ষিতজনকে উদারভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। রাজ্যের সর্বত্র বিদ্যালয় ও পাঠাগার স্থাপন করেন। রাজধানী কর্দোবাতেই ছিল সর্বোচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র কর্দোবা বিশ্ববিদ্যালয়। ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া হইতে অসংখ্য ছাত্র তীব্র জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেন এখানে। ইটালী, জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য এখানে সমবেত হইতেন বিদ্যার্থিগণ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য, গণিত, জ্যোর্তিবিদ্যা ও উদ্ভিদ বিদ্যা, ইতিহাস, দর্শন, চিকিৎসা, রসায়ন ও ফলিত বিজ্ঞানের শাখা - প্রশাখাগুলি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের দ্বারা উত্তমরূপে চর্চা হইত। উচ্চতর গবেষণাকার্য চলিত অভিজ্ঞ মনীষীদের দ্বারা। বিভিন্ন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের অপূর্ব সামবেশ ঘটায় কর্দোবাকে 'পণ্ডিতপ্রসু' নামে আখ্যায়িত করা হইত। খলিফা আবদুর রহমানের সময়ে বিখ্যাত পণ্ডিতবর্গের মধ্যে দার্শনিক ইবনে মাসারাহ (মৃ. ৯৩১), ঐতিহাসিক ইবনুল আহ-মর (মৃ. ৯৬৯), জোতির্বিদ আহমদ বিন নসর (মৃ. ৯৪৪) ও মাসলামাহ ইবনুল কাসিম (মৃ. ৯৬৪) এবং চিকিৎসক আরিব বিন সাঈদ ও ইয়াহয়া বিন ইসাহক অন্যতম। আবদুর রহমান ছিলেন একনিষ্ঠ জ্ঞানসেবক। জাতিধর্মনির্বিশেষে জ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিতেন। গ্রীক পণ্ডিত নিকোলাস ও ইহুদী চিকিৎসক হাসদাই তাঁহার দরবারকে অলংকৃত করেন। বিভিন্ন ভাষায় লিখিত মূল্যবান গ্রন্থগুলি আরবী ভাষায় অনুবাদ করাইয়া তিনি জ্ঞান ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করেন। খলিফার নিজের ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র জ্ঞানতাপস হাকামেরও (২য়) ব্যক্তিগত লাইব্রেরী ছিল। কর্দোবাতে পুস্তকের জন্য স্বতন্ত্র একটি বাজারই ছিল। কর্দোবার কেন্দ্রীয় কারাগারের পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ছিল অনুন্য ৬০০০০০। সকলের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত ছিল। প্রত্যেক ছোট-বড় শহরেই বিদ্যালয় এবং বড় শহরে এতিমখানা ছিল। কর্দোবার এতিমখানায় ৫০০ জন ছাত্র ছিল। ঐতিহাসিক মাককারী, ডজি, কনডে, লেনপুল, হিট্টি ও আমির আলী প্রত্যেকেই কর্দোবা বিশ্ববিদ্যালয়ে জগৎশ্রেষ্ঠ মনীষীদের অপূর্ব সমাবেশের ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় নিখুঁত চর্চার কথা প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। সত্যই আবদুর রহমানের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে কর্দোবা নগরী ইউরোপের বাতিঘররূপে খ্যাতিলাভ করে।

---

১. সৈয়দ আমির আলী–আরবজাতির ইতিহাস–শেখ রেয়াজুদ্দিন আহম্মদ কর্তৃক অনূদিত পৃঃ ৪৪২
২. ঐ

আজ-জাহ্‌রা প্রাসাদ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক খলিফা আবদুর রহমান স্থাপত্যশিল্পেও অমর কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন। আবদুর রহমান তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী আজ জাহ্‌রার অনুরোধে এই প্রাসাদ-নগরী নির্মাণ করেন এবং তাঁহারই নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হয় "আজ-জাহ্‌রা"। কর্দোবার পাঁচ মাইল উত্তরে Hill of Bride এর পাদদেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ক্রোড়ে এই সুরম্য প্রাসাদের অবস্থান। ৯৩৬ সালের নভেম্বরে এই প্রাসাদ নগরী নির্মাণের কাজ শুরু হয়। আবদুর রহমান সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া বার্ষিক আয়ের এক তৃতীয়াংশ প্রতি বৎসরে ব্যয় করিয়া ও ইহার চূড়ান্ত সমাপ্তি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। অবশ্য তাঁহার পুত্র আরও পনেরো বৎসর ব্যাপী নির্মাণ কার্য চালাইয়া তবে ইহার কাজ সুসম্পন্ন করেন। আবদুর রহমানের সময়ে এই সুরম্য প্রাসাদ নগরী নির্মাণ কার্যে দৈনিক ১০০০০ শ্রমিক পরিশ্রম করিত। গাঁথুনির জন্য প্রয়োজনীয় আকারে মসৃণ করা হইত প্রত্যহ ছয় হাজার মার্বেল প্রস্তর খণ্ড। নির্মাণ-সামগ্রী বহনের জন্য ব্যবহারিত হইত দৈনিক ১৫০০ শত ভার বাহী বস্তু। সুদূর আলজেরিয়া ও তারাগোনা হইতে সংগ্রহ করা হইত প্রস্তর খণ্ডগুলি। তাহা ছাড়া মূল্যবান দ্রব্য ও সরঞ্জামাদি কনস্টান্টিনোপ্‌ল, রোম, কার্থেজ, স্যাফেক্স, নারবোন ও র‍্যাটিকা প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী করা হইত।

কনস্টান্টিনোপ্‌ল সম্রাট খলিফার মৈত্রীর নিদর্শনস্বরূপ অন্যান্য উপঢৌকনের মধ্যে জাহ্‌রা প্রাসাদের জন্য অনেকগুলি সুরম্য স্তম্ভও প্রেরণ করেন। আজ-জাহ্‌রা প্রাসাদের নির্মাণ প্রদ্ধতি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ছিল। প্রাসাদের সুদৃশ্য কারুকার্যখচিত কাষ্ঠ ও লৌহনির্মিত এবং তাম্রমণ্ডিত কপাটের সংখ্যা ছিল ১৫০০০। এই প্রাসাদের দরবার কক্ষটি ছিল সর্বাপেক্ষা মনোরম। ইহার ছাদ ও প্রাচীর ছিল মার্বেল প্রস্তর ও স্বর্ণমণ্ডিত। মার্বেল ও স্ফটিক প্রস্তর নির্মিত স্তম্ভের উপর স্থাপিত ছিল বৃত্তাকারের গম্বুজটি। মণি, কাঞ্চন ও হীরামুক্তা দ্বারা অত্যাশ্চর্যরূপে শোভিত ছিল স্তম্ভ হইতে শুরু করিয়া গম্বুজ পর্যন্ত। হলঘরের মধ্যভাগে ছিল পারদের আচ্ছাদনে মার্বেলের চৌবাচ্চা। প্রতি দিকে আটটি করিয়া গজদন্ত ও আবলুস কাষ্ঠনির্মিত গবাক্ষ ছিল। সূর্যরশ্মি যখন এই গবাক্ষপথ দিয়া পারদ হ্রদে প্রতিফলিত হইত তখন এক অপূর্ব মনোমোহিনী দৃশ্যের সৃষ্টি হইত। এই দৃশ্য যেমন ছিল মনোহারিনী তেমনি বিস্ময়কর। বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলে নিখুঁত জ্যামিতিক পরিমাপে এই দরবারকক্ষ নির্মিত হইয়াছিল। একদিকে ছিল সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অপরদিকে ছিল অনুপম সৌন্দর্যমার্জিত রুচিসৃষ্টি। এক মাইল দীর্ঘ ও অর্ধ মাইল প্রস্থ লইয়া আয়তাকার এই বিশাল প্রাসাদ ভবনটি রাজকার্য নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধায় ভরপুর ছিল। কৃত্রিম ও স্বাভাবিক স্রোতস্বিনী ও ঝর্ণা, ফলফুলসম্ভারে পরিপূর্ণ মনোরম উদ্যান, কর্মচারী ও সৈন্যবাহিনীদের জন্য সুনিব্যস্ত বাসভবন দ্বারা প্রাসাদ নগরী সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত ছিল। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরাম-আয়েশের যাবতীয় উপকরণ এখানে মৌজুদ ছিল। অর্থাৎ কর্দোবা প্রাসাদের সঙ্গে সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতা করিয়া আজ-জাহ্‌রা প্রাসাদ নিজের শ্রেষ্ঠত্বের কথা প্রচার করিতে যেন সর্বাপেক্ষা প্রস্তুত ছিল। তবে রূপময় স্বপ্নপুরী আজ-জাহ্‌রা প্রাসাদ-নগরী আজ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়াইয়া গবেষণার খোরাক যোগাইতেছে।

আবদুর রহমান বিখ্যাত কর্দোবা জামে মসজিদের সৌন্দর্য বর্ধনে উত্তর আফ্রিকা হইতে সংগৃহীত শুভ্র মর্মর প্রস্তরে ১০৮ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি সুরম্য মিনার নির্মাণ করেন। এই মিনারটি চতুষ্কোণাকৃতি এবং ইহার ব্যাস ২৭ ফুট। মসজিদের তত্ত্বাবধানে আবুদর রহমানের গভীর আন্তরিকতা ছিল। প্রতি রাত্রিতে ১০,০০০ বাতি জ্বালানোর জন্য তিন শত খাদেম নিয়োজিত ছিল। ইহার দ্বারা মসজিদের বিশালতা ও গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুধাবন করা যায়। স্থাপত্যশিল্পে আবদুর রহমানের কৃতিত্ব সন্দেহাতীতভাবে প্রশংসনীয়।

ন্যায় বিচার

কেবলমাত্র রাজ্য জয় ও সংগঠনে আবদুর রহমানের খ্যাতি সীমাবদ্ধ ছিল না। বিচারকার্যে তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা ও বিচক্ষণতা সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আইনের চোখে সকলেই সমান এই বিধান তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়া যথার্থরূপে ইহা প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) ন্যায় তিনি পক্ষপাতশূন্য বিচার করিতেন। তাঁহার এক পুত্র বিদ্রোহের চেষ্টা করেন এবং তাঁহাকে ইহার জন্য মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়। অপরাধীর জন্য অপর এক ভ্রাতা ও ভাবী উত্তরাধিকারী অশ্রুপূর্ণ নয়নে পিতার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া মন্ত্রণাসভা কর্তৃক শাস্তি মওকুফ করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। বৃদ্ধ খলিফা বলিলেন, 'পিতা হিসাবে আমি সারাজীবন রক্তাশ্রুপাত করিতে থাকিব, কিন্তু রাজাজ্ঞা অবহেলা করিতে পারিব না। কারণ আমি পিতা তবে রাজাও বটে। এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলে রাজ্য খণ্ডবিখণ্ড হইবে।' প্রাণদণ্ড যথার্থরূপে কার্যকরী হইল। এই দৃষ্টান্ত হইতে সহজে অনুমিত হয় বিচারব্যবস্থায় খলিফা কেমন ন্যায় বিচারক ছিলেন।

বৈদেশিক নীতি

আবদুর রহমান স্বদেশে যেমন জনপ্রিয় ছিলেন বর্হিবিশ্বেও তেমনি খ্যাতি অর্জন করেন। বিচক্ষণ ও সুচতুর রাজনীতিবিদ হিসাবে তদানীন্তন বিশ্বে নরপতিদের মধ্যে তাঁহার স্থান ছিল প্রথম সারিতে। তাঁহার বলিষ্ঠ বৈদেশিক নীতির ফলে জনগণ পাইয়াছিল নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য জীবন প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয়। তিনি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণের পক্ষপাতী ছিলেন। তবে যে সকল দেশ তাঁহার দেশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটাইত তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর আঘাত হানিতেন। ন্যাভারিগণ ও লিয়োনবাসী স্পেন আক্রমণে অগ্রসর হইলে তিনি প্রতি আক্রমণে তাহাদের পর্যদুস্ত করেন। কর্দোবার প্রতি বৈরীভাব নিরসন করিয়া বন্ধুসুলভ আচরণ করিতে বাধ্য করেন। আবদুর রহমানের আমন্ত্রণে ন্যাভারি অধিপতি ও লিয়োন রাজ উভয়ই কর্দোবায় আগমন করেন এবং খলিফার প্রতি অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণ করেন। উভয় দেশের মধ্যকার দীর্ঘদিনের শত্রুতার অবসান ঘটে আবদুর রহমানের কূটনৈতিক দূরদর্শিতায়। ফাতেমীয়গণ যখন স্পেনের অখণ্ডতার প্রতি চ্যালেঞ্জ দিলেন তখন রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রয়োজনে তিনি স্বজাতির প্রতিও তরবারি উত্তোলন করিতে দ্বিধা করেন নাই। তাঁহার জীবনের বড় সাফল্য

তিনি বৈদেশিক রাষ্ট্রের সংগে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। ইউরোপের প্রখ্যাত রাষ্ট্রপতিগণ তাঁহার সংগে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। ইহার মধ্যে কনস্টান্টিনোপল সম্রাট, জার্মান সম্রাট, ফ্রান্স ও ইটালীর রাজাগণ উল্লেখযোগ্য। "৯৪৭ সালে কর্দোবা বহুদূতের সমাগমের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।"[১] এক কথায় তাঁহার শক্তি, প্রজ্ঞা ও প্রাচুর্য সমগ্র ইউরোপ ও আফ্রিকাব্যাপী বিস্তার লাভ করে।"[২] নিজ নামে স্বতন্ত্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলন ও খলিফা উপাধি গ্রহণের মাধ্যমে তিনি তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দী ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহার বৈদেশিক নীতির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। খ্রিস্টান ইউরোপে মুসলিম শাসন কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রাধান্য বিস্তার নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। আবদুর রহমানের শক্তির ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ এবং কূটনৈতিক কলাকৌশল অবলম্বন স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাসে এক অনন্য সাধারণ কীর্তি। এই ক্ষেত্রে তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ নরপতি মধ্যযুগে সত্যই বিরল ছিল। এই সূক্ষ্ম ও বিচক্ষণ ব্যক্তি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া ইহার সম্পদকে সঙ্গতিপূর্ণ করেন। মৈত্রী বন্ধনে বস্তুতঃ তিনি শক্তির ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার অপূর্ব সহিষ্ণুতায় ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণও তাঁহার পরিষদে স্থান পায়। তিনি ছিলেন মধ্যযুগীয় খলিফা অপেক্ষা আধুনিক যুগের রাষ্ট্রনায়কের দৃষ্টান্ত।"[৩]

চরিত্র

আবদুর রহমানের সমস্ত গৌরবের মূল কারণ ছিল তাঁহার বিভিন্নমুখী প্রতিভার অপূর্ব বিকাশ। তাঁহার ৪৯ বৎসর গৌরবময় রাজত্বের মধ্যে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমন, দেশে শান্তিশৃংখলা স্থাপন, বৈদেশিক শক্তির সংগে যুদ্ধ, সন্ধিস্থাপন, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে সম্প্রসারণ, শিক্ষা সংস্কৃতি ও স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষ সাধন প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে যে অভাবিত উন্নতি ও সমৃদ্ধি হইয়াছে তাহার মূলে ছিল আবদুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, অসীম সাহসিকতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, নিরলস পরিশ্রম। সত্যই তিনি যুগোপযোগী অপেক্ষা যুগ স্রষ্টা হিসাবে বেশি পরিচিত ছিলেন। প্রশাসনিক বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ ও সতর্ক, জনকল্যাণে তাঁহার মহানুভব হৃদয় ছিল প্রশস্ত এবং ন্যায়নীতি পরিচর্যায় তাঁহার স্থান ছিল অনেক উর্ধ্বে। জাতি ধর্ম বর্ণ ও বৈভব নির্বিশেষে সকলেই তাঁহার নিকট পাইত সুবিচার। নিজেও ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিপালনে যত্নশীল ছিলেন এবং পরধর্মের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট সহিষ্ণুতা ছিল। সকল ধর্মের অনুষ্ঠান প্রতিপালনে কেহ কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হইত না। অপূর্ব চারিত্রিক গুণাবলীর জন্য তাঁহার প্রতি সকলেই সহজে আকৃষ্ট হইত।

মৃত্যু

আবদুর রহমান জীবন সায়াহ্নের অবসর দিনগুলি অতিবাহিত করেন অতি সাধের প্রাসাদ আজ-জাহরায়। তিনি ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ কিন্তু জীবন সাফল্যে সমৃদ্ধ। তাই সুদৃশ

১. Syed Ameer Ali—History of Saracens P—510

২. Lane Pool Moors in Spain P—217

৩. Dozy Spanish Islam P—447

কারুকার্যখচিত সুরম্য হেরেমে অতিবাহিত করেন অবশিষ্ট দিনগুলি। কখনও তাঁহাকে দেখা গিয়াছে চিন্তাক্লিষ্টভাবে পায়চারি করিতেছেন মনোরম পুষ্প উদ্যানে, আবার কখনও দেখা গিয়াছে তিনি আনমনে নির্বিকারে তাকাইয়া আছেন সুদূর কর্দোবা জামে মসজিদের মিনার চূড়ায়। এত সচ্ছল ও সফল জীবনের অধিকারী হইয়াও তিনি কেমনভাবে ইহা উপভোগ করিয়াছেন তাহা অবশ্য কৌতূহলী ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয়। এই নরপতি তাঁহার দীর্ঘ জীবনের ঘটনাবলীর পর্যালোচনা করিতে গিয়া বলেন যে, তিনি মাত্র ১৪ দিন অবিমিশ্র সুখানুভূতির কথা স্মরণ করিতে পারেন।"[১] সুখ-দুঃখের স্মৃতিচারণে অতিবাহিত হইয়াছে তাঁহার শেষ দিনগুলি। তবে তাঁহার বিশাল কীর্তির যে ইতিহাস তাহা কেবল স্পেনীয় মুসলমানদের জন্য গর্বের বস্তু নহে, বরং তাহা সমস্ত বিশ্বের মুসলমানদের গর্ব ও গৌরবের কাহিনী। খলিফা আবদুর রহমান আন নাসির লি দ্বীনি ইল্লাহ ৯৬১ সালের ১৫ ই অক্টোবর মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রাণপ্রিয় খলিফার মৃত্যুতে শোকাতুর জনগণ অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁহার আত্মার উদ্দেশ্যে বলেন—আমাদের পিতা লোকান্তরে, তাঁহার তলোয়ার চূর্ণ তাহা ইসলামের তলোয়ার, দুর্বল ও দরিদ্রদের আশ্রয়স্থল এবং গর্বিতদের সন্ত্রাস ও আতংক।"[২]

---

১. সৈয়দ আমির আলী–আরব জাতির ইতিহাস রেয়াজুদ্দীন কর্তৃক অনূদিত পৃঃ-৪৪৩

২. A. J : Conde : Dominion of the Arabs in Spain P—458

দ্বাদশ অধ্যায়

হাকাম (দ্বিতীয়) (৯৬১-৭৬)

[**সার সংক্ষেপ ঃ** সূচনা ❑ হাকাম (২য়) ❑ খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে অভিযান ❑ ফাতেমীয়দের সহিত বিরোধ ❑ শিক্ষা ও সংস্কার ❑ গ্রন্থাগার ❑ চরিত্র ও মৃত্যু।]

খলিফা আবদুর রহমানের (৩য়) মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হাকাম ৪৬ বৎসর বয়সে খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি সিংহাসনে উপবেশন করিয়া আল মুসতানসির বিল্লাহ উপাধি গ্রহণ করেন। পিতার সুদীর্ঘ রাজত্বকালেই তাঁহার যৌবনোত্তর দিনগুলির অবসান হয়। তিনি ছিলেন যোগ্য, বুদ্ধিমান, ন্যায়পরায়ণ ও জ্ঞানতাপস খলিফা। ঐতিহাসিক মাসুদী তাঁহার মুরুজ উজ জাহাব গ্রন্থে খলিফা হাকামকে ন্যায়বিচার ও উত্তম গুণাবলীর জন্য যুগের শ্রেষ্ঠতম ও সম্মানিত ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত করেন। হাকাম তাঁহার পিতার নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী ও মন্ত্রীদিগকে স্বপদে বহাল রাখেন এবং জাফর আল-আসকালাবীকে প্রধানমন্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। যদিও তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পিতার ন্যায় পারদর্শিতা অর্জন করিতে পারেন নাই, তথাপিও সমরকুশলতায় অনভিজ্ঞ ছিলেন না।

খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে অভিযান

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে প্রতিবেশী খ্রিস্টান রাজ্যগুলি তাঁহার সহিত সদ্ভাব বজায় রাখিবে না। আবদুর রহমানের জীবদ্দশায় লিয়োনবাসী ও ন্যাভারিগণ শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু খলিফার মৃত্যুর পর একে একে তাহার সমস্ত চুক্তি ভঙ্গ করেন। স্যাংকো পূর্ব চুক্তি মাফিক নির্দিষ্ট সংখ্যক দুর্গগুলি হস্তান্তর করিতে অস্বীকার করেন। ন্যাভারিরাজ গারসিয়াও বন্দী ফারনান গণজালেজ বা ফার্ডিনাণ্ডকে হাকামের নিকট প্রত্যার্পণ করিবার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। অধিকন্তু উমাইয়া মিত্র অরডনোর (৪র্থ) স্ত্রী এবং ফার্ডিনাণ্ড তনয়াকে বাধ্য করেন স্বামী সম্পর্ক ছেদ করিতে। এই সমস্ত খ্রিস্টান প্রধানগণ মনে করিয়াছিলেন যে হাকাম একান্তভাবেই জ্ঞানানুশীলনে নিমগ্ন, অতএব সমরক্ষেত্রে তিনি আসিতে চাহিবেন না এবং আসিলেও কৃতকার্য হইতে পারিবেন না। ফলে তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব আকাঙ্ক্ষা উমাইয়া রাজ্য গ্রাস করার মোক্ষম সুযোগ পাইবেন। কিন্তু হাকাম যে সিংহশাবক খ্রিস্টানগণ সে সত্য উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

ক্যাষ্টাইলের কাউন্ট সর্বপ্রথম হাকামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। হাকাম স্বয়ং সেনাবাহিনী পরিচালনা করিয়া কাউন্টের সহিত মোকাবেলা করেন। স্বল্পকালীন সংঘর্ষেই কাউন্ট পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। এই যুদ্ধেই অকৃতজ্ঞ যুদ্ধোন্মাদ খ্রিস্টানগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে খলিফা পণ্ডিত হইলেও সমরনায়কও বটে এবং মসী ও অসি উভয়টি চালনায় সমপারদর্শী। খলিফা হাকাম বিজয়ীবেশে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলে দুষ্টমতি অরডনো (৪র্থ) কর্দোবাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য আসেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে খলিফা আবদুর রহমানের সাহায্যে স্যাংকো এই অরডনোকে পরাজিত এবং লিয়োন হইতে বিতাড়িত করেন। তাঁহাকে সম্মানের সহিত আজ-জাহ্‌রা প্রাসাদে খলিফা হাকামের সহিত সাক্ষাৎ দান করানো হয়। অরডনো স্যাংকোকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য রাজকীয় সাহায্য প্রার্থনা করেন। খলিফা সেনাধ্যক্ষ গালিবকে নির্দেশ প্রদান করেন এই মর্মে যে, অরডনো ও খলিফার সঙ্গে সদ্ভাব কায়েম রাখিবেন এবং স্বীয় পুত্র গারসিয়াকে কর্দোবাতে জামিনস্বরূপ প্রেরণ করিবেন ও বিদ্রোহী গণজালেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করিবেন এই মর্মে খলিফাকে প্রতিশ্রুতি দেন। দেশের জনগণের বিরাগভাজন হওয়ায় স্যাংকোর অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। উপরন্তু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী খলিফার সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় তিনি আরও শংকিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন। অগত্যা স্যাংকো খলিফার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করেন এবং পূর্ব স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক দুর্গ হস্তান্তরে স্বীকৃত হন। এই ঘটনার কয়েক মাস পর অরডনোর মৃত্যু ঘটে। এইবার সুযোগসন্ধানী ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী স্যাংকো খলিফার সঙ্গে সরাসরি পূর্ব চুক্তি ভঙ্গ করেন।

৯৬২ সালে খলিফা আবার খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সেনাপতি গালিব প্রথমে ক্যাষ্টাইলের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া সান এসর্টিভান দুর্গটি অধিকার করেন। সারাগোসার গভর্ণর ইহাহয়া বিন মুহম্মদ তুজুবীও সৈন্যবাহিনী লইয়া গালিবের সঙ্গে মিলিত হন। এই সম্মিলিত বাহিনী বাস্‌কদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় এবং ন্যাভারি প্রধান গারসিয়াকে পরাজিত করে। এই অভিযানের ফলে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ শহর অধিকৃত হয়। ইহাদের মধ্যে কালাহোরাই উল্লেখযোগ্য। ইবনে খলদুন কালোহোরা বিজয়কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করেন। ৯৬৬ সালের মধ্যে, গণজালেজ, গারসিয়া ও স্যাংকো সকলেই পরাভূত হইয়া খলিফার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কাউন্ট বোরেল ও মিরণও তাঁহাদের পথ অনুসরণ করেন। শুধু তাহাই নহে মুসলিম সীমান্তে তাঁহাদের নির্মিত সমস্ত দুর্গ ও প্রহরাস্তম্ভগুলি ধ্বংস করিবার জন্য খলিফার নিকট ওয়াদাবদ্ধ হন। তাঁহারা এতদূর অগ্রসর হন যে খলিফাকে এই বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন যে ভবিষ্যতে অন্যান্য খ্রিস্টান প্রধানগণ যদি তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন তবে তাঁহারা তাঁহাদের সাহায্য করিবেন না। এইভাবে হাকাম অত্যন্ত সফলতার সহিত উত্তরের খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটান এবং খ্রিস্টান প্রধানদিগকে বশীভূত করিতে সক্ষম হন। ইহার পরে ৯৬৬ সালে স্যাংকো পুনরায় খলিফার সহিত গোলযোগ বাধাইবার চেষ্টা করিলে তিনি তাঁহার স্বাজাতির হাতে বিষপ্রয়োগে নিহত হন। অতঃপর হাকামের আর খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে মোকাবেলার জঞ্জাট পোহাইতে হয় নাই।

ফাতেমীয়দের সহিত বিরোধ

এই সময়ে ফাতেমীয় খলিফা আল মুইজ বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হইয়া সমস্ত মুসলিম জনপদের উপর তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালান। আবদুর রহমানের সময় হইতে স্পেনে ফাতেমীয় মতবাদের অনুপ্রবেশ ঘটে। খলিফা হাকামের সময় এই মতবাদ আরও প্রসারলাভ করে। জনগণ, সরকারী কর্মচারী ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও এই মতবাদ ছড়াইয়া পড়ে। তবে উত্তর আফ্রিকা হইতে কায়রোতে রাজধানী স্থানান্তরের ফলে স্পেনে এই মতবাদ প্রচারে কিছুটা ভাঁটা পড়ে। আফ্রিকায় ফাতেমীয় সমর্থক সানহাজাগণ উমাইয়া সমর্থক ক্ষুদ্র ইদ্রিসীয় শক্তিকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের সমর্থন কর্দোবা হইতে ফিরাইয়া কায়রোমুখী করেন। খলিফা হাকামের করদরাজ্যগুলি ধীরে ধীরে তাঁহার হাতছাড়া হইয়া যায় তিনি মাগরিবুল আকসায় (মৌরিতানিয়া) অভিযান বন্ধ করিবার জন্য ৯৭২ সালে সেনাপতি গালিবকে প্রেরণ করেন। সেনাপতি গালিব আফ্রিকায় উমাইয়াদের প্রধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন। জেনাতা, মাগরাবা ও মিকনসার বার্বারগোষ্ঠীসমূহ কায়রোর প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করে। আলী বংশীয় বহু রাজকুমার বহুকাল ফেজ নগরে বসতিস্থাপন করিবার পর স্পেনে চলিয়া আসেন। আল মাগরিপুল আকসা ও আওসাতে খলিফা হাকামের প্রধান্য কায়েম করিয়া বিজয়ীবেশে সেনাপতি গালিব কার্দোবায় প্রত্যাবর্তন করেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

খলিফা হাকাম সমরাঙ্গন অপেক্ষা শিক্ষাঙ্গনে বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান জ্ঞানানুরাগী। নিজে ছিলেন পণ্ডিত এবং শিক্ষা ও শিক্ষিতজনকে লালন করিতেন অত্যন্ত উদার মনোভাব লইয়া। কাজকর্ম মুহাম্মদ বিন আমিরের হস্তে ন্যস্ত করিয়া তিনি শিক্ষার উন্নতির জন্য গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। শিক্ষা বিস্তারে তাঁহার দান, সাহায্য ও সহযোগিতা ছিল অপরিসীম। খলিফা হাকামের দেহমন শিক্ষার উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য ছিল একান্তভাবে নিবেদিত। ঐতিহাসিক ইবনে খলদুন বলেন, 'হাকাম সাহিত্য ও বিজ্ঞান ভালবাসিতেন এবং বিদ্বান ও জ্ঞানীদিগকে যথাযথ সম্মান করিতেন।' জোসেফ ম্যাকভ বলেন— 'হাকাম আন্দালুসীয় সভ্যতার পরিপূর্ণতা আনয়ন করিয়া কর্দোবা নগরীকে ইউরোপের বুকে একটি বাতিঘরে পরিণত করেন।'

জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোয় দেশের প্রতিটি অঞ্চল আলোকিত করিবার জন্য তিনি একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্টি করেন। যদিও তিনি এই বিভাগের মহাপরিচালক ছিলেন, তথাপি তদীয় ভ্রাতা মুনজিরকে তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব অর্পণ করেন। সমগ্র স্পেনে এমন কোন শহর ছিল না যেখানে কোন বিদ্যালয় ছিল না। ইহা ব্যতীত উচ্চশিক্ষার জন্য প্রতিটি বড় শহরে যেমন সেভিল, মালাগা, সারাগোসা, তলেদো ও জায়েনে কর্দোবার শিক্ষানিকেতনের অনুরূপ শিক্ষাক্ষেত্র ছিল। সর্বোপরি কর্দোবাতে শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি হয় অতুলনীয়ভাবে। তাঁহার সময়ে কর্দোবা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়াতে রূপকথার ন্যায় বিস্তারলাভ করে। কায়রোর আল্ আজহার ও বাগদাদের নিযামিয়া তাঁহার খ্যাতির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ; কর্দোবা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত, জ্যোতিষ, ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান সম্পর্কে

যে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হইত তাহাতে অংশগ্রহণ ও শ্রবণের জন্য ইটালী, জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে জ্ঞানপিপাসু বিদ্যার্থিগণ সমবেত হইতেন। কারণ এত গভীর গবেষণাপূর্ণ উচ্চশাস্ত্রের আলোচনা তৎকালে আর কোথাও হয় না। আবদুর রহমানের দিগ্বিজয়ী অসি সমগ্র ইউরোপে আলোড়ন সৃষ্টি করে আর তৎপুত্র হাকামের মসি আলোর প্রবাহ সৃষ্টি করিয়া তমাসাবৃত ইউরোপে নবযুগের সূচনা করে।

পণ্ডিতপ্রসূ কর্দোবা নগরীর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পণ্ডিত ও মনীষীদের সাধনা ও গবেষণাগারে পরিণত হয়। তাঁহারা সৃজনশীল প্রতিভার ফসলে সমৃদ্ধ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি জ্ঞানশাখাকে। এই সমস্ত মনীষীর যোগ্যতার স্বীকৃতি দানে খলিফা কোন সময় কার্পণ্য করে নাই। তাঁহাদের বেতন, উপঢৌকন ও উৎসাহ ব্যঞ্জক ভাতার জন্য পৃথক সম্পদ ও সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে বরাদ্দ করেন। কর্দোবা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রখ্যাত পণ্ডিতদের মধ্যে বৈয়াকরণিক আবু আলী আল কুতাইবাহ, ভাষা, কবিতা ও উপাখ্যানবিদ আবু আলী আল কূলী, চিকিৎসক আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল উজরী, প্রখ্যাত বিদ্বান ও আরবী অভিধান কিতাবুল আইন প্রণেতা মুহাম্মদ আবু বরক আল জুবাইদী, বিখ্যাত ফকিহ আবু ইব্রাহিম ও স্বনামধন্য হাদীস ও আইনশাস্ত্রবিদ আবু বকর বিন মাবিয়া অন্যতম। তাহা ছাড়াও বহু লেখক ও অধ্যাপক কর্দোবা বিশ্ববিদ্যালয় ও খলিফার দরবার অলংকৃত করেন। জনসাধারণের জন্য শিক্ষার সুযোগ অবাধ ও সুলভ ছিল। রাজ্যে অসংখ্য অবৈতনিক বিদ্যালয় ছিল। একমাত্র কর্দোবা নগরীতে ২৭টি অবৈতনিক বিদ্যালয় ছিল। শিক্ষার জন্য তিনি সর্বপ্রকারে জনসাধারণকে উ ৎসাহিত করেন। "এই সময় স্পেনের প্রায় সকলে লিখিতে ও পড়িতে পারিত অথচ কয়েকজন ধর্মযাজক বংশোদ্ভূত সম্ভ্রান্ত লোক ছাড়া খ্রিস্টান ইউরোপ নিরক্ষরতায় নিপতিত ছিল।"[১]

গ্রন্থাগার

পুস্তক সংগ্রহ ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় খলিফা হাকামের নিষ্ঠা ছিল অপরিসীম। পিতার জীবদ্দশায় তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতার জন্য পৃথক পৃথক গ্রন্থাগার ছিল। জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ ও পুস্তক সংগ্রহের প্রতি তাঁহার আগ্রহ ছিল প্রবল। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর আর্থিক সচ্ছলতা ও স্বাধীনতা সেই আগ্রহ দুর্বার প্রবাহ সৃষ্টি করে। দেশ-বিদেশ হইতে বহু অর্থব্যয়ে দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য বেতনভুক্ত অভিজ্ঞ সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন। তাঁহার একনিষ্ঠ পুস্তক সংগ্রাহক ফাতিমা সুদূর দামেস্ক, বাগদাদ, কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া হইতে প্রাচীন, মধ্যযুগীয় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল্যবান পুস্তকাদি সংগ্রহ করেন। খলিফার বইকেনা নেশা এতদূরে পৌঁছায় যে দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপিই তাঁহার জন্য পছন্দসই রাজকীয় উপঢৌকন ছিল। তাঁহার গ্রন্থাগারে যত পুস্তকের সমাবেশ ছিল অত আর কোথাও ছিল কিনা সন্দেহ। তাঁহার গ্রন্থাগারে ৪০০০০০ লক্ষ পাণ্ডুলিপি ছিল। অন্যদিকে মিশরের রাজকীয় গ্রন্থাগারে ছিল [আল আজিজের (মৃ. ৯৯৬) সময়ে] ২০০০০০, মুসতানসিরিয়া কলেজ গ্রন্থাগারে ৮০,০০০ (১২৩২ সালে) হাজার। ক্রমিক সংখ্যা নিরূপণের জন্য ৪৪ খানা তালিকা গ্রন্থ ছিল। তাঁহার গ্রন্থাগারের প্রধান গ্রন্থাগারিক ছিলেন খোজা তা'লিদ।

১. Dozy—Spanish Islam P—455

আধুনিক গ্রন্থাগার, বিজ্ঞানে গ্রন্থসংরক্ষণ ও বাঁধাইয়ের নির্দেশিকাও তখন ছিল। সোনালী অক্ষরে গ্রন্থের নামগুলি সুন্দররূপে লেখা হইত। কর্দোবার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ছাড়াও আরও ৭০টি গ্রন্থাগার ছিল: বস্তুতঃ হাকাম কর্দোবাকে একটি বইয়ের বাজারে পরিণত করেন। তিনি গ্রন্থ রচনা ও সংকলন কিংবা অনুবাদের আকর্ষণীয় পারিশ্রমিক প্রদান করেন। মৌলিক গ্রন্থের প্রথম সংখ্যা সংগ্রহের জন্য তাঁহার চেষ্টা ছিল অপরিসীম। আবুল ফারাজ ইস্পাহানী তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "কিতাবুল আগানী" রচনা করিয়া এই বিদ্যোৎসাহী নরপতির নিকট হইতে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা লাভ করেন।

বাগদাদের খলিফা আল মামুনের ন্যায় খলিফা হাকামও একজন চিন্তাবিদ ও পণ্ডিত ছিলেন। গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাগারের কলেবর বৃদ্ধি করাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। অধ্যবসায়ের সঙ্গে মূল্যবান গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিতেন এবং যথারীতি গ্রন্থের হাশিয়া লিপিবদ্ধ করিতেন। তিনি এত বেশি মেধাবী ও অধ্যয়নশীল ছিলেন যে তাঁহার গ্রন্থাগারের প্রায় সমস্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। ইতিহাস, জীবনপঞ্জী ও বংশ তালিকায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য সে যুগে বিরল ছিল। তিনি এক লেখকও ছিলেন। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বিদ্বান ব্যক্তিদিগকে সমাদর করিতেন। এই কথা ঐতিহাসিক সত্য যে তাঁহার সময়ে সমকক্ষ বিদ্বান নরপতি আর কোথাও ছিল কিনা সন্দেহ।

জনহিতকর কার্য

জনহিতকর কার্যে হাকামের যথেষ্ট অবদান ছিল। তিনি শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়, রোগীর জন্য হাসপাতাল, পরিব্রাজকের জন্য পান্থশালা এবং দরিদ্রদের জন্য লঙ্গরখানা স্থাপন করেন। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে নূতন করিয়া সড়ক নির্মাণ ও পুরাতনগুলির সংস্কার সাধন করেন। কর্দোবাসহ প্রত্যেকটি শহরে জনসাধারণের সুবিধার্থে হাম্মাম খানা, ঝর্ণা ও পানি সরবরাহের বন্দোবস্ত করেন। সৌন্দর্যপিপাসু মন লইয়া তিনি মনোরম উদ্যান রচনা করেন।

স্থাপত্য শিল্প

স্থাপত্যশিল্পে হাকামের কীর্তিও স্মরণীয়। কর্দোবার প্রসিদ্ধ জামে মসজিদের কারুকার্য রূপায়ণে তাঁহার অবদান উল্লেখযোগ্য। রং- বেরং এর পাথরে গাঁথা মসজিদ প্রাঙ্গণে তিনি একটি মার্বেল পাথরের চৌবাচ্চা নির্মাণ করেন। ইহার ফলে মসজিদ চত্বরের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পায় এবং প্রার্থনাকারীদের যথেষ্ট উপকার হয়। মাকছুরা নির্মাণ ও প্রচুর অর্থব্যয়ে সুদীর্ঘ ৭ বৎসর ধরিয়া একটি মিম্বর তৈয়ারীতে তিনি যে অনুপম রুচির পরিচয় দেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। ৩৬০০০ আবলুস কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা নির্মিত হয় এই সুদৃশ্য কারুকার্যময় মিম্বরটি। রাজধানীতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থাটি ছিল বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে। নদী হইতে তাহার পাইপের সাহায্যে প্রয়োজন মাফিক পানি উত্তোলন ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাটি ছিল খুবই উন্নত ধরনের। এই সমস্ত কার্যের জন্য হাকামকে ২৬১০০০ স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিতে হয়। পিতা কর্তৃক নির্মীয়মান 'আজ-জাহ্‌রা' প্রাসাদ তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয়ে সুদীর্ঘ ১৫ বৎসর ধরিয়া নির্মাণ সমাপ্ত করেন। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন একাধারে সমরকুশলী, বিদ্বান, প্রজারঞ্জক ও স্থাপত্য শিল্পানুরাগী খলিফা।

চরিত্র

বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী হাকাম স্পেনের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেন। বলিতে কি, মুসলিম স্পেনে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় তাঁহার সময়ে উন্নতির শীর্ষে পৌঁছায়। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ এবং ধার্মিক। রাজ্যে মদ্যপান তিনি নিষিদ্ধ করেন এবং জনগণকে শুদ্ধাচারে উদ্বুদ্ধ করেন। পরধর্মের প্রতি তিনি ছিলেন খুবই সহিষ্ণু। তাঁহার নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টায় কৃষি, শিল্প বাণিজ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয় তাহাতে তাঁহার রাজত্বকালকে স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে।

মৃত্যু

এই জ্ঞানতাপস প্রজাসেবক খলিফা ৬১ বৎসর বয়সে ৯৭৬ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হাযিব আল মনসুর (৯৭৬-১০০২)

[**সার সংক্ষেপ ঃ** সূচনা ❑ হাযিব আল মনসুর ❑ মুশাফির উত্থান ও পতন ❑ আবু আমির মুহাম্মদ ❑ সৈন্যবাহিনী সংস্কার ❑ সমরাভিযান ❑ কৃতিত্ব ❑ মৃত্যু।]

খলিফা হাকামের জীবন অত্যন্ত উদ্বিগ্নতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। তাঁহার সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুর রহমান অকালে প্রাণত্যাগ করেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র হিশাম তখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক। তবুও সুলতানা সুবাহর অনুরোধ এবং খলিফার ইচ্ছানুযায়ী ১২ বৎসর বয়স্ক হিশামই স্পেনের খিলাফতের উত্তরাধিকারী হইলেন। পরবর্তীকালে জনগণ, অমাত্যবর্গ কিংবা আপন ভ্রাতা আল মুগিরাও যাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধাচারণ না করিতে পারে সেইজন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী আবুল হাসান জাফর বিন উসমান আল মুশাফি ও রাষ্ট্রাধ্যক্ষ আবু আমির মুহাম্মদের সাহায্যে মনোনয়ন সমাপণী অনুষ্ঠানে সকলের নিকট হইতে পূর্ণ সম্মতি গ্রহণ করেন। মোট কথা সুলতানা সুবাহ প্রধানমন্ত্রী আল মুশাফি ও রাষ্ট্রাধ্যক্ষ আবু আমির মুহাম্মদের উপর পুত্র হিশামের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করিয়া খলিফা হাকাম মৃত্যুমুখে পতিত হন। খলিফার মৃত্যুর সংবাদ তাঁহার একান্ত দুইজন খোজাসঙ্গী গোপন রাখে। তাহাদের ইচ্ছা খলিফার ভ্রাতা ২৮ বৎসর বয়স্ক মুগিরাকে সিংহাসনে উপবেশন করানো। তাহারা সর্বপ্রথম প্রধানমন্ত্রীকে খলিফার মৃত্যু সংবাদ জানায়। প্রধানমন্ত্রী তাহাদের দূরভিসন্ধির কথা বুঝিতে পারিয়া দরবারে খলিফার মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা করেন। এবং ইহাও উল্লেখ করেন যে নাবালক খলিফাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্রও চলিতেছে। অতঃপর প্রধানমন্ত্রী আবু মুশাফি আমিরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া খলিফা হিশামকে বিপদমুক্ত করিবার জন্য মুগিরাকে গোপন চক্রান্ত করিয়া হত্যা করেন। ফলে হিশামের জন্য আর আপাততঃ কোন বিপদ রহিল না।

মুশাফির উত্থান ও পতন

অত্যন্ত নগণ্য অবস্থা হইতে আবুল হাসান জাফর বিন উসমান আল মুশাফির উত্থান। তাঁহার পিতা ছিলেন ভ্যালেন্সিয়ার উন্নত ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন শিক্ষক। আবদুর রহমান আন নাসির তাঁহার পুত্র হাকামের গৃহশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেন এই সংস্কৃতিমনা

রুচিবান শিক্ষককে। পিতার সাহায্যে মুশাফি হাকামের সহিত বাল্যবয়স হইতে সতীর্থ হইবার সুযোগ লাভ করেন। তিনি হাকামের সাহচর্যে আসেন একান্ত অন্তরঙ্গভাবে এবং উভয়ের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান ঘটে অকৃত্রিম বন্ধুত্বে। উভয়ের মধ্যে শিক্ষানুরাগ ও মার্জিত রুচির অভিন্ন সাদৃশ্য থাকায় মুশাফিরের ভাগ্যোন্নোয়ন ঘটে দ্রুতগতিতে। হাকাম খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর আল মুশাফি পর্যায়ক্রমে অনেকগুলি পদ মর্যাদার সিঁড়ি অতিক্রম করেন। প্রথমে একান্ত সচিব, অতঃপর নগররক্ষিবাহিনীর দ্বিতীয় ডিভিশনের অধিনায়ক, মের্জকার গভর্ণর, রাষ্ট্রের প্রথম সচিব এবং পরিশেষে সৌভাগ্যসিঁড়ির শেষধাপ প্রধানমন্ত্রী। তিনি যোগ্যতার বলে দ্রুত পদোন্নতি লাভ করেন। কিন্তু জনগণ ও অমাত্যবর্গের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা ক্ষেত্রে তিনি নিতান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দেন। তাঁহার বদমেজাজ ও রুক্ষ আচরণের ফলে কর্মচারী মহলের কেহই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। উপরন্তু তিনি পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতির জন্য বহু লোকের বিরাগভাজন হন। তবে তাঁহার একটি গুণ ছিল যে তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক খলিফা হিশামের একান্ত অনুগত। খিলাফাতের দায়িত্ব পালনেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। তবে কর্মচারী ও রাষ্ট্রের অন্যান্য মন্ত্রীবর্গের সহিত আন্তরিকতা না থাকিবার ফলে তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। অন্যদিকে রাষ্ট্রের প্রধান সচিব আবু আমির তাঁহার অপূর্ব বিচক্ষণতা ও বিরল কুটনৈতিক প্রজ্ঞায় কর্মচারী ও জনগণের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জনে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনিও অত্যন্ত নগণ্য অবস্থা হইতে অধ্যবসায় ও কর্মদক্ষতার দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পরবর্তীকালে আমরা তাঁহার বিচিত্র জীবনকাহিনী আলোচনা করিব। আবু আমির অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী আল মুশাফিরের পতনের জন্য অত্যন্ত সর্তকতার সহিত প্রচেষ্টা চালাইতে থাকেন। তিনি ছিলেন ধূর্ত, বাকচাতুর্যে এবং উদ্দেশ্য হাসিলে অপূর্ব মনোবলে অনড়। বাহ্যিক আলাপ ও কর্তব্য পালনে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সদালাপী, বিনয়ী এবং গভীর নিষ্ঠাবান ও শ্রদ্ধাশীল। তিনি এমন সূক্ষ্ম ও সতর্ক ছিলেন যে তিনি কখনও ইহা বুঝিতে দেন নাই যে তাঁহার দ্বারা প্রধানমন্ত্রীর কোন প্রকার ক্ষতির আশংকা করা যাইতে পারে। কিন্তু গোপনে তিনি হাকাম পত্নী সুলতানা সুবাহর নিকট প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অবিরতভাবে অভিযোগ করিতেন। অন্যদিকে আল মুশাফি আবু আমিরকে কখনও সন্দেহ করিতেন না। তাঁহার এই ধারণা ছিল যে যদি কখনও কোন অমঙ্গল কিছু ঘটে তবে তাহা হইবে বিপুল সামরিক শক্তির অধিকারী সেনাপতি গালিবের তরফ হইতে। সেনাপতি গালিব ছিলেন অসংখ্য যুদ্ধে বিজয়ী বীর। তিনি স্বাভাবিক কারণেই প্রকাশ্যভাবে আল মুশাফিকে ঘৃণা করিতেন। এই ঘৃণার পিছনে তাঁহার যুক্তি ছিল আল মুশাফি প্রধানমন্ত্রীর আসনের জন্য তিনি অযোগ্য। এই অনভিজ্ঞতার জন্য সেনাপতি গালিবকেও তিনি কিছু বলিতে পারিতেন না। সেনাবাহিনীর মধ্যেও তাঁহার কোন প্রভাব ছিল না। তাই আল মুসাফি সেনাপতি গালিবের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য উজিরবৃন্দ ও প্রধান সচিবের পরামর্শ কামনা করেন। সকলেই তাঁহাকে গালিবের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের পরামর্শ দেন। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপনের দায়িত্বভার নিলেন প্রধান সচিব আবু আমির। কিন্তু কার্যতঃ আবু আমিরের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। তিনি বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপনের পরিবর্তে উভয়ের মধ্যে তিক্ততা আরও তীব্রতর করিয়া তোলেন।

আবু আমির সুলতানা সুবাহর নিকট সেনাপতি উচ্ছসিত প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে দেশের সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসক নিযুক্তির সুপারিশ করেন। সুলতানা আবু আমিরের আবেদন মঞ্জুর করেন এবং প্রধানমন্ত্রীও এই পদোন্নতি অনুমোদন করেন। কারণ তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আবু আমির তাঁহার সহিত গালিবের বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টায় নিযুক্ত। অতএব তিনিও গালিবের উন্নতির পথের প্রতিবন্ধক হইতে পারেন না। ইতিমধ্যে খ্রিস্টানদের সঙ্গে একটি যুদ্ধ শুরু হয়। আবু আমির সেনাপতির সঙ্গে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং মূল দুর্গ বিজয় করিয়া খ্রিস্টানদিগকে বিতাড়িত করেন। এই সময় গালিবের সঙ্গে গোপন চুক্তি হয় এই মর্মে যে কোন প্রকারে হউক আল মুশাফিকে পদচ্যুত করিতেই হইবে। এই চক্রান্তের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আবু আমির আল মুশাফির পুত্রের স্থলে নিজেই কর্দোবা নগরের প্রিফেক্ট হইবেন। তাঁহারা উভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিজয়ীবেশে রাজধানীতে আগমন করিয়া সুলতানা সুবাহর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। আবু আমির সহজেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত পদটি লাভ করেন। এই সময়ে কর্দোবার আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে। আবু আমির নগর প্রিফেক্টের দায়িত্বভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিয়া শান্তি স্থাপনের দিকে মনোনিবেশ করেন। নগর রক্ষবাহিনীকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, দুস্কৃতিকারী ও আইনভঙ্গকারীদিগকে যেন বিন্দুমাত্র দয়া প্রদর্শন না করিয়া কঠোরহস্তে দমন করা হয়। আবু আমিরের বলিষ্ঠ ঘোষণায় শান্তি শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার অপূর্ব সাফল্য দৃষ্ট হয়। আইনভঙ্গকারী দলের সহিত তাঁহার আপন পুত্রও জড়িত ছিল এবং তিনি তাহাকেও ক্ষমা করেন নাই। নিজ হাতে পুত্রকে বেত্রাঘাত করিয়া আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান এই নীতি প্রতিষ্ঠিত করেন। ফলে অতি শীঘ্রই নগরে শান্তি-শৃংখলা কায়েম হয়। আবু আমিরের শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মন্ত্রী মুশাফি এইবার আবু আমিরের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া শংকিত হইয়া উঠেন। তিনি গোপনে সেনাপতি গালিবকে প্রশংসাসূচক একটি পত্র প্রেরণ করেন। উহাতে তিনি উল্লেখ করেন যে সেনাপতির দুহিতা আসমার পাণি গ্রহণের জন্য মন্ত্রী পুত্র উদগ্রীব। উভয়ের মধ্যে এই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া যেন সুদৃঢ় করিতে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু আবু আমির কৌশলে এই পত্রের কথা জানিতে পারিয়া তিনি নিজেই সেনাপতি দুহিতার পাণিপ্রার্থী, এই বলিয়া দ্রুত সংবাদ প্রেরণ করেন। ইহাও উল্লেখ করেন যে, তাঁহাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত যেন কোন প্রকারে পরিবর্তিত না হয়। গালিব এইবারও আবু আমিরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মন্ত্রী মুশাফিকে নিদারুণভাবে বঞ্চিত করেন। অচিরেই সেনাপতি গালিবের কন্যার সহিত আবু আমিরের শুভ-বিবাহ খলিফা হিশামের রাজকীয় তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীকে বন্ধুহীন অবস্থায় ক্ষোভ, দুঃখ ও অপমান সহ্য করিতে হয়। এইবার আবু আমির প্রধানমন্ত্রীর প্রতি শেষ আঘাত হানিলেন। সুলতানা সুবাহর অনুমোদন লইয়া আল মুশাফিকে অপসারণ করিয়া তদস্থলে সেনাপতি গালিবকে নিয়োগ করেন। ৯৭৮ সালের ২৬ শে মার্চ আল মুশাফি, তাঁহার পুত্র ও আত্মীয়-স্বজন সকলকেই বন্দী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং তাঁহাদের যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এইভাবে মুশাফির দীর্ঘদিনের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

আবু আমির মুহাম্মদ

ইসলামের ইতিহাসে যুগে যুগে বিভিন্ন বংশের রাজত্বকালে কতিপয় অনন্য সাধারণ প্রতিভা ও বিরল ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। তাঁহারা নিজদিগকে খুবই নগণ্য ও অজানা অবস্থা হইতে সাধনা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। আনুগত্য, প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠার দ্বারা ক্ষয়িষ্ণু রাজক্ষমতাকে তাঁহারা কেবল দ্রুত পতনের হাত হইতে রক্ষা করেন নাই বরং ইহার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিও করিয়াছেন উল্লেখযোগ্যভাবে। এই প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিত্বের সারিতে আমরা দেখিতে পাই হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, খালিদ বিন বার্মাক ও তাঁহার বংশধরগণ, আবু মুসলিম খোরাসানী, নিজামুল মুলক, মুহাম্মদ গাওয়ান, বৈরাম খাঁ, কুপরুলি ও সুকুলি উজিরগণ। স্পেনে দীর্ঘ উমাইয়া রাজত্বকালের শেষ অধ্যায়ে আমরা অনুরূপভাবে দেখিতে পাই হাযিব আল মনসুরকে। তাঁহার পূর্ণ নাম ছিল আবু আমির মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ ইবনে আবি আমির। খিলাফতের সর্বময় ক্ষমতা হস্তগত করিয়া তিনি আল মনসুর উপাধি গ্রহণ করেন। এই উপাধি গ্রহণের পূর্বে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন নামে তাঁহাকে উল্লেখ করিয়াছেন ; যেমন ডজি তাঁহাকে 'ইবনে আবি আমির', সৈয়দ আমির আলী, 'মুহাম্মদ ইবনে আমির', কন্‌ডে 'মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ' এবং ড. এস. এম. ইমামউদ্দিন সাহেব 'আবু আমির মুহাম্মদ'। ঐতিহাসিক লেনপুলের মতে "আল মনসুর প্রাচীন আরব বংশোদ্ভুত। তার পূর্ব পুরুষ সেনাপতি মুসা বিন নুসাইরের সেনাদলের সাথে উত্তর আফ্রিকায় এসেছিলেন। সৈনিক বেশে তারিক বিন যিয়াদের বার্বার-আরব বাহিনীর সাথে স্পেন বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন।" ফলে তার জনম ও বংশধারা বনেদী ও সম্ভ্রান্ত আরব গোত্রের সাথে সংযুক্ত। অত্যন্ত পরিশ্রমী, আপন ভবিষৎ গড়ার উদ্যোগী এবং মেধা প্রতিভার পরিচর্যায় অধ্যবসায়ী। ৯৪২ খ্রিস্টাব্দে তার জন্ম আর কর্দোবাতে যুবক জীবন অতিবাহিত। জীবনের প্রভাতেই রাজনৈতিক উচ্চ শৈল শিখরে আরোহণের দুর্বার প্রত্যাশী ছিলেন তিনি। ছাত্রাবস্থায় তার আকাঙ্ক্ষা সযতনে পরিচর্যা করে চলেছিলেন ভাবী কালে স্পেনের অধীশ্বর হবার জন্য। কর্দোবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। তারপর কর্ম জীবনে প্রবেশ করেন অত্যন্ত সম্মানের সোপান দিয়ে। কর্দোবা আদালতে বিচারক মুহাম্মদ আস সলিমের অধীনে দরখাস্ত লেখক হিসাবে কর্মজীবনের শুভ সূচনা করেন। তিনি সুলেখক, মিষ্টভাষী ও সদালাপী ছিলেন। তাঁহার দফতরটি ছিল খলিফা হাকামের প্রাসাদ তোরণের সন্নিকটে। অচিরেই খলিফা হাকামের মহিষী সুলতানা সুবাহর এক খাদেমের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হন। এই খাদেম সুলতানার নিকট আবু আমিরের বিভিন্নমুখী গুণের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। এইবার আবু আমিরের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। ৯৬৭ সালে খলিফা হাকাম তাঁহাকে নিজ পুত্র আবদুর রহমানের প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্বাবধায়করূপে নিয়োগ করেন। মাসিক বেতন ধার্য হয় পনেরোটি স্বর্ণমুদ্রা। আবু আমির প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন কেমন করিয়া আরও উচ্চপদে সমাসীন হওয়া যায়। একদিকে তাঁহার নিরলস প্রচেষ্টা আর অন্যদিকে সুলতানা সুবাহর অনুগ্রহ, উভয়ের সম্মেলনে তিনি উন্নতির সিঁড়ি দিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে শুরু করেন। তিনি অত্যন্ত সফলতার সহিত সুলতানা

সুবাহর একান্ত প্রিয়জন হইয়া উঠেন। অল্পদিনের মধ্যেই সুলতানা প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্বাবধায়কের পদ লাভ করেন। ইহার পর একে একে সেভিলের রাজস্ব সংগ্রাহকের পদ এবং কর্দোবা টাকশালের তত্ত্বাবধায়কের আসন গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি সুলতানা সুবাহর জন্য একটি রৌপ্য প্রাসাদ নির্মাণের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এইভাবে তিনি ক্রমশঃ খলিফা হইতে শুরু করিয়া সভাসদদের সকলের ভক্তিভাজন হইয়া উঠেন। ৯৭২ সালে তাঁহাকে কর্দোবার পুলিশ প্রধানের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তিনি অত্যন্ত কঠোরতার সহিত আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেন। ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে তাঁহার আইনভঙ্গকারী নিজ পুত্রকেও তিনি ক্ষমা করে নাই বেত্রাঘাতে তাঁহাকে নিহত করিয়া আইনের শাসনের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ৩১ বৎসর বয়সে তিনি যোগ্যতা ও খলিফার অনুগ্রহ লইয়া পর পর পাঁচ হইতে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করেন। তিনি মৌরিতানিয়ার অর্থ দফতর ও বিচারকের পদও অলংকৃত করেন। আফ্রিকাতে অবস্থানকালে তিনি সামরিক ও বেসামরিক শাসন ব্যবস্থার সহিত একান্তভাবে পরিচিত হন। প্রকৃতপক্ষে এখান হইতে তাঁহার 'হাযিব' জীবনের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। সেনাপতি গালিবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত ঘটে এবং পরবর্তী জীবনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। কৌশল সূক্ষ্মবুদ্ধি ও কুটনীতিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এই বিচক্ষণতার বদৌলতে তিনি প্রধানমন্ত্রী মুশাফিকে নিদারুণভাবে বঞ্চিত করিয়া সেনাপতি গালিবের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। এই বৈবাহিক সম্বন্ধের ফলে পরবর্তী পরিকল্পনাগুলি দ্রুতগতিতে বাস্তবে রূপলাভ করে।

সভাসদ ও আবু আমির মুহাম্মদ

সৌজন্যমূলক ব্যবহার ও সদালাপে আবু আমির দরবারের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যমণি হইয়া উঠেন। প্রয়োজনে চাটুকারিতা, উপঢৌকন কিংবা অর্থপ্রদানে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আপন লক্ষ্যের পথে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে চূর্ণ করিয়া তিনি সফলতা অর্জন করেন। তাঁহার কুটনীতিক বিজয় সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে কিছুটা অবগত হইয়াছি। আল মুশাফির পতন ও গালিবের এবং নিজের পদোন্নতি সকলের মূলে ছিল তাঁহার সুনিপুণ কুটনৈতিক কলাকৌশল। মুশাফির পতনের পর তাঁহার অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হইবার পথের একমাত্র প্রতিবন্ধক ছিলেন নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী সেনাপতি গালিব। কর্দোবার শ্লাভ দেহরক্ষীবাহিনীর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। এইজন্য তিনি বার্বার খ্রিস্টানদিগকে লইয়া তাঁহার নিজের জন্য একটা বাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনী রাষ্ট্রের সেবা অপেক্ষা তাঁহাদের প্রভুর সেবাকার্যে ছিল একান্ত নিবেদিত। এই বাহিনী গঠনের মূলেও ছিল তাঁহার একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্থাৎ কিভাবে রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা হস্তগত করা যায়।

৯৮১ সালে লিয়োনের সঙ্গে আবার সংঘর্ষ শুরু হয়। লিয়োনীদিগকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য সেনাপতি গালিব ও আবু আমির উভয়ই সৈন্যবাহিনী লইয়া গমন করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে আবু আমির তাঁহার শ্বশুর ও প্রধানমন্ত্রী গালিবকে পরামর্শ দেন খলিফা হিশামকে উৎখাত করিবার জন্য। কিন্তু বয়োবৃদ্ধ সেনাপতি রাজানুগত্যে ছিলেন অনড়। তিনি ছিলেন অত্যধিক প্রভুভক্ত। তিনি তাঁহার জামাতার এহেন রাজদ্রোহিমূলক পরিকল্পনাকে অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখান করেন। জামাতার এই উচ্চাভিলাষকে নিতান্ত বিশ্বাঘাতকতামূলক

কার্য হিসাবে অভিহিত করেন। অতঃপর খ্রিস্টানদের সঙ্গে সংঘর্ষে সেনাপতি জয়লাভ করেন কিন্তু তিনি মারাত্মকরূপে আহত হন এবং যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করেন। যুদ্ধে একক বিজয়গৌরবের মুকুট পরিধান করিয়া আবু আমির মুহাম্মদ মহাবিজয়োল্লাসে রাজধানীতে প্রবেশ করেন। এই সময়ে তিনি আল মনসুর উপাধি গ্রহণ করিয়া বহুপ্রত্যাশিত হাযিব পদ গ্রহণ করেন। আল মনসুর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। তাঁহার দীর্ঘদিনের সযত্নে লালিত বাসনা আর পরিশ্রমে অর্জিত সাধনা যেন এইবার কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার মতবিরোধী কর্মচারীদিগকে অপসারণ করিয়া নিজের পছন্দমাফিক কর্মচারী নিয়োগ করিয়া প্রশাসনযন্ত্রকে নূতন রূপে গড়িয়া তুলিলেন। খলিফা হিশাম যদিও এখন আর বালক নহে তথাপিও তাঁহাকে আমোদ প্রমোদের যাবতীয় উপকরণ দিয়া হেরেমে আবদ্ধ রাখেন। বস্তুতঃ খলিফা হিশাম কোনদিন রাজকার্য অথবা খিলাফতের দায়িত্বে আসিবার সুযোগ পান নাই এবং তাঁহাকে সে সুযোগ হইতে অত্যন্ত কৌশলে বঞ্চিত করা হইয়াছিল। তিনিও দুর্বল ও নিস্তেজ হইয়া আরাম আয়েশের উপর গড়াগড়ি দিয়াই দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন। রাজ্যের কর্মচারীগণের কোন বিশেষ আনন্দোৎসব ব্যতীত তাঁহার নিকট গমন নিষিদ্ধ ছিল। উৎসবের সময় কেবল তাঁহাকে একনজর দেখিয়া একটু শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়া প্রস্থান করিতে হইত। এমনি এক বন্দী অবস্থায় হিশামের দিনগুলি কাটিত। আপন পুত্রের এই দূরবস্থা দর্শনে সুলতানা সুবাহর মনে উদয় হইল খলিফার মর্যাদা ও ক্ষমতা উদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা। হিশামকে প্রাসাদবন্দীশালা হইতে মুক্ত করিবার জন্য সুলতানা সুবাহ এবার হাযিব আল মনসুরের বিরোধিতা শুরু করেন। তিনি হাযিব আল মনসুরকে অপসারণ করিবার মানসে মরক্কোর সুলতান জিরি বিন আতিয়ারের সাহায্য কামনা করিয়া পত্র প্রেরণ করেন। এই সংবাদে আল মনসুর মোটেই বিচলিত হন নাই। তিনি সুলতানার নিকট গমন করিয়া যথাযথ শ্রদ্ধার্পন করিয়া উল্লেখ করেন যে খলিফার প্রতি তাঁহার আনুগত্য বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই। সম্ভবতঃ আলমনসুরের প্রতি সুলতানা সুবাহর বিশেষ দুর্বলতা ছিল। তাই তিনি পুত্রকে মুক্ত করিতে না পারিয়া অর্থাৎ যথার্থ ক্ষমতার অধিকারী না করিতে পারিয়া রাজনীতি হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তিনি এইবার নিরিবিলি কাব্যঙ্গনে প্রবেশ করিয়া বাকী জীবন অতিবাহিত করেন।

হিশাম তুষারধবল প্রস্তরে নির্মিত জমকালো জাহিরা প্রাসাদে বসবাস করিতেন। মুদ্রা, খুতবা ও রাজকীয় ফরমানে খলিফার নামের সঙ্গে আল মনসুরের নামও সংযুক্ত থাকিত। এইখানেই সম্ভবতঃ আল মনসুরের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য।

সৈন্যবাহিনী সংস্কার

মধ্যযুগে রাজ্যশাসনের সফলতা ও ব্যর্থতা বহুলাংশে নির্ভর করিত শাসকদের বাহুবলের উপর। সামরিক শক্তিতে যিনি যত বেশি শক্তিশালী ও সুসংহত ছিলেন তিনি ততটা যোগ্যতার অধিকারী হইতেন। সৈন্যবাহিনী সুসংগতভাবে বিন্যস্ত, পুনর্গঠন ও পরিচালনার উপর নির্ভর করিত রাজশক্তির সমৃদ্ধি ও সুনাম।

আল মনসুর সর্বময় ক্ষমতায় সমাসীন হইয়া এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করেন। সৈন্যবাহিনীর উপর নিরংকুশ প্রভাব অর্জনের জন্য এবং ইহাকে

দ্বন্দ্বকলহমুক্ত করিয়া শক্তিশালী করিবার নিমিত্ত ব্যাপকভাবে পূনর্গঠন করেন। আবদুর রহমান আন নাসিরের সময় বিদেশী ও বিধর্মীদের দ্বারা পুনর্গঠিত হয়। কিন্তু হাকামের (২য়) রাজত্বকালে বহু দেশীয় আরব বার্বার ও নওমুসলিম সৈন্যবাহিনীতে স্থানলাভ করে। ফলে সামরিক ছাউনী ও তাঁবুতে দেখা দেয় গোত্রকলহ ও আভিজাত্যের দ্বন্দ্ব। সেনাপতি গালিবের বিরাট ব্যক্তিত্বে তাহারা বিশেষ উচ্ছৃংখল হইতে পারে নাই। তবে সুযোগসন্ধানী সৈন্যগণ সুযোগ পাইলেই তাহার সদ্ব্যবহার করিত। আল মনসুর বহু আরব গোত্রকলহপ্রিয় সৈন্যকে অপসারণ করেন। তিনি তাঁহার নূতন সামরিক ছাউনীতে সংগ্রহ করেন আফ্রিকা ও সিউটা হইতে সদ্য আগত উৎসাহী বার্বার, আফ্রিকার সুদানী এবং উত্তরাঞ্চল হইতে প্রত্যাগত বহু খ্রিস্টানকে। তাহাদিগকে উন্নতমানের অশ্ব ও অস্ত্রদ্বারা সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করেন। আল মনসুর খলিফা আবদুর রহমান আন নাসিরের পদাংক অনুসরণ করিয়া সামন্ত প্রথা ও গোত্রপ্রথায় সৈন্য সংগ্রহনীতি রহিত করেন। আল মনসুর সৈন্যবাহিনীতে আরবদের প্রভাব বহুলাংশে খর্ব করেন। আরবগণ ভবিষ্যতে যাহাতে কোন প্রকার গোত্রকলহের সুযোগ না পায় এইজন্য বিভিন্ন ব্রিগেড ও ব্যাটালিয়ানে তাহাদিগকে বার্বার ও খ্রিস্টানদের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। সৈন্যবাহিনীতে তাঁহার প্রিয় ও বিশ্বস্ত অফিসারদিগকে দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করেন। শৃঙ্খলা নিয়মানুবর্তিতা ও সামরিক কলাকৌশলে পারদর্শিতা অর্জনের কঠোর সামরিক বিধান জারি করেন। সৈন্যবাহিনী শৃঙ্খলা বিধানে তাঁহার দৃষ্টি ছিল প্রখর। একদা সৈন্যবাহিনী প্রশিক্ষণ তদারককালে তিনি লক্ষ্য করেন যে, তাঁহার নির্দেশ দেওয়ার পূর্বেই একজন সৈনিকের তরবারি কোষ হইতে নির্গত হইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সৈনিককে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন 'কেন তোমার তরবারি নির্দেশের পূর্বে কোষমুক্ত হইল?' সৈনিক উত্তর দিলেন ইহা তাঁহার অসাবধানতার ফলেই হইয়াছে। কিন্তু এই উত্তর আল মনসুরকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। অতঃপর সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলারক্ষায় বিঘ্ন ঘটানোর অভিযোগে উক্ত তরবারি দ্বারা সৈনিকের প্রাণদণ্ড দেন। এই হতভাগ্য সৈনিকের লাশ প্রতিটি সৈনিকের জন্য শৃঙ্খলারক্ষায় জ্বলন্ত দৃষ্টান্তরূপে পরিগণিত হয়। এইভাবে তিনি সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করেন। তাঁহাদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার দিকে তাঁহার সহানুভূতি ছিল প্রচুর।

সমরাভিযান

আল মনসুর যেমনি সামরিক প্রশাসনিক কার্যে সতর্ক ও দক্ষ ছিলেন তেমনি সমরাঙ্গনেও যথেষ্ট রণকুশলতার পরিচয় প্রদান করেন। ইবনে খলদুনের মতে তিনি বায়ান্নটি সমরাভিযান পরিচালনা করিয়া প্রত্যেকটিতে সফলতা অর্জন করেন। কখনও তাঁহার সৈন্যদল পরাজিত অথবা জাতীয় পতাকা অবনমিত হয় নাই। ঐতিহাসিকগণ এই বিষয়ে এক মত যে, মনসুর সমরাভিযানে কোনদিন পরাজয় বরণ করেন নাই।

খলিফা হাকামের (২য়) মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গ্যালেসীয় ও বাস্‌কগণ পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া মুসলিম অঞ্চলে আক্রমণাত্মক তৎপরতা শুরু করেন। আল মনসুর তাঁহার বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া উপর্যুপরি তাঁহাদের উপর আক্রমণ করেন। অবশেষে তাঁহারা

পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হন। লিয়োনরাজ রামিরো (৩য়) এবং ন্যাভারিরাজ স্যাংকো আবার যুদ্ধে পরাজিত হন। আল মনসুর এই দুইটি দেশকে করদরাজ্যে পরিণত করিয়া নিজ সৈন্যবাহিনী দ্বারা উভয় দেশের রাজধানীকে প্রহরায় রাখেন। ইহার পর ৯৮৫ সালে তিনি ক্যাতালোনীয়ার প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং বারসিলোনার কাউন্ট বোরেলকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। ৯৮৭ সালে রামিরোর (৩য়) উত্তরাধিকারী বারমুডো (২য়) বিদ্রোহ করিলে তিনি তাহাকে পরবর্তী বৎসরে পরাজিত করিয়া স্পেনের রাজ্যকে পীরেনীজ পর্যন্ত শত্রুমুক্ত করেন। মৌরিতানিয়াতে তাঁহার সৈন্যবাহিনী অনুরূপ সাফল্য অর্জন করেন। মরক্কোতে আল মনসুরের সৈন্যবাহিনী কয়েকটি সার্থক অভিযান প্রেরণ করেন। এইভাবে দেখা যায় যে তাঁহার ৬ লক্ষের বিশাল সৈন্যবাহিনী দ্বারা তিনি একাধারে খ্রিস্টান ও ফাতেমীয়দের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করিয়া আপন কর্তৃত্ব সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি শত্রুদের নিকট ছিলেন ভয়ংকর সেনাপতি আর আপন সৈনিকদের নিকট ছিলেন মান্যবর অধিকর্তা।

কৃতিত্ব

স্পেনের ইতিহাসে হাযিব আল মনসুরের কীর্তি অবিস্মরণীয়। তাঁহার ব্যক্তিত্ব অপরিসীম এবং প্রতিভা বহুমুখী। অপূর্ব গুণরাজির অদ্ভুত বিকাশে তাঁহার কৃতিত্ব উজ্জ্বল জোতিষ্কের ন্যায় ভাস্কর। সামান্য অবস্থা হইতে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় লইয়া পরিশ্রম ধৈর্য ও সাধনার তোরণ দিয়া সৌভাগ্য-মঞ্জিলে তিনি নিজকে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজানুগত্য ও অনুগ্রহ এবং প্রতিভার বিকাশ তাঁহার আনে বারংবার পদোন্নতি। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, কূটনৈতিক কলাকৌশল এবং স্বার্থ হাসিলের চাটুকারিতা ও নিষ্ঠুরতা তাঁহাকে উপনীত করে তাঁহার ঈপ্সিত লক্ষ্যে। তিনি নিঃসন্দেহে ঐ সময়ের জন্য যোগ্য ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। একাধারে তাঁহার মধ্যে ছিল প্রশাসনিক দক্ষতা, বিচার বিভাগীয় বিচক্ষণতা, রণাঙ্গনে রণকুশলতা সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠনে নিপুণতা জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রজাকল্যাণে মহানুভবতা।

তৎকালে উত্তরাঞ্চলের খ্রিস্টানগণ হাযিব আল মনসুরের ন্যায় আর কোন নরপতিকে এত বেশি ভয় করিতেন না। আবুদর রহমান আন নাসিরের পর তিনিই ছিলেন দশম শতকে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সমরনায়ক ও রাজনীতিবিদ। নাবালক খলিফার দোদুল্যমান ও পতনোম্মুখ খিলাফতকে তিনি শুধু রক্ষাই করেন নাই বরং উন্নতি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিরল অবদান রাখেন। লিয়োন, ন্যাভারি, বারসিলোনার খ্রিস্টানদের সহিত সমঝোতা না করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত ও বিপর্যস্ত করিয়া মুসলিম শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। বসন্ত ও শরতে প্রতি বৎসর দুইটি করিয়া সামরিক অভিযান চালাইয়া তিনি শত্রুদিগকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া রাখেন। বৈদেশিক শক্তির মোকাবেলা করিয়া তিনি স্পেনকে নিরাপদ করেন। স্পেনকে তিনি এমন একটি অবস্থায় আনয়ন করেন যাহা আর কেহ কোনদিন দেখতে পায় নাই।

দেশের জনসাধারণের সামগ্রিক সুখ-সুবিধা বিধানের দিকেও তাঁহার সজাগ দৃষ্টি ছিল। যাতায়াত, ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষি-শিল্প ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তিনি তাঁহার প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। সৈন্যবাহিনীর চলাচল, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা ও জনসাধারণের যাতায়াতের জন্য তিনি নূতন নূতন সেতু নির্মাণ করেন এবং পুরাতনগুলিকেও সংস্কার করেন। চল্লিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে তিনি গোয়াদাল কুইভার নদের ওপর একটি সেতু নির্মাণ করেন। এছিজার জেনিল নদীর উপরও একটি সেতু নির্মাণ করেন। ফলে যাতায়াতের যথেষ্ট উন্নতি হয়। স্থাপত্য শিল্পেও আল মনসুরের কীর্তি স্মরণীয়। কর্দোবা জামে মসজিদের পুনঃসংস্কার তিনি করেন। তিনি রংবেরং এর মূল্যবান প্রস্তরখণ্ড দ্বারা রূপ ও রুচির সমন্বয় সাধন করিয়া মসজিদটিকে আরও অনুপম ও আকর্ষণীয় করিয়া তোলেন। নব নব হর্ম্যরাজি নির্মাণে স্পেনীয় শাসকগণ অভূতপূর্ব সৃজনশীল রুচির পরিচয় প্রদান করেন। স্থাপত্য শিল্পানুরাগে তাঁহারা ছিলেন উদার ও অকৃপণ। শান-শওকত ও সৌন্দর্য সৃষ্টিতে তাঁহারা যেন প্রতিযোগিতায় উন্মাদ হইয়া উঠেন। শিল্প সৌকর্য ও স্থাপত্যরীতির মনোমোহিনী রূপ লইয়া বিভিন্ন শাসকের সাথে গড়িয়া উঠে কর্দোবার অপরূপ হর্ম্যরাজি। সৌন্দর্যের তিলে তিলে গড়িয়া উঠে তিলোত্তমারূপী ইউরোপ নগরীরাণী কর্দোবা। খলিফা আবদুর রহমান আন নাসিরের নির্মিত সৌন্দর্যের যাদুঘর আজ-জাহ্‌রা প্রাসাদনগরী। এই অপরূপ নগরীর সৃষ্টির নেশায় উদ্বুদ্ধ হইয়া হাযিব আল মনসুরও নির্মাণ করেন মদিনা-তুস-জাহিরা। ৯৭৮ সালে এই প্রাচীরবেষ্টিত সৌন্দর্যের লীলাক্ষেত্র মদিনা-তুস-জাহিরা নির্মিত হয়। অতএব দেখা যায় যে আল মনসুর স্থাপত্যশিল্পে যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবিদার।

জ্ঞান বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা

স্পেনের সুখ্যাতি, শক্তি ও সুনাম সমগ্র ইউরোপে তখন স্বীকৃত। জ্ঞানতাপস খলিফা আল হাকামের জ্ঞান-বিজ্ঞানে নজীরবিহীন অনুরাগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় স্পেনের গৌরব চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত। কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, মনীষী বিজ্ঞানী ও ধর্মশাস্ত্রবিদের নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ সাধনা ও গবেষণা স্পেনের খ্যাতিকে বহু দূরে বিস্তৃত করে। হাযিব আল মনসুর এই খ্যাতিকে আরও সম্প্রসারিত করেন। তিনি তাঁহার দরবারকে পণ্ডিত ও মনীষীদের দ্বারা অলংকৃত করেন। তিনি কবিদিগকে পর্যাপ্ত ভাতা ও উপঢৌকন দ্বারা খুশি রাখিতেন। কাতালোনিয়ার অভিযানে তাঁহার সঙ্গে একচল্লিশজন কবি ও ঐতিহাসিক ছিলেন। অর্থাৎ জ্ঞানী-গুণীদের সেবায় তিনি প্রচুর আনন্দলাভ করিতেন। তিনি নিজেও একজন জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার বাসভবনেই এক বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। তাঁহারই অনুপ্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতায় কর্দোবায় একটি ভাষা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। কবি, সাহিত্যিক ঐতিহাসিকগণ সেখানে বিভিন্ন বিষয় লইয়া গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করিতেন। মসজিদ, মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি খুবই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিতেন। সময়ে সময়ে তিনি এই সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া ছাত্র-শিক্ষকদের অভাব-অভিযোগের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে অবগত হইতেন। শিক্ষাকে জনপ্রিয় করিবার জন্য তাঁহার

চেষ্টা ছিল প্রশংসনীয়। শিক্ষক ও ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য পুরস্কারের বন্দোবস্তও ছিল। তাঁহার দরবারে জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন। তন্মধ্যে কবি উবাদা বিন আবদুল্লাহ বিন মাসুমী, আবু বকরী, আবদুল ওয়ারিস বিন সুফিয়ান, সাঈদ বিন উসমান বিন মারওয়ান আল কোরেশী, সাঈদ বিন হাসান আল রেবাই মৌসুলী, ধর্মশাস্ত্রবিদ সাঈদ বিন রাজিক, ভাষা একাডেমীর প্রধান ইব্রাহিম বিন নাজর, ঐতিহাসিক আবদুল ওয়াহিদ ইবনে মা'মার, জোর্তিবিদ আবদুল কাসিম মাসলামা, চিকিৎসক আবদুর রহমান ইছাহাক বিন হাইসাম প্রভৃতি অন্যতম। উলামা সম্প্রদায় প্রথমে আল মনসুরের খুবই বিরোধিতা করেন। তাঁহারা সুলতানা সুবাহর সঙ্গে তাঁহার অবাধ মেলামেশা পছন্দ করিতেন না। এমনকি তাঁহারা খলিফাসহ তাঁহাকে হত্যার জন্যও ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু সুচতুর আল মনসুর এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত হইয়া ইহার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদিগকে কঠোর শাস্তি বিধান করেন। উলামাদের সমর্থন লাভের জন্য তিনি বিদেশী মতবাদ সম্বলিত দর্শনের গ্রন্থগুলিকে ধ্বংস করেন। বহু দার্শনিককে দেশত্যাগের নির্দেশ দেন। এইভাবে উলমাদিগকে সন্তুষ্ট করেন।

আল মনসুরের ক্ষমতা দখলের পদ্ধতির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া যদি আমরা তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগের বাস্তবরূপ দেখি তবে মনে হয় তিনি ছিলেন সে যুগের একজন বিরল প্রতিভাবান ব্যক্তি। তাঁহার রাজ্যশাসন নীতিতে ছিল সৎ, অভিজ্ঞ, কর্তব্যপরায়ণ, দায়িত্বশীল ও অনুগত কর্মচারীদের রাজানুগ্রহ প্রদর্শন আর অসৎ, অলস, দায়িত্বহীন ও কর্মে উদাসীন ও রাজ অনুগত্য অস্বীকারকারীদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন। রাজ্যশাসনে এই নীতি যথার্থ কার্যকরী হওয়ার ফলে শাসন বিভাগে দেখা দেয় অপূর্ব সাফল্য। জনগণ লাভ করে স্বস্তি ও শান্তি। ন্যায় বিচারের প্রতি আল মনসুরের দৃষ্টি ছিল আরও প্রখর। বিচারকদিগকে নির্ভয়ে ও স্বাধীনভাবে বিচারকার্য পরিচালনার নির্দেশ দেন। একদা একজন সাধারণ নাগরিক আল মনসুরের নিকট ফরিয়াদ জানান হে আইনের রক্ষক, আপনার বর্মধারী বিভাগের শ্লাভ সৈনিক যিনি আপনার পশ্চাতে দণ্ডায়মান তাঁহার বিরুদ্ধে আমি কাজীর দরবারে অভিযোগ করি। কিন্তু উনি কাজীর তলবে হাজির হন নাই। অবশ্য এই সৈনিক সম্পর্কে আল মনসুরের উঁচু ধারণা ছিল এবং তিনি তাহাকে ভালবাসিতেন। আল মনসুর অভিযোগ শ্রবণে বলিলেন, কি! এত বড় স্পর্দ্ধা, সে বিচারালয়ে উপস্থিত হয় নাই। অথবা বিচারকও তাহাকে বাধ্য করে নাই ? আমি বিচারক আবদুর রহমান ফাতাইকে যোগ্য মনে করিয়াছিলাম। যাক, তুমি বল তোমার ফরিয়াদ কি ? লোকটি তাঁহার অভিযোগ পেশ করিলেন এবং শ্লাভ সৈনিককে আদালতে যাইতে নির্দেশ দেন। বিচার অনুষ্ঠিত হয় এবং রায় শ্লাভের বিপক্ষে যায়। লোকটি সুবিচার পাইয়া আল মনসুরের নিকট কৃতজ্ঞতা জানায়। হাযিব তাঁহাকে বলিলেন, নিশ্চিন্তে গৃহে গমন কর, তবে অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান না করিয়া আমার শান্তি নাই। অতএব ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় তাঁহার সুখ্যাতি ছিল প্রবাদবাক্যের ন্যায়। প্রথিতযশা কীর্তিমান হাযিবের সম্বন্ধে কয়েকজন ঐতিহাসিকের মন্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হইল। "ভাগ্য যদি তাঁহাকে রাজ সিংহাসনে জন্ম দিত তবে জগৎ তাঁহার

ক্রটিবিচ্যুতি নিতান্তই নগণ্য বলিয়া গণ্য করিত। এই অবস্থায় সত্যিই তিনি ইতিহাস প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ নরপতিদের মধ্যে অন্যতমরূপে চির ভাস্কর হইতেন।"[১]

"তাঁহার যাবতীয় কঠোরতা ও অসততা সত্ত্বেও তিনি স্পেনকে গৌরবের এমন শিখরে উপস্থিত করেন যাহা মহানুভব খলিফা আবদুর রহমানের (৩য়) দ্বারা হয়ত হয় নাই।"[২]

মৃত্যু

এই প্রখ্যাত হাযিব ৬১ বৎসর বয়সে ১০০২ সালে ১০ই আগষ্ট মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহাকে মদিনা-তুস-সলিমে সমাধিস্থ করা হয়।

১. Dozy—Spanish Islam P—533

২. Lane poole—Moors in Spain P—164

চতুর্দশ অধ্যায়

উমাইয়া বংশের পতন

[**সার সংক্ষেপ :** সূচনা ❑ উমাইয়া বংশের পতন।]

স্পেনে রাজকীয় ক্ষমতার জোয়ার-ভাঁটার গতিপ্রকৃতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। শক্তিশালী আমির, খলিফা অথবা হাযিবের উপর নির্ভর করিত রাজ্যের উন্নতি, সমৃদ্ধি ও জনগণের নিরাপত্তা ও শান্তি। বংশীয় রাজতন্ত্র হইলেও এখানে দুর্বল ও কমশক্তি সম্পন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে শাসনব্যবস্থা শান্তির সহিত পরিচালনা করা খুবই দুরূহ ছিল। আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বৈদেশিক আক্রমণের জন্য স্পেনের সিংহাসন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। বিশেষ করিয়া, আরব, অনারব, বার্বার, নওমুসলিম, শ্লাভ আদি স্পেনীয়দের স্বার্থের সংঘাত ও গোত্রকলহে শাসক ও শাসিত উভয়ের নিকট স্পেনকে সময়ে সময়ে মহাদুর্যোগপূর্ণ বলিয়া মনে হইত। প্রতাপশালী আবদুর রহমান (৩য়) ও অপরাজেয় সমরনায়ক হাযিব আল মনসুর যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁহাদের শান-শওকত জনমনে টিকাইয়া রাখেন। তাঁহাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা। স্বার্থপর ব্যক্তিগণ জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিয়া ব্যক্তিস্বার্থের অস্ত্র দিয়া স্পেনের কেন্দ্রীয় অখণ্ড শক্তিকে খণ্ড বিখণ্ড করিতে শুরু করে। আল মনসুর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হইয়া এক সময় খলিফা হিশামকে উৎখাত করিবার পরিকল্পনা করেন। যদিও সত্যিকারের ক্ষমতা বলিতে যাহা বুঝায় তাহার কিছুই হিশামের ছিলনা। হয়তবা খলিফা শব্দটির প্রতি আল মনসুরের মোহ ছিল। তবুও তিনি আল মনসুর উপাধি গ্রহণ করেন যাহা একমাত্র খলিফাদেরই উপাধি। ভালমন্দ বিচার করিয়া তিনি তাঁহার উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। তবে হাযিব পদটি তাঁহার বংশের জন্য পাকাপোক্ত করিয়া যান। তিনি আবদুল মালিককে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান এবং খলিফার আনুষ্ঠানিক অনুমোদন লাভ করেন। ১০০২ সালে আল মনসুরের মৃত্যুর পর আবদুল মালিক আল মোজাফফর উপাধি গ্রহণ করিয়া স্পেনের হাযিব পদে অধিষ্ঠিত হন। হাযিব আবদুল মালিক পিতার ন্যায় যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ রাজনীতিক ছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য শাসন ব্যবস্থায় স্পেন পূর্ব গৌরব অম্লান রাখিতে সক্ষম হয়। ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষি শিল্পে প্রভূত উন্নতি হয়। অর্থাৎ তাঁহার ৬ বৎসরের শাসনে স্পেনের খ্যাতি অক্ষুণ্ন ছিল।

তিনি খ্রিস্টানদের সহিত মোকাবেলার জন্য সৈন্যবাহিনীকে পুনর্গঠন করেন। আবদুল মালিক আফ্রিকা হইতে উন্নতমানের সৈন্য ও অশ্ব সংগ্রহ করেন। তিনি তাঁহার পিতার অনুসৃত সামরিক নীতি অনুসরণ করেন। বৎসরে দুইবার করিয়া খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১০০৩ সালে কাতালোনীয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া অতি সাফল্যের সঙ্গে তাহাদিগকে পরাজিত করেন। ১০০৭ সালে প্যাম্পপ্লোনা ও ক্যাষ্টাইলের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করিয়া অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেন। তাঁহার এই উপর্যুপরি সাফল্যে রাজধানী কর্দোবায় দেখা দেয় বিজয় উৎসব। তিনি কেবল সমরক্ষেত্রেই দক্ষ ছিলেন তাহা নহে বরং জ্ঞান বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায়ও যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন। প্রখ্যাত বিচারক আবু জাকেন, জ্ঞানীপ্রবর খালাফ বিন মারওয়ান, কীর্তিমান কবি সুলাইমান বিন মেহরান, জ্ঞানতাপস আবু ওমর আহমদ বিন আবদুল্লাহ প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ তাঁহার দরবারকে অলংকৃত করেন। যুদ্ধবিগ্রহে সফলতা, আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় দক্ষতা, প্রজাকল্যাণে মহানুভবতা ও জ্ঞান অনুশীলন ও পৃষ্ঠপোষকতা তাঁহাকে বিশেষভাবে স্মরণীয় করিয়া তোলে। ১০০৮ সালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা আবদুর রহমান হিশামের অনুমোদন লইয়া হাযিব পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহাকে ছোট স্যাংকো বলা হইত। ডজি বলেন যে তাঁহার মাতা স্যাংকোর কন্যা ছিলেন। হাযিবের পদে সমাসীন হওয়ার পূর্বে তিনি খলিফার দেহরক্ষীবাহিনীর ক্যাপটেন ছিলেন। খলিফা মনে করিয়াছিলেন যে যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার গুণে তিনি তাঁহার পিতা ও ভ্রাতার ন্যায় সুনাম অর্জন করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা হয় নাই। এই নূতন হাযিব ছিলেন অত্যধিক ক্রীড়ামোদী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। দিবসে রাজকার্যে মনোনিবেশ করিতেন ঠিকই কিন্তু দিনাবসানে এমন আমোদ প্রমোদে লিপ্ত থাকিতেন যাহা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য মোটেই কল্যাণকর ছিল না। রাজকার্য পরিচালনা, যুদ্ধবিগ্রহ ও জ্ঞান অনুশীলন কোনটাই তাঁহার যেন মনঃপূত ছিল না। আমোদ-প্রমোদে নিমজ্জিত থাকিবার ফলে তাঁহার চারিত্রিক অধঃপতন দ্রুতগতিতে শুরু হয়। রাজকোষে সঞ্চিত বিপুল অর্থ তিনি অপচয় করতে শুরু করেন। ইহাতে কর্দোবার জনগণ ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। তাঁহার অযোগ্যতা, অকর্মণ্যতা, বিলাসিতা ও অমিতাচারের ফলে জনগণ তাঁহাকে শত্রু হিসাবে পরিগণিত করে। আরব, শ্লাভ, বার্বার ও খ্রিস্টান সৈন্যদের প্রভাব রাজদরবারে বৃদ্ধি পায়। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী ও শিল্পের ক্ষেত্রে তাহাদের প্রধান্য বৃদ্ধি পাওয়াতে জনগণের বিক্ষোভ আরও তীব্র হয়। আবদুর রহমানের দূরাচারে উলামাগণ বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট হন। কারণ এই ইন্দ্রিয়পরায়ণ হাযিবকে তাঁহারা কোনক্রমেই বরদাশ্‌ত করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু হাযিব সৈন্যদিগকে শিরস্ত্রাণের পরিবর্তে উলামাদের উষ্ণীব পরিধান করিবার নির্দেশ দেন। ইহাতে উলামাগণ আরও ক্ষিপ্ত হন। অর্থাৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে স্পেনে পরিদৃষ্ট হয় এক চরম অরাজকতা ও বিপ্লাবাত্মক অবস্থা। মোট কথা এই সময় হইতে শুরু হয় উমাইয়া বংশের পতন। ১০০৮ হইতে শুরু করিয়া ১০৩১ সালের মধ্যে স্পেনের সিংহাসন এক রক্তক্ষয়ী ও ধ্বংসযজ্ঞের নির্মম প্রবাহের মাধ্যমে এক অদ্ভুত বস্তুতে পরিণত হয়। খলিফা ও প্রভাবশালী সৈন্যবাহিনী এই সিংহাসনকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিতে শুরু করে।

বার্বার ও শ্লাভগণ সৈনিকবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং তাহারাই দুর্বল খলিফাদের নিয়োগ ও অপসারণের কাজটি নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য করিতে থাকে। শ্লাভ ও বার্বারগণ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিয়া নিজেদের হীন স্বার্থ উদ্ধার করে। তাঁহারা অসহায় খলিফাদিগকে নিহত করিয়া রাজধানী ব্যাপকভাবে লুণ্ঠন করে। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বলিতে সব কিছুই তাহাদের মর্জির উপর নির্ভর করিতে থাকে। এই দুই শ্রেণীর সৈন্য ও তাহাদের নেতারা অতিশয় লোভী হইয়া উঠে। তাঁহারা রাজকোষ নিঃশেষ করিয়া রাজপ্রাসাদের মূল্যবান পাথর, স্বর্ণ ও মূল্যবান ধাতুগুলি পর্যন্ত খুলিয়া বিক্রয় করে। খলিফা আন নাসিরের সাধের আজ-জাহরা প্রাসাদ ব্যাপকভাবে লুণ্ঠন করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে। 'আজ জাহরা' প্রাসাদও অনুরূপভাবে লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়। প্রকৃত পক্ষে যে বার্বার ও শ্লাভগণের বাহুবলে স্পেনের গৌরব সমগ্র ইউরোপে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে সেই বার্বার ও শ্লাভদের হীন স্বার্থের ফলে এই গৌরবের অবসান ঘটে এবং স্থাপত্যশিল্পকলার ধ্বংস সাধিত হইয়া সমগ্র বিশ্বে বিস্ময় ও কৌতূহল সৃষ্টি করে। বার্বারদের নির্মম ধ্বংসযজ্ঞের কাহিনী সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ এক করুণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "আজ জাহিরা" বিধ্বংস করিয়া বার্বারগণ এই শহরে অগ্নিসংযোগ করে এবং নিমিষেই ইউরোপের অন্যতম সুরম্য নগরী একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।'[১] কর্দোবা নগরীসহ চতুষ্পার্শ্বস্থ জনপদগুলিও বার্বারগণ ব্যাপকহারে লুণ্ঠন করে। একদা যে নগরী ছিল সৌন্দর্যের লীলাভূমি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের লালনভূমি সেই নগরী এখন বার্বার ও শ্লাভদের হত্যা, ধ্বংস অগ্নিসংযোগের বধ্যভূমি। জনপদগুলি জনশূন্য, প্রাসাদগুলি নিরাভরণে উলংগ, রাজকোষ শূন্য। সড়কগুলি দস্যু উপদ্রবে পরিপূর্ণ। প্রদেশগুলি স্বাধীন কিন্তু রাজনৈতিক গোলযোগে জনজীবন বিপদাপন্ন। বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী তাহাদের বুভুক্ষু রাজনৈতিক ক্ষুধা লইয়া কর্দোবার সিংহাসন অধিকার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। বেশ কয়েক বৎসরব্যাপী চলে এই অরাজকতাপূর্ণ অচলাবস্থা। অবশেষে কর্দোবার গণ্যমান্য ও অভিজাত শ্রেণীর নাগরিকগণ দ্বারা নির্বাচিত কর্দোবা প্রশাসন পরিষদের নেতা ইবনে উমাইয়া বংশের শেষ খলিফা হিশাম (৩য়) কে পদচ্যুত ও সপরিবারে কারারুদ্ধ করিয়া উমাইয়া বংশের খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন। কারারুদ্ধ খলিফার প্রতি তাঁহারা সামান্যতম মানবতাও প্রদর্শন করেন নাই। ভাগ্যের নির্মম পরিণতি হইয়া কারার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে একটি বাতির জন্য শেষ পর্যন্ত খলিফাকে সকরুণ প্রার্থনা জানাইতে হয়। অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে দুর্গন্ধময় শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশে কর্দোবার শেষ খলিফা হিশাম কারারুদ্ধ। এক খণ্ড রুটি ও একটু আলোর প্রার্থী। তিনি এই ভয়ংকর অবস্থা হইতে অবশেষে লেরিদাতে পলায়ন করেন এবং ১০৩৬ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এইভাবে ৭৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত উমাইয়া বংশের শেষ সূর্য ১০৩৬ সালে অস্তমিত হয়।

মধ্যযুগের মুসলমানের ইতিহাস খুবই বৈচিত্রময়। রাজতন্ত্রের সুফল আর কুফল উভয়ের সংমিশ্রণে ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি পরিপুষ্ট। শক্তিশালী, ন্যায়পরায়ণ ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন খলিফাগণ যতদিন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন ততদিন রাজ্যের উন্নতি, সমৃদ্ধি

১. Dozy Spanish Islam P—558

ও খ্যাতি সুদূরপ্রসারী ছিল। কিন্তু দুর্বল শাসকের জন্য রাজ্যের অবনতি অনিবার্য হইয়া উঠে। স্পেনের বেলায়ও এই নীতি সমভাবে পরিলক্ষিত হয়।

স্পেনে উমাইয়া শাসনের প্রথম অধ্যায় ছিল গৌরবোজ্জ্বল। তাঁহারা একতা ও সংহতির মাধ্যমে আরব, বার্বার মুজারব ও অন্যান্য গোত্র ও সম্প্রদায়ের সমবেত প্রচেষ্টায় স্পেনকে মহাশক্তিশালী করিয়া তোলেন। তাঁহারা আব্বাসীয় শক্তিকেও চ্যালেঞ্জ করিয়া এবং ফাতেমীয়দের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়া নিজদিগকে অজেয় প্রতিপন্ন করেন। উত্তরাঞ্চলের খ্রিস্টান রাজ্য লিয়োন, ক্যাস্টাইল ও ন্যাভারির বিরুদ্ধেও শক্তি পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করিয়া নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সভ্যতা সংস্কৃতিতে স্পেনের খ্যাতি ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়াতে বিস্তারলাভ করে। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় যে, এই প্রবল শক্তি, গৌরব আর শান-শওকত একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই এমনভাবে শঙ্খচূর্ণ হইয়া গেল যে সেই ধ্বংস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া তাহাদের ইতিহাস আজ আফসোসের সঙ্গে স্মরণ করিতে হয়।

৭৫৬ সালে আবদুর রহমান আদ দাখিলের সগৌরবে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আর ১০৩১ সালে হিশামের (৩য়) অসহায়ভাবে ক্ষমতাচ্যুতি, স্পেনে উমাইয়া শাসনের এই পৌনে তিনশত বৎসরের ইতিহাস সত্যই ঘটনাবহুল ও বিচিত্র। যে রাষ্ট্র এত উন্নতি ও সমৃদ্ধির দ্বারা ইউরোপ ভূখণ্ডে অন্ধকার বিদূরিত করিয়া জ্ঞানমশাল লইয়া রেনেসাঁর সূত্রপাত করিল, তাঁহার করুণ পরিণতি কেন এমনভাবে ঘটিল সেটাই আলোচ্য বিষয়।

স্পেনের সিংহাসনে ধারাবাহিকভাবে শক্তিশালী নরপতির অভাব উমাইয়া বংশের বিলুপ্তির পূর্বাভাস। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সামাজিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নতির নিশ্চয়তা সবকিছুই নির্ভরশীল ছিল যোগ্য ব্যক্তিত্বের উপর। নূতন দেশে, ভিন্নজাতি অধ্যুষিত এলাকায় উমাইয়া শক্তির বুনিয়াদ দৃঢ়করণের জন্য সদা সতর্ক দূরদৃষ্টির প্রয়োজন ছিল একান্তই অপরিহার্য। রাজশক্তির প্রভাবে জনমনে সুদৃঢ়ভিত্তিক অবিচল রাখাই রাজত্ব স্থায়িত্বের রক্ষাকবচ ছিল। এই সমস্ত অপরিহার্য বিষয়ের বিকাশ ঘটিত যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ আমির বা খলিফাদের মধ্যে। কিন্তু খলিফা হিশামের (২য়) সময় হইতে এই সমস্ত গুণাবলীর একান্ত অভাব দেখা দেয়। বাল্য অবস্থায় হিশাম প্রাসাদে অন্তরীণ জীবন যাপন করেন। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সেই অন্তরীণবাস হইতে নিজকে মুক্ত করিতে পারেন নাই। কারণ সে যোগ্যতা তাহার ছিল না। খলিফা উপাধি লইয়া সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর তিনি অতিবাহিত করিয়াছেন হেরেমের আনন্দ উপভোগে। তাহার নামে হাযিব আল মনসুর রাজ্যশাসন করিয়াছে যদিও কৃতিত্বের সঙ্গে কিন্তু হাযিব বংশও বেশিদিন সেই কৃতিত্ব অক্ষুণ্ন রাখিতে পারেন নাই ; ফলে হাযিবসর্বস্ব উমাইয়া শাসনের পতনের ঘন্টা দ্রুত বাজিতে শুরু করে। খলিফাদের দুর্বলতার সুযোগে সৈন্যবাহিনী প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের দ্বারাই খলিফার কার্যাবলী ও শেষ পরিণতি নির্ধারিত হয়। এমনিভাবে অযোগ্য, অকর্মণ্য ও দুর্বল খলিফাগণ ক্রমেই চরম ব্যর্থতার দ্বারা স্পেনে তাঁহাদের শাসনের সমাপ্তি ত্বরান্বিত করেন। তাহারা শাসনকার্যকে চরমভাবে অবহেলা করিয়া পরম নিশ্চিন্তে ভোগ বিলাসে নিমগ্ন থাকতেন। ভোগের সামগ্রী ও আয়েশের উপকরণ তাহাদিগকে ভুলাইয়া রাখিত রাজকর্ম। ফলে এই হতভাগ্য হেরেমপ্রিয় খলিফাদের জীবন

হালাক হইত নিদারুণ অসহায় অবস্থায়। ক্ষমতাশালী বার্বার অথবা শ্লাভ সৈন্যগণই এই খলিফাদিগকে সিংহাসনে বসাইত অথবা বিতাড়িত করিত, নচেৎ হত্যা করিত। অতএব এই দুর্বল খলিফাদের দ্বারা বংশরক্ষার কোন কাজই হয় নাই।

উমাইয়া শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস সামরিক বাহিনী। বাহুবলের উপর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা আর অভাব কায়েমের অবলম্বন হিসাবে সৈন্যবাহিনী বিরল ভূমিকা পালন করিত। আভ্যন্তরীণ গোলযোগ, বিদ্রোহ গৃহযুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলা স্বার্থকভাবে দমনে সৈন্যবাহিনীর ভূমিকা ছিল অগ্রণী। তাহা ছাড়া বহিঃশত্রুর সঙ্গে ক্রমাগত মোকাবেলার জন্য সৈন্য বাহিনীর প্রয়োজন অপরিহার্য ছিল। আবদুর রহমান (১ম) হইতে শুরু করিয়া। হাকাম (২য়) পর্যন্ত আমির ও খলিফাদের শক্তির তারতম্য ঘটিয়াছে, তবে শক্তির অপচয় হয় নাই। কর্দোবার প্রশাসনকে সর্বদা আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে তৎপর থাকিতে হইয়াছে। কর্দোবা, সেভিল, তলেদো, মালাগা, এলভিরা, জায়েন, সারাগোসা, এছিজা, তালভিরা, আলমেরিয়া প্রভৃতির কোন না কোন স্থানে প্রায় প্রত্যেক শাসককে বিদ্রোহ দমনে সৈন্যবাহিনী সক্রিয় সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাহা ছাড়া মুসলিম রাজ্যগ্রাসী খ্রিস্টান শক্তির সঙ্গে অবিরতভাবে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। আলহানদেক বা খন্দকের যুদ্ধে (৯৩৮) খলিফা আল নাসিরকে মারাত্মক অবস্থায় পতিত হইতে হয় খ্রিস্টানদের যৌথ জোটের নিকট। মাত্র পঞ্চাশজন অশ্বারোহীর সাহায্যে তিনি প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে তিনি নিরুৎসাহ হন নাই বরং পরবর্তীকালে সমুচিত শিক্ষা প্রদান করিয়া সমগ্র ইউরোপে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তাঁহার সামরিক প্রতিভাও ছিল যেমন অসাধারণ সামরিক বাহিনীর শক্তিও ছিল তেমনি অতুলনীয়। হাযিব আল মনসুর সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে বৎসরে দুইটি করিয়া অভিযান প্রেরণ করিয়া বিজয়ের অপূর্ব গৌরব লাভ করেন। অতএব সৈন্যবাহিনীর উপরই স্পেনের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা নির্ভর করিত। এই বিশাল ক্ষমতার অধিকারী সামরিক বাহিনী আরব, অনারব, বার্বার, শ্লাভ ও মুজারব প্রভৃতির দ্বারা গঠিত ছিল। এই মিশ্রবাহিনীর একতা ও সংহতি রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে শক্তিশালী করিবার দায়িত্ব ছিল খলিফাদের। কিন্তু দুর্বল খলিফাদের সময় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ ও বিশৃঙ্খলা ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। বার্বার ও শ্লাভদের ক্ষমতাদ্বন্দ্ব ও আরবদের আভিজাত্য সংরক্ষণ প্রভৃতিসহ বিভিন্ন সমস্যা সামরিক বাহিনীতে তীব্রভাবে দেখা দেয়। এই অবস্থার মধ্যে আবার রাজ্যের আয় হ্রাস পায় এবং ব্যয় বৃদ্ধি হয়। সৈন্যদের বেতন ও অন্যান্য ভাতা প্রদান অনিয়মিত হইতে থাকে। তখন তাহাদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং নিজের স্বার্থ হাসিলকল্পে জাতীয় স্বার্থকে বিনষ্ট করিতে শুরু করে। ক্ষমতাশালী ও উচ্চাভিলাষী পদস্থ অফিসারগণই রাজনীতিতে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করেন। তাঁহারাই এই দুর্বল খলিফাদের অভিভাবক হইয়া তাঁহাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিতে থাকেন। বার্বার প্রধান জাভী ও শ্লাভনেতা খায়রান পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া প্রাসাদ ষড়যন্ত্রকে অত্যন্ত জটিল অবস্থায় লইয়া যায়। খলিফা নিয়োগ ও বিতাড়নের ক্রীড়ায় মত্ত হইয়া এই বার্বার ও শ্লাভগণ কর্দোবার নগরীকে ধ্বংস করিয়া ফেলে। সৈন্যবাহিনীর এই হীন কার্যকলাপ রোধ করিবার জন্য কোন শক্তি ছিল না। সামরিক বাহিনীর এই উচ্ছৃঙ্খল ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ উমাইয়া বংশের পতনকে ত্বরান্বিত করিতে যথেষ্ট সহায়তা করে।

স্পেনে বসবাসকারী জনগণের মধ্যে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল। আরব, নওমুসলিম, মুজারব, স্পেনীয় খ্রিস্টান, ইহুদী, বার্বার ও শ্লাভগণ শক্তিশালী খলিফাদের সময় ও আপন আপন স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্রোহ ঘোষণা করিত। তাহাদের মধ্যে একতা ও শৃঙ্খলাবোধ অত্যন্ত শিথিল ছিল। ফলে সামান্য স্বার্থ সংঘাতে তাহারা পরস্পরে অস্ত্রের মুখোমুখী হইত। কোন একটি সাধারণ ঐক্যের বন্ধনে তাহারা নিজেদের সংহতিকে চিরস্থায়ী ও সুদৃঢ় করিতে পারে নাই। শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক যতখানি মধুর ও নিবিড় হওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। আরবগণ মনে করিতেন তাঁহারা অভিজাত ও শাসক শ্রেণীর মধ্যে অত্যন্ত কড়াকড়ি ধরনের আভিজাত্যের সীমারেখা থাকার ফলে সাধারণ মানুষ তাহাদিগকে আপন বলিয়া অন্তরে ঠাঁই দিতে পারে নাই। এই জন্যই পরবর্তীকালে এই আরব অভিজাতদিগকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হইয়াছে। আবদুর রহমান আন নাসির তাঁহাদের অত্যধিক কৌলীন্য বোধে বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিকে সৈন্যবাহিনীতে নিতান্তই কোণঠাসা অবস্থায় রাখেন এবং বিদেশী ও বিজাতীয় শ্লাভদিগকে প্রাধান্য দেন। অন্যদিকে বার্বারদের স্পেন বিজয়ে যে অবদান তাহাও কম ছিল না। তাঁহারা সংখ্যায়ও প্রচুর ছিলেন। তাহারা সর্বদা অস্ত্র প্রতিযোগিতায় এবং নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনে খুবই পটু ছিলেন। আরব আভিজাত্য তাঁহাদিগকেও ভীষণভাবে উত্তেজিত করে। তাই আরব আভিজাত্য বিনষ্ট করিতে যাইয়া তাঁহারা যে কাজটি করিয়া ফেলেন তাহা কাহারও পক্ষে মঙ্গলজনক ছিল না। বার্বারগণ আরবদের বিরুদ্ধে যাহা করেন তাহার উদাহরণ হইল, শাখায় বসিয়া সেই শাখা ছেদন। অতএব কর্তনকারী যে কর্তন শেষে ভূতলশায়ী হইবেন ইহা যেমন অবধারিত তেমনি বার্বারদের কৃত কর্মের ফলে তাঁহাদের পতনের সে নিশ্চয়তাই পরবর্তীকালে পরিদৃষ্ট হয়। শ্লাভগণের ভূমিকাও অনুরূপ ছিল। এক সময় যদিও তাঁহারা উমাইয়া বংশের জন্য স্বজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁহারা তাঁহাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখিয়া উমাইয়া শক্তি খর্ব করিবার বর্বর হিংস্রতায় যেন উন্মত্ত হইয়া উঠেন। অতএব তাঁহারাও সম্প্রদায় হিসাবে উমাইয়াদিগকে যথেষ্ট ক্ষতিসাধান করেন।

স্পেনীয় খ্রিস্টানগণ পৌনে তিনশত বৎসর উমাইয়া শাসনে একাধিকবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া খ্রিস্টান রাজ্য কায়েমের চেষ্টা করেন। বিভিন্ন উপায়ে তাঁহারা তাঁহাদের আন্দোলনের ধারা দীর্ঘকাল অব্যাহত রাখেন। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা বিফল হয় নাই এবং এই আন্দোলন অবশেষে একদিন লক্ষ্যে পৌছায়।

মুজারবগণ আরবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী ও অনুরক্ত হইলেও স্বধর্মের প্রতি তাঁহাদের আস্থা ছিল অবিচল। তাঁহারা দীর্ঘদিন যাবৎ উমাইয়া শাসনের সুফল ভোগ করিয়া শেষে খ্রিস্টান স্পেনের জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধাচারণ শুরু করেন। নওমুসলিমগণ ইস-লামের ছায়াতলে আসিবার পরও আরব আভিজাত্যের জন্য খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন। অনেক সময় তাঁহারা তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার ফলে উমাইয়াদের পতনের জন্যও সচেষ্ট হইয়া উঠেন। এইভাবে দেখা যায় যে রাজ্যের সর্বস্তরের নাগরিকদের মধ্যে উমাইয়া শক্তি ধ্বংস করিবার কাজটি দীর্ঘদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিন্তু ইসলামী হুকুমত কায়েম হয় নাই। ফলে ইসলামের মর্মবাণী

জনগণের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে নাই অথবা তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও গৃহীত হয় নাই। স্পেনে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় ও উপদলের মধ্যে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সম্প্রীতি কায়েম করা হয় নাই। এই দলগত অনৈক্য ও গৃহযুদ্ধই স্পেনে উমাইয়া রাজত্বের অবসান ঘটায়।

শক্তিশালী খলিফাগণকেও জনসাধারণের নিকট হইতে আনুগত্য আদায় করিতে হইত। কারণ বিদ্রোহী নেতাগণ প্রদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জনগণকেও বশ করিয়া ফেলিত এবং খলিফাকে বিদ্রোহ দমন করিয়া জনগণকে আবার আনুগত্যে আনা হইত। এমনিভাবে বিভিন্ন সময়ে জনসাধারণের সঙ্গে খলিফাকে বিচ্ছিন্ন করা হইত। জনগণের মধ্য স্বাধীনতাপ্রীতি থাকিলেও গণতন্ত্রের মূল্যবোধ হয়ত ছিল না। কারণ অধিকাংশ সময় দেখা যাইত বিদ্রোহী নেতাগণ তাহাদের খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য স্বাধীনতা ঘোষণা করিত। আবার খলিফাদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধেও জনগণ ক্ষিপ্ত হইয়া আন্দোলন করিত। উলামাদের নেতৃত্বে যে সমস্ত বিদ্রোহ হইত তাহার মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উমাইয়া রাজত্বের শেষ অধ্যায়ে পরিলক্ষিত হয় যে শ্লাভ ও বার্বারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য খলিফার সনির্বন্ধ অনুরোধ জনগণের নিকট কোন অনুভূতি বা কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করিতে পারে নাই। এইভাবে শাসকগণের সঙ্গে শাসিতের ব্যবধান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকায় উমাইয়া শাসন ভাঙ্গিয়া পড়ে।

উমাইয়াগণ স্পেনে সামন্তপ্রথা সৃষ্টি করিবার সাহায্য করেন। আবার আভিজাত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাষ্ট্রের সম্পদ ও অর্থের মালিকানা সামন্ত শ্রেণীর হাতে চলিয়া যায়। কতিপয় সামন্তপ্রধান ব্যতীত অধিকাংশ জনগণ শাসনের পরিবর্তে শোষণের রূপ দর্শন করে। কয়েকজন খলিফা ব্যতীত সকলেই এই সামন্ত শ্রেণীর লোকের দ্বারা নিজেদের নিরাপত্তা ও স্থায়ীত্ব কায়েম করিবার চেষ্টা করেন। এই অভিজাত শ্রেণী জনগণের সঙ্গেও সদ্ভাব বজায় রাখিতেন না। এই শ্রেণীর বৈষম্যের বিষময় ফল পরবর্তীকালে প্রকাশ পায়। জনগণ এই অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিশেষ বীতশ্রদ্ধ ও বৈরী হইয়া পড়ে। তাহারা শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। সামান্য উত্তেজনা সৃষ্টি হইলে দেখা গিয়াছে যে রাজধানীর অভিজাতদের জান ও মালের উপর জনগণের ক্রুদ্ধ আক্রমণ পতন যুগে এই দৃশ্য ঘটিয়াছে অহরহ। এই সময়ে তাঁহারা না পারিয়াছেন নিজদিগকে রক্ষা করিতে আর না পারিয়াছেন খলিফাকেও সাহায্য করিতে। ফলে উভয়ই অসহায়ের শিকারে পরিণত হইয়াছেন। খলিফার আত্মীয়স্বজনগণও রাজ অনুগ্রহপুষ্ট ছিলেন। কিন্তু বিপদের দিনে তাঁহারাও খলিফার মঙ্গলার্থে কোন উপদেশ বা আশ্রয় দিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। প্রদেশের গভর্ণরগণও খলিফার জন্য কিছুই করিতে পারেন নাই। অনেক সময় নিজেরাই সিংহাসন দখলের সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন। সিউটার আলি বিন হাম্মুদ এবং মালাগার ইয়াহয়া খলিফার সিংহাসন দখল করিয়া খলিফাকে বিতাড়িত করিবার উদাহরণ সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব সামন্ত প্রথা ও উমাইয়া বংশের পতনের জন্য কম ভূমিকা পালন করে নাই।

হাযিব আল মনসুরের উত্থান ও তাঁহার বংশের উমাইয়া শাসনভার পরিচালনা খলিফাকে দুর্বল ও ক্ষমতাহীন করিয়া ফেলে। খলিফাকে অন্তরীণ রাখিয়া রাজ্যের সর্বময়

ক্ষমতা গ্রহণ উমাইয়া শাসনের পক্ষে এক অশুভ ক্ষমতা বিলুপ্ত করিয়া খলিফাদের পতনের পথ আরও পিচ্ছিল করিয়া দেয়।

ঘন ঘন রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের ফলে উমাইয়া বংশের রাজশক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। বার্বার ও শ্লাভগণ ক্ষমতাশালী হইয়া খলিফা নিয়োগ ও অপসারণ করিতে থাকে খেয়ালখুশীমত। ২৪ বৎসরে ১০ খলিফার উত্থান পতনের ইতিহাসও তাঁহারা সৃষ্টি করে। কর্দোবার সিংহাসন রীতিমত ভয়ঙ্কর বস্তুতে পরিণত হয়। কারণ সিংহাসনে উপবেশন করিলেও নিরাপত্তা নাই এবং অপসারিত হইলেও জীবিত থাকিবার অধিকার নাই। অতএব এহেন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে জীবন মৃত্যুর ফাঁদে অনেকে বিলীন হইয়াছেন। আবদুর রহমান আদ দাখিল অথবা আবদুর রহমান আল নাসিরের মত বলিষ্ঠ নেতৃত্ব লইয়া কেহ পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করিতে পারেন নাই। প্রদেশের সঙ্গে কেন্দ্রের বিচ্ছিন্নতা উমাইয়া শক্তির প্রতি চরম মরণাঘাত। এই দুর্দিনে একতার পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতাই কেন্দ্রীয় শক্তিকে পঙ্গু করিয়া ফেলে। এই সময়ে প্রদেশে স্বাধীনতার হিড়িক পড়িয়া যায় এবং সকলেই স্বাধীন হইয়া নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাদেশিক রাষ্ট্র মোটেই শক্তিশালী ছিল না। "একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিশটির মত বংশ অনুরূপ সংখ্যক শহর বা প্রদেশে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে ; তাহাদের মধ্যে সেভিলে আব্বাসীয়, মালাগা ও আলজিসিরাসে হাম্মুদ পরিবার, গ্রানাদায় জিরিগণ, সারাগোসায় বনু হুদ, তলেদোর জুন্নুন বংশ ও ভ্যালেনসিয়া মুরসিয়া এবং আলমেরিয়ার শাসকগণ অন্যতম।"[১] এই আঞ্চলিক খণ্ড বিখণ্ডতাই উমাইয়া শক্তিকে পতনের দিকে নিক্ষেপ করে।

স্পেনের ভৌগোলিক অবস্থাও উমাইয়াগণের জন্য কিছুটা প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে। স্পেনের উত্তরাঞ্চল খ্রিস্টানদের দ্বারা অধিকৃত এবং মুসলমানদের পক্ষে মারাত্মক হুমকিস্বরূপ ছিল। লিয়োন, ক্যাষ্টাইল ও ন্যাভারির বিরুদ্ধে প্রায় প্রত্যেক শাসককে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। শক্তিশালী খলিফাগণ যদি এই রাষ্ট্রগুলিকে আত্মসমর্পণে বাধ্য না করিয়া মুসলিম রাজ্যভুক্ত করিতেন তবে তাহারা নিরাপত্তার দিক হইতে অনেক দৃঢ় হইতে পারিতেন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক হিট্টি মন্তব্য করেন যে, যদি মুসলমানেরা অষ্টম শতাব্দীতে পর্বতাকীর্ণ উত্তরাঞ্চলের খ্রিস্টান শক্তির প্রদীপ নির্বাপিত করিতেন তবে স্পেনের পরবর্তী ইতিহাস অন্য ধারায় লিপিবদ্ধ হইত।

খ্রিস্টানগণ বারংবার মুসলিম নরপতিদের নিকট পরাজিত হইয়াছে। তাহাদের এই গ্লানির কথা তাহাদের বংশধরগণ ভুলিয়া যায় নাই। তাঁহারা মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলগুলি পুনরায় জয় করিবার মানসে জোর প্রচেষ্টা চালাইতে থাকে। এই সময়ে মুসলমানদের ভ্রাতৃকলহ ও গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং এই সুবর্ণ সুযোগে তাহারাও পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মুসলমানগণ নিজেদের স্বজাতি ও স্বজনকে দমন করিবার জন্য তাহাদিগকে আমন্ত্রণ জানায় এবং তাহারাও সানন্দে নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থে সাহায্য লইয়া উপস্থিত হয়। মুহম্মদ আল মাহদী খলিফা সুলাইমানকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্য কাতালোনীয়দের সাহায্য কামনা করেন এবং খলিফাও অনুরূপভাবে ক্যাষ্টাইল ও লিয়োনদের আমন্ত্রণ জানান।

---

১. Lane Poole—Moors in Spain P—127

এইভাবে দেখা গিয়াছে যে, নিজেদের কলহ মীমাংসার জন্য খ্রিস্টানদের শরণাপন্ন হইয়া মূলতঃ নিজদিগকেই ধ্বংস করিয়াছিলেন। স্পেনে শাসনের শুরু হইতেই খ্রিস্টানগণ চরমভাবে বিরোধীতা শুরু করে। তাহারা মুসলমানদিগকে উৎখাত করিবার নিরলস চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে উমাইয়াগণ কোন মৌলিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। স্পেনের ভূমি দখল করিয়াই তাঁহারা খুশী ছিলেন, কিন্তু স্পেনীয়দের অন্তর জয় করিবার যে খুব বেশি প্রয়োজন ছিল সেইদিকে তাঁহারা সার্থক দৃষ্টি দেন নাই। স্পেন হইতে মুসলমানদের উৎখাতের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে খ্রিস্টানগণ উমাইয়াদিগকে ধ্বংস করিবার কাজটি কৌশলে সম্পূর্ণ করে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

স্পেনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বংশের রাজত্ব

[**সার সংক্ষেপ ঃ** সূচনা ❑ স্পেনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বংশের রাজত্ব ❑ কর্দোবায় বনু জাওহার ❑ আবদুল মালিক ❑ বনু হাম্মুদ মালাগা ও আলজিসিরাস ❑ গ্রানাদায় বনু জিরি ❑ আলমেরিয়া, মুরসিয়া, দেনিয়া ও বেলারিক দ্বীপপুঞ্জে ক্ষুদ্র শ্লাভ বংশ ❑ সারাগোসায় বনু হুদ ❑ তলেদোতে বনু জুন্নুন ❑ সেভিলে বনু আব্বাদ।]

স্পেনে উমাইয়া বংশের পতনের পর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ও বংশের সৃষ্টি হয়। এই রাজ্যগুলির মধ্যে (১) কর্দোবার বনু জাওহার (২) সারাগোসার বনু হুদ (৩) আলজিসিরাসে ও মালাগায় বনু হাম্মুদ (৪) গ্রানাদার বনু জিরি (৫) তলেদোর বনু জুন্নুন এবং সেভিলের বনু আব্বাদ উল্লেখযোগ্য।

কর্দোবার বনু জাওহার (১০৩১-১০৭০)

আবুল হাজ্‌ম ইবনে জাওহার উমাইয়া বংশের পতনের সময়ে রাজধানী কর্দোবার একজন জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনিই খলিফা হিশামকে (৩য়) কর্দোবার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার জন্য খলিফার অনুকূলে কাজ করিতে পারেন নাই। প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের বিষবাষ্পে কর্দোবার আকাশ যখন ধূম্রাচ্ছন্ন সেই চরম দুর্যোগ মুহূর্তে ইবনে জাওহার খলিফাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া উমাইয়া রাজত্বের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। দীর্ঘদিনের রাজত্বের অবসান ঘটাইয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সিনেট গঠন করেন। খলিফা হিশামের (৩য়) পদচ্যুতির পর সিনেটের সম্মতিক্রমে ১০৩১ সালে ইবনে জাহ্‌ওয়ার সিনেট প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়া সকল সামরিক ও বেসামরিক দায়িত্বভার সিনিটের উপর অর্পণ করেন। কর্দোবার সকল শ্রেণীর জনগণ ইবনে জাওহার নেতৃত্বে আস্থা প্রকাশ করে। কর্দোবার এই দুর্যোগ মুহূর্তে তিনি তাহার বিচক্ষণতা ও বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়া জনগণের অন্তর জয় করেন। আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হওয়ায় রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেন নাই। কারণ তিনি রাজতন্ত্রের উচ্ছেদকারী এবং প্রজাতন্ত্রের প্রবক্তা। প্রজাসাধারণের প্রতিনিধি ও নেতা হিসাবে নিজেকে পরিচিত করেন। যখন কোন সরকারী নির্দেশনামা জারি করিতেন তখন তাহা জনগণের নামেই হইত। কেহ

তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কোন কিছু প্রার্থনা করিলে তিনি বলিতেন "এই ব্যাপারে আমি মনজুর বা না-মনজুর কোনটাই করিতে পারি না, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মালিক সিনেট, আমি শুধুমাত্র ইহার সম্পাদক।" এইভাবে জনগণের মনোরঞ্জন করিয়া তিনি কর্দোবাতে তুলনামূলক শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রাজপ্রাসাদের পরিবর্তে নিজের বাড়িতেই বসবাস করিতেন। তিনি দেহরক্ষী বাহিনীর সংখ্যা যথেষ্টভাবে হ্রাস করেন এবং প্রশাসনিক অহেতুক ব্যয় এবং অপচয় বন্ধ করিয়া দেন। জনগণের জান, মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধান করেন। ফলে কর্দোবায় এবং শহরতলী ও সুদূর পল্লীতেও জনগণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা লাভ করে। রাজ্য শাসনে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন হওয়ায় দেশে আবার সুখশান্তি বিরাজ করিতে থাকে। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার, দ্রব্যমূল্য হ্রাস ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে জনপদগুলিতে আবার প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। ইবনে জাওহারকে এই সমস্ত জনকল্যাণমূলক কার্যে অনেকেই সহায়তা করেন। তন্মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে আব্বাস ও আবদুল আজিজ ইবনে হাসানের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা কর্দোবা সিনেটের সদস্য ছিলেন। মোট কথা দীর্ঘদিনের বিশৃঙ্খলা, রক্তপাত ও নিরাপত্তার অভাবের হাত হইতে জনগণ মুক্তি পায়। জাওহারের শাসনে সাফল্য ছিল যথেষ্ট। তিনি প্রতিবেশী তলেদো, সারাগোসা, মালাগা, সেভিল, গ্রানাদা প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখিবার চেষ্টা করেন। তিনি কর্দোবা প্রজাতন্ত্রের সিনেট প্রেসিডেন্ট হিসাবে কর্দোবার হৃত গৌরব কিছুটা উদ্ধার করিতে সক্ষম হন।

আবদুল মালিক

ইবনে জাওহারের মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার দায়িত্বভার তাঁহার দুই পুত্রের উপর ন্যস্ত করেন। অর্থ দফতর ও সাধারণ প্রশাসন পরিচালনার ভার অর্পিত হয় আবদুর রহমানের নিকট আর সামরিক দায়িত্বভার গ্রহণ করেন আবদুল মালিক। আবদুল মালিক অধিক ক্ষমতাশালী ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। কৃতিত্ব ও ক্ষমতায় তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে ছড়াইয়া যান। এই সময় কর্দোবার উজির ইবনে আল সাক্কা তাঁহার অসাধারণ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠেন। আবদুল মালিক এই বিজ্ঞ উজিরের সহায়তায় কিছু সময়ের জন্য কর্দোবার খ্যাতি বিস্তার করিতে সক্ষম হন। কিন্তু এই খ্যাতি ছিল স্বল্পকালীন। সেভিলের মুতামিদ কর্দোবা দখলের জন্য আল সাক্কা ও আবদুল মালিকের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করেন। এই বিরোধ মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছায়। বিজ্ঞ উজির নিহত হন এবং তাঁহার বিশিষ্ট সহযোগী ও পদস্থ অফিসারগণ আবদুল মালিককে পরিত্যাগ করে। ধীরে ধীরে কর্দোবার অবস্থা অবনতির দিকে ধাবিত হয়। ১০৭০ সালে তলেদোর মামুন কর্দোবা আক্রমণ করেন। আবদুল মালিকের অবস্থা এই সময় অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। বন্ধু ও সহকর্মীগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় তিনি নিজকে রক্ষা করিবার জন্য সেভিলের মুতামিদকে আহবান করেন। মুতামিদ মামুনকে প্রতিহত করিয়া কর্দোবা হইতে বিতাড়িত করেন। কর্দোবাবাসী মুতামিদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাদের নেতা আবদুল মালিককে ক্ষমতাচ্যুত করেন। তাঁহাকে তাঁহার পরিবার পরিজনসহ কারাগারে বন্দী করিয়া রাখেন। বৃদ্ধ জাওহার এই দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরেই মৃত্যুবরণ করেন। তবে

কর্দোবাতে মুতামিদ নিবিঘ্নে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন নাই। মামুন তাঁহার সহিত সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর ব্যাপী কর্দোবার অধিকার লইয়া ক্ষমতাদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকেন। তবে মামুনের জীবনাবসানে মুতামিদ কর্দোবায় তাঁহার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এইভাবে কর্দোবায় বনু জাওহার বংশের ক্ষমতার অবসান ঘটে।

বনু হাম্মুদ (মালাগা ও আলজিসিরাস) (১০১০-১০৫০)

মৌরিতানিয়ার ইদ্রিসীয় বংশে বনু হাম্মুদের উত্থান। হাম্মুদের বংশ তালিকা নিম্নরূপ:— হাম্মুদ মায়মুনের পুত্র, তিনি আহমদের পুত্র, তিনি আলীর পুত্র, তিনি উবাইদুল্লাহর পুত্র, তিনি উমরের পুত্র এবং উমর ইদ্রিসের পুত্র। হাম্মুদ হাযিব আল-মনসুরের শাসনকালে আফ্রিকা হইতে পলায়ন করিয়া কর্দোবায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। মনসুর তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। হাম্মুদের দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র কাসিম পরবর্তীকালে আলজিসিরাসের গভর্ণর পদ লাভ করেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র আলী সিউটা ও তানজিয়ারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। জনগণের আমন্ত্রণক্রমে ১০১৫ সালে আলি মালাগা অধিকার করিয়া অপদার্থ খলিফা সুলায়মান আল মুসতাইনকে পদচ্যুত করিয়া কর্দোবা দখল করেন। পরবর্তীকালে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হইয়া তিনি তাঁহারই অনুচর কর্তৃক নিহত হন। ১০৮৮ সালের মার্চে তাঁহার ভ্রাতা কাসিম কর্দোবার সিংহাসন দখল করেন। কিন্তু তিনিও বেশিদিন সিংহাসনে উপবেশন করিতে পারেন নাই। আলির পুত্র ইয়াহয়া ১০২১ সালে তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া নিজেই সিংহাসন দখল করেন। তিনি অবশ্য কৌশলে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া নিজেই সিংহাসন দখল করিয়া ১০১৮-২১ ও ১০২২-২৫ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পিতৃব্যের মৃত্যুর পর ইয়াহয়া মালাগা ও আলজিসিরাস অধিকার করেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী, যোগ্য ও সুদক্ষ শাসনকর্তা ছিলেন। আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমন করিয়া দেশের সুখ সমৃদ্ধি আনয়ন করেন। বহির্দেশেও তাঁহার সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। সেভিল অধিপতি কাজী কাসিমের জ্যৈষ্ঠ পুত্রকে ইয়াহয়ার দরবারে জামিনস্বরূপ পাঠাইতে বাধ্য করেন। তিনি এত বেশি শক্তিশালী ও উচ্চাভিলাষী হইয়া উঠেন যে, বার্বার প্রধানের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়া আরবদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী জোট সৃষ্টি করেন। সেভিল ও কর্দোবাকে পর্যন্ত সন্ত্রস্ত করিয়া তোলেন কিন্তু বার্বারদের সঙ্গে তাঁহার ঐক্যজোট দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। বার্বারগণ আত্মকলহে লিপ্ত হইয়া পড়ে এবং ইয়াহয়া ১০৩৫ সালে সেভিল আক্রমণ করিলে তিনি অত্যন্ত অসহায়ভাবে কাসিমের পুত্র ইসমাইল কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন।

ইয়াহয়ার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা ইদ্রিস (১ম) মালাগাতে এবং মুহাম্মদ আলজিসিরাসের অধিপতি হন। ইদ্রিস অত্যন্ত বিচক্ষণ সমরনায়ক ছিলেন। তিনি অবিলম্বে ইসমাইলের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। যুদ্ধে ইসমাইল পরাজিত ও নিহত হন। তিনিও বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর মালাগাতে যোগ্য উত্তরাধিকারীর আবির্ভাব ঘটে নাই। ১০৫৭ সালের মধ্যে একে একে ছয় জন মালাগার সিংহাসনে আসেন। অনুরূপভাবে ১০৫৮ সালে আলজিসিরাসের সিংহাসনও দুর্বল শাসকদের হস্তগত হয়। ফলে মালাগা গ্রানাদার অধীনে এবং আলজিসিরাস সেভিলের অধীনে চলিয়া যায়। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে মালাগা ও আলজিসিরাসে দ্রুত রাজনৈতিক উত্থান ও পতন ঘটে। বার্বারদের

প্রভুত্ব এখানেও কায়েম হয় এবং কিছু সময়ের জন্য তাঁহারাও দেশের শাসনকর্তা হয়। তাহাদের অবাধ ক্ষমতা ও প্রভাব রাজবংশের মধ্যে শান্তি বিনষ্ট করে। শেষের দিকে ইদ্রিস (২য়) (১০৪২-৬) (১৫৬৩-৫) দানশীল ও মহানুভবতায় বেশ খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু দুর্বলতাই তাঁহার শাসন ক্ষমতাকে স্থায়ী রাখিবার পথে বিরাট প্রতিবন্ধক হইয়া দেখা দেয়। তিনি এত দানশীল ছিলেন যে প্রতিদিন ৫০০ স্বর্ণমুদ্রা দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতেন। প্রাসাদ ষড়যন্ত্রকে তিনি নির্মূল করিতে পারেন নাই। এইজন্য তাহাকে দুইবার করিয়া সিংহাসনে বসিতে হয়।

মালাগা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। এখানে বিভিন্ন কলকারখানা গড়িয়া উঠে তন্মধ্যে জাহাজ নির্মাণ কারখানাই উল্লেখযোগ্য। এই জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রকে দার-উস-সানা বলা হইত।

গ্রানাদায় বনু জিরি (১০১২-১০৯০)

গ্রানাদাতে জিরি বংশ প্রতিষ্ঠিত হয় বার্বার প্রধান জাভী বিন জিরি কর্তৃক। এই বংশ ১০১২ সাল হইতে ১০৯০ সাল পর্যন্ত গ্রানাদায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন।

উত্তর আফ্রিকার সানহাজা বার্বার গোত্রের একটি শাখা হইল জিরি বংশ। জিরি বংশের বুলুঘাঘীন ও আল মনসুর নামক দুইজন যুবরাজ তাঁহাদের শাসকের সঙ্গে মতানৈক্য ঘটাইয়া বিদ্রোহী বার্বার দলপতি জাভীর সঙ্গে মিলিত হন। তাঁহারা বিপুল সংখ্যায় আফ্রিকা হইতে স্পেনে আসিয়া জাভীর নেতৃত্বে সমবেত হন। হাযিব আল মনসুরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আবদুল মালিক আল-মোজাফফর হাযিব পদে অভিষিক্ত হন। তিনিও পিতার ন্যায় রণকুশলী ছিলেন। তিনি এই বিপুল সংখ্যক বার্বারদিগকে তাঁহার সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করেন। বিশ্বস্ততায় ও রণকুশলতায় বার্বারগণ হাযিবের প্রিয় পাত্র হইয়া উঠেন। তাঁহারা সৈন্যবাহিনী ও বেসামরিক রাজনীতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে খলিফা সুলায়মান আল মুসতাইনের সময় তাঁহারা এলভিরাতে জায়গীর লাভ করেন।

জাভী

জাভী প্রথমে তাঁহার দলবল লইয়া এলভিরাতে জায়গীরদারী করিতে থাকেন। পরে এলভিরাতের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করেন এবং উমাইয়া বংশের খিলাফত দ্বন্দ্বের সুযোগে তিনি গ্রানাদা দখল করিয়া সেখানে আপন প্রভুত্ব সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইতিপূর্বে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে তাঁহার ভূমিকা আমরা অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তিনি খলিফাদের উত্থান পতনের নায়করূপে কাজ করেন। তিনি ছিলেন ফাতেমীয় মতানুসারী। তিনি তাঁহার মতবাদ পূর্ব স্পেনে বিস্তার করেন। কিন্তু জানতাহ গোত্র ফাতেমী বিরোধীদল হিসাবে মধ্য ও পশ্চিম স্পেনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। গ্রানাদায় জিরি গোত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া জাভী তাঁহার ভ্রাতৃষ্পুত্র হাব্বাস বিন মাকসানকে সিংহাসন অর্পণ করিয়া আফ্রিকায় প্রত্যাবর্তন করেন।

হাব্বাস

সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হইয়া হাব্বাস হাযিব সাইফুদ্দৌলা উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি স্বাধীনভাবে গ্রানাদার শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি শক্তিশালী, সাহসী ও স্থাপত্যশিল্পানুরাগী শাসনকর্তা ছিলেন। সুদীর্ঘ ১০ বৎসর ধরিয়া তিনি রাজত্ব করেন। তিনি জায়েন ও ক্যাবরা অধিকার করেন এবং প্রতিবেশী রাজবংশের সাথে সখ্যতা স্থাপন করেন। তাহার রাজত্বকালে গ্রানাদায় প্রাসাদ, মসজিদ ও অন্যান্য মনোরম ভবন নির্মিত হয়। তিনি ১০৩৮ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

প্রধানমন্ত্রী সামুয়েল

সামুয়েল নামক হাব্বাসের প্রধানমন্ত্রী তদানীন্তনকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন। তিনি জাতিতে ইহুদী ছিলেন। অত্যন্ত জঘণ্য অবস্থা হইতে তিনি সাধনা ও সংগ্রাম করিয়া গৌরবের শিখরে আরোহণ করেন। সামান্য দোকানদার হিসাবে তাঁহার কর্মজীবনের শুরু। হাব্বাসের উজির আবদুল কাসেম ইবনে আরিফ সামুয়েলের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নিজের সহকারী হিসাবে নিয়োগ করেন। মুসলিম স্পেনে তিনি প্রথম এবং শেষ ইহুদী উজির। তিনি জ্ঞানী এবং বিচক্ষণ ছিলেন, তাই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রাজকার্য পরিচালনা করিয়া জনগণের কল্যাণ সাধন করেন। তাঁহার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাকে ১০২৭ সালে নাজিদ রাজকীয় উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি কবি, লেখক ও দার্শনিক ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য পারস্য, প্যালেষ্টাইন ও মিসর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। তিনি ১০৫৫ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সামুয়েলের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইউসুফ উজির হন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল রাজক্ষমতা দখল করিয়া ইহুদী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। তিনি প্রকাশ্যে কোরআন ও ইসলাম সম্পর্কে আপত্তিকর উক্তি করেন, ফলে মুসলিমগণ ক্ষিপ্ত হইয়া ১০৬৬ সালে ৩০০০ ইহুদীসহ তাঁহাকে হত্যা করে। এই হত্যার জন্য এলভিরার বিখ্যাত আরব ফকিহ ও কবি আবু ইসাহাক নেতৃত্ব দেন।

বাদিস

পিতার পর বাদিস ১০৩৮ সালে গ্রানাদার সিংহাসনে উপবেশন করেন। তাঁহার রাজত্বকাল ছিল দীর্ঘস্থায়ী এবং উন্নত সমৃদ্ধ ও গৌরবে সুদূরপ্রসারী। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে সুদীর্ঘ ৩৫ বছর রাজত্ব করেন (১০৩৮-১০৭৩)। বাদিসের সঙ্গে আলমেরীয়ার শাসনকর্তা জোহাইরের সদ্ভাব ছিল না। কারণ উভয় নরপতিই ছিলেন যোগ্য, দক্ষ এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির লালনকর্তা। তাহা ছাড়া বাদিসের মন্ত্রী সামুয়েল ও জুহাইরের মন্ত্রী ইবনে আব্বাসও জ্ঞান বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ও সমঝদার হিসাবে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আলমেরীয়াতে জুহাইর ও তাঁহার মন্ত্রী জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি এতদূর পর্যন্ত করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের রাজকীয় লাইব্রেরীর গ্রন্থ সংখ্যা এক লক্ষে উপনীত হয়। পরস্পর কোন্দল ও দ্বন্দ্ব না করিয়া বাদিস জোহাইরের সংগে বন্ধুত্ব স্থাপনকল্পে তাঁহাকে গ্রানাদায় আমন্ত্রণ জানান ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, জুহা এই বন্ধুত্বপূর্ণ আমন্ত্রণের সাড়া দেন

সামরিকবাহিনী লইয়া আক্রমণাত্মক তৎপরতায়। জুহাইর, বাদিস ও তাঁহার জনগণকে অন্যায়ভাবে অপমানিত করেন। এই আক্রমণাত্মক ও অসৌজন্যমূলক বৈরীভাবে বাদিসের সৈন্যগণ ক্ষিপ্র হইয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাবর্তন পথে আলপুনতি গিরিপথ আক্রমণ করেন। এইবার জুহাইর ও তাঁহার সৈন্যদল অত্যন্ত বিপদের সম্মুখীন হন এবং যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে অসংখ্য সৈন্যসহ তিনি ১০৩৮ সালে নিহত হন। ইবনে আব্বাসও রেহাই পান নাই। তিনিও ধৃত হইয়া নিহত হন। ভ্যালেনসিয়া অধিপতি আল মনসুর আলমাঘামিরি কর্তৃক আলমেরীয় অধিকৃত হয়।

এই সময় বাদিসকে আরও কয়েকটি আভ্যন্তরীণ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। আবুল ফাতাহ্ নামক একজন আরব ভাগ্যান্বেষী সাহিত্যিক ও দার্শনিক এবং সুদক্ষ সৈনিক এই সময় জুরজান হইতে গ্রানাদায় আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। তিনি বহু স্থান ও দরবার ঘুরিয়া শেষ পর্যন্ত গ্রানাদায় অধ্যাপনা শুরু করেন। রাজক্ষমতা দখলের লিপ্সাও তাঁহার কম ছিলনা। তিনি সুযোগমত বাদিসের ভ্রাতুষ্পুত্র ইয়াসিরকে বাদিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তোলেন। কিন্তু বিদ্রোহ্ পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই বাদিস গুপ্তচরের মাধ্যমে সমস্ত সংবাদ অবগত হন। তারপর ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইয়াসিরসহ অনেকেই গোপনে পলায়ন করিয়া সেভিলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু আবুল ফাতাহ্ পলায়নের সুযোগ না পাওয়ার ফলে তাঁহাকে ১০৩৮ সালে হত্যা করা হয়। ইহা ব্যতীত বাদিস বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত তদীয় ভ্রাতা বুলঘাগীনকে হত্যা করেন।

বাদিস সেভিল ও ভ্যালেনসিয়ার বাহিনীকেও পরাজিত করিয়া তাহাদের কতিপয় অঞ্চল দখল করেন। তিনি ১০৫৮ সালে মালাগার হাম্মুদ বংশকে পরাজিত করিয়া মালাগা তাঁহার রাজ্যভুক্ত করেন। সেভিলের উদীয়মান আরব শক্তিকেও তিনি প্রতিহত করিয়া গ্রানাদার স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষা করেন। তিনি আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বহিঃশত্রুদের আক্রমণ হইতে গ্রানাদা রাজ্যকেও বিপদমুক্ত করিয়া শাসনব্যবস্থাকে সুসংহত ও প্রশংসনীয় করিয়া তোলেন। তিনি প্রখ্যাত দারদিক আল রিহ্ প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তাঁহার সময় সেতু সড়ক ও অন্যান্য সরকারী ভবন নির্মিত হয়। তিনি নৃশংস ও নিষ্ঠুর ছিলেন, কিন্তু তাঁহার নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা তাঁহার বংশের স্থায়িত্বের জন্যই পরিচালিত হইয়াছিল। তিনি ১০৭৩ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বাদিসের বংশধরগণ

বাদিসের মৃত্যুর পর তাঁহার শাসনক্ষমতা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়ে। গ্রানাদার শাসনভার পরিচালনা করেন তামিম ও মালাগার অধিপতি হইলেন আবদুল্লাহ। উভয়েই বাদিসের পৌত্র ছিলেন। স্পেনে মুসলিম ইতিহাসের এই সময়টি ছিল অত্যন্ত সংকটময়। কারণ মুসলিমদের অনৈক্য ও ভ্রাতৃকলহের সুযোগ লইয়া খ্রিস্টানগণ তাহাদের সুসংহত শক্তি লইয়া ব্যাপক আক্রমণ চালায় মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায়। তাহাদের প্রবল ও দুর্বার শক্তির গতিমুখে মুসলমানদের শহর ও নগরগুলি একের পর এক হস্তচ্যুত হইতে থাকে। স্পেনের মুসলমানগণ এইবার ভয়ানক বিপদে নিপতিত হন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহারা

আফ্রিকা হইতে ইউসুফ বিন তাশফিনকে আমক্রণ জানান। খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে অভিযানে তামিম ও আবদুল্লাহ ইউসুফ বিন তাশফিনের সঙ্গে যোগ দেন। ১০৮৬ সালে মুসলিম সম্মিলিত বাহিনী আলফানসো (৬ষ্ঠ) কে ভীষণভাবে পরাজিত করেন। আবদুল্লাহ্‌র দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতার সুযোগ লইয়া কাজী আবু জাফর তাঁহাকে ভীষণ বিপদাপন্ন করিয়া তোলেন। ইউসুফ বিন তাশফিন স্পেনে দ্বিতীয় অভিযানকালে গ্রানাদার আত্মকহল ও গোলযোগের সুযোগ গ্রহণ করেন। ১০৯০ সালে গ্রানাদা ও মালাগা আবদুল্লাহ ও তামিমের হস্তচ্যুত হইয়া যায়। এইভাবে গ্রানাদায় তাঁহাদের পতন ঘটে।

আলমেরিয়া, মুরসিয়া, দেনিয়া ও বেলারিক দ্বীপপুঞ্জে ক্ষুদ্র শ্লাভ বংশ (১০১৩-১১১৫)

সমগ্র স্পেনের কিছু অংশ বার্বার, কিছু অংশ শ্লাভ ও অবশিষ্টাংশ আরবদের দ্বারা খ্রিষ্টিয় ১১ শতকে শাসিত হইতেছিল। এই তিনটি দলের মধ্যে অনৈক্য, দ্বন্দ্ব ও গোলযোগ সর্বদাই বিরাজ করিত। বার্বারগণ দক্ষিণাঞ্চলে এবং আরবগণ পূর্বাঞ্চলে ও কেন্দ্রভূমিতে তাঁহাদের আধিপত্য কায়েম রাখেন। অপরদিকে শ্লাভগণ দক্ষিণ--পূর্বাঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকে। তাহারাও একজন নেতার অধীনে সংঘবদ্ধ হইয়া রাজত্ব করে নাই। আল-মেরিয়াতে খায়রাণ (মৃ. ১০৮২) মুরসিয়াতে জুহাইর (মৃ. ১০৩৮), দেনিয়া ও বেলারিক দীপপুঞ্জে মুজাহিদ (মৃ. ১০৪৫) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বংশে বিভক্ত হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এই সমস্ত রাজবংশের মধ্যে মুজাহিদই ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে শ্লাভগণ তাহাদের শক্তি, সামর্থ ও অর্থ অপচয় করিয়া আত্মকলহ, ষড়যন্ত্র ও খ্রিস্টানদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করিয়া স্পেনে মুসলিম শাসন উচ্ছেদকল্পে ১১শ শতকের মাঝামাঝিতে শক্তিশালী হইয়া নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করে। একাদশ শতকের শেষার্ধে বার্বার ও আরব-গণ কর্তৃক তাহাদের আধিপত্য খর্ব হয় এবং তাহারা ক্ষমতাচ্যুত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ কিছু সময়ের জন্য তাহারা সামরিক শক্তি ও অর্থ দ্বারা মুসলমানদের সার্বিক ক্ষতির প্রকল্প তৈয়ার করে। তবে তাহাদের দ্বারা প্রকল্পের কাজ শুরু হইলেও তাহারা উহা শেষ করিতে পারে নাই।

সারাগোসায় বনু হুদ (১০১০-১১১৮)

উত্তরাঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় স্পেন বিজয়ের পর বার্বারগণকে জায়গীর প্রদান করা হয়। এই অঞ্চলগুলি ছিল খ্রিস্টানদের লুণ্ঠতরাজ এলাকাধীন। আবদুর রহমান (৩য়) আরাগণে মুসলিম আধিপত্য কায়েম করিয়া বার্বার সেনাপতি মহাম্মদ বিন হাশিম বিন আবদুর রহমান আত-তাজিবিকে গভর্ণর নিযুক্ত করেন। বংশানুক্রমিকভাবে তাঁহারা সেখানে রাজত্ব করিতে থাকেন। উমাইয়া খিলাফতের পতনের সময় এবরো উপত্যকায় মুহাম্মদ মনজির স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে রাজত্ব করিতে থাকেন (মৃ. ১০২০)। তিনি যোগ্য ও শক্তিশালী নরপতি ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ যথা ইযাহার, মুনজির (২য়) ও আবদুল্লাহ অকর্মণ্য ও দুর্বল ছিলেন। গৃহযুদ্ধ করিয়া আরও হীনবল হইয়া পড়েন।

পরিশেষে আবু আইয়ুব সোলায়মান বিন মুহাম্মদ বিন হুদ সারাগোসা দখল করিয়া আল মুসতাইন উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। আরব বংশোদ্ভূত এই হুদ পরিবার লেরিদা, কালাতাদ এবং তুদেলা সহ সারাগোসায় ১০১৮ সাল পর্যন্ত অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে রাজ্যশাসন পরিচালনা করেন।

আবু আইয়ুব সুলায়মান তাঁহার পুত্রদেরকে বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। তিনিও খ্রিস্টানদের সহায়তায় নিজের স্বাধীনতাকে রক্ষা করিয়া চলেন। তাঁহাদের গৌরবময় রাজত্বের বর্ণনা বিস্তারিত পাওয়া যায় না। যাহা হউক, ১০৪৬ সালে সুলায়মান মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পুত্র আহমদ আল-মুক্তাদির-আদদৌল্লা সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসর ধরিয়া সারাগোসাতে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁহার বংশধরগণ শক্তিশালী না হওয়ায় সারাগোসায় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। শুধু তাহাই নহে, খ্রিস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সখ্যতা করিয়া যে স্বাধীনতা হুদ বংশ প্রতিষ্ঠিত করেন তাহার নির্মম পরিসমাপ্তি খ্রিস্টানদের দ্বারাই ঘটে। ১১১৮ সালে রামিরো সারাগোসা দখল করিয়া মুসলিম শাসন উচ্ছেদ করেন। খ্রিস্টানদের অধিকৃত সারাগোসার মুসলিম স্থাপত্যকীর্তি জাফরিয়া প্রাসাদ ও মসজিদের তোরণের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়।

তলেদোতে বনু জুন্নুন (১০৩৫-১০৮৫)

বার্বার গোত্রের হাওয়ারাহ শাখা সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরব্যাপী স্বাধীনভাবে তলেদোতে রাজ্যশাসন পরিচালনা করেন। তাঁহারা স্পেন বিজয়ের সময় আফ্রিকা হইতে স্পেনে চলিয়া আসেন এবং মুহাম্মদ (১ম) ও আবদুল্লাহর সময় তলেদোর সন্নিকটে গোয়াদিয়ানা নদীর তীরে সানতাবারিয়াতে প্রচণ্ড গোলযোগ সৃষ্টি করেন। ঐ অঞ্চলে তাঁহারা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন। হাযিব আল মনসুর তাঁহাদের বহু নেতাকে নিজ সৈন্যদলভুক্ত করেন। সামরিক ও বেসামরিক দফতরে তাঁহারা উচ্চপদে অনেকেই সমাসীন ছিলেন। ফলে উমাইয়া বংশ পতনের পর তলেদোতে তাঁহারা পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। আবদুর রহমান বিন আমির বিন মুতারিফ বিন জুন্নুন সানতাবারিয়া হইতে তদীয় পুত্র ইসমাইলকে তলেদোতে শাসনভার পরিচালনার জন্য প্রেরণ করেন। ইসমাইল সমস্ত প্রতিবন্ধকতা উচ্ছেদ করিয়া আজ-জাফর উপাধি গ্রহণ করিয়া তলেদোর সিংহাসন দখল করেন। তিনি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিরসন করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। ১০৪৩-৪৪ সালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর যোগ্য পুত্র ইয়াহয়া 'আল মামুন' উপাধি লইয়া সিংহাসনে উপবেশন করেন। ইয়াহয়া আল মামুনই বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক। সুদীর্ঘ ৩২ বৎসর ব্যাপী তলেদোর শাসনভার পরিচালনা করেন। মামুনকে ওয়াদি আল হাজারাহ দখল লইয়া সারাগোসার বনু হুদ বংশের সুলায়মানের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হয়। যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়া আলভিরায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ক্যাষ্টাইল ও লিয়োনের রাজা ফার্ডিনাণ্ডের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। তিনি তাঁহার সেনাবাহিনীতে খ্রিস্টানদের নিয়োগ করিয়া নিজেকে সামরিক দিক হইতে শক্তিশালী

করেন। খ্রিস্টানগণ ভ্যালেনসিয়া আক্রমণ করিলে তিনি আবদুল মালিক আল মোজাফফরকে সাহায্য করেন। খ্রিস্টানগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিতাড়িত হইলে তিনি ১০৬৫ সালে নিজেই ভ্যালেনসিয়া অধিকার করেন। তিনি এতদূর শক্তিশালী হইয়া উঠেন যে মুরসিয়া দখল করিয়া কর্দোবা আক্রমণ করেন। সেভিল অধিপতি মুতামিদের সাহায্যে কর্দোবা নরপতি আবদুল মালিক বিন জাওহর কর্দোবাকে রক্ষা করেন। আল মামুনের আক্রমণ হইতে কর্দোবা রক্ষা পাইলেও মুতামিদের হাতে কর্দোবার শাসনভার চলিয়া যায়। মুতামিদের সঙ্গে কর্দোবার ভাগ্য লইয়া মামুনকে এক ভীষণ সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হয়। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের জন্য তিনি লিয়োন ও ক্যাস্টাইল রাজ আলফানসো (৬ষ্ঠ) কে আমন্ত্রণ জানান। ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে খ্রিস্টানদের আমন্ত্রণ পরিশেষে নিজেদের সিংহাসনকে বিপদাপন্ন করিয়া তোলে। মামুনের সময় তলেদোর সুখসমৃদ্ধি ও গৌরব চতুর্দিকে বিস্তারলাভ করে। ১০৭৫ সালে ইয়াহয়া আল মামুনের মৃত্যু ঘটে।

ইয়াহয়া আল কাদির

ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়া 'আল কাদির' অত্যন্ত দুর্বল এবং ভীরু শাসক ছিলেন। তিনি তলেদোর শাসনক্ষমতা দখল করিয়া খ্রিস্টান রাজা আল ফানসোকে আরও লোভাতুর করিয়া তোলেন। নিজের স্থায়িত্বের জন্য তিনি আল-ফানসোকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া দরিদ্র প্রজাকূলকে করভারে জর্জরিত করিয়া তোলেন। আল কাদিরের এই আত্মবিনাশকারী নীতির বিরুদ্ধে প্রধান ও বিচক্ষণ উজির আবুবকর বিন আল হাজিজি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ প্রতিবাদ করেন। অবস্থা এমন মারাত্মক আকার ধারণ করে যে' জনগণ সরাসরি কাদিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বাদোজজের শাসনকর্তা মোতাওয়াকীমকে আমন্ত্রণ জানান। জনগণকে ন্যায়নীতি ও উদার মনোভাবের সাহায্যে শান্ত করার পরিবর্তে দমন ও প্রজাবৃন্দকে শায়েস্তা করিবার জন্য আল কাদির আল ফানসো (৬ষ্ঠ) কে আমন্ত্রণ জানান। আলফানসো বহুদিন ধরিয়া এমন একটি সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি সানন্দে বিপুল বাহিনী লইয়া তলেদো দখল করিবার জন্য আগমন করেন। সুদীর্ঘ ৭ বৎসর অবরোধের পর তলেদো আলফানসোর অধীনে চলিয়া যায়। হতভাগ্য কাদির বিতাড়িত হইয়া ১০৯২ সালে ভ্যালেনসিয়াতে মৃত্যুবরণ করেন। এইভাবে তলেদো আবার খ্রিস্টানদের অধীনে চলিয়া যায় ১০৮৫ সালে। ৭১২ সালে সেনাপতি তারিখ তলেদো জয় করিয়া মুসলিম শক্তির ভিত্তি প্রথমে প্রতিষ্ঠা করেন এবং সুদীর্ঘ ৩৭৩ বৎসর ব্যাপী তলেদো মুসলিম শক্তির কেন্দ্রভূমিরূপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খ্রিস্টান বিরোধী অভিযান এখান হইতে প্রেরিত হয়। তাই তলোদো পতনের সঙ্গে সঙ্গে স্পেনে মুসলিম অবসান অত্যাসন্ন হইয়া পড়ে।

সেভিলে বনু আব্বাদ (১০২৩-১০৯১)

উমাইয়া খিলাফতের পতনের পর স্পেনের বিভিন্ন প্রদেশে ও শহরে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বংশের অভ্যুদয় ঘটে তাহার মধ্যে সেভিলে বনু আব্বাদ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বংশ সূত্রে বনু আব্বাদ আরবীয়। তাহারা ইয়েমেনের প্রাচীন লাখমীয় গোত্র বলিয়া অভিহিত।

মিশর ও সিরিয়া সীমান্তের হিমস শহর হইতে তাহাদের আদি পুরুষ ই' তাফ বিন নুয়াইম স্পেনে আসিয়া গোয়াদল কুইভার নদীর তীরে বসতি স্থাপন করেন।

আবুল কাশিম মুহাম্মদ আল মুতাদিদ

১০২৩ সালে আব্বাদের প্রপৌত্র ও ইসমাইলের পুত্র আবুল কাসিম মুহাম্মদ (১ম) বনু আব্বাদ বংশীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। আবুল কাসিমের প্রতিভা বহুমুখী। তিনি ছিলেন দক্ষ সেনাপতি, অভিজ্ঞ শাসক ও বিজ্ঞ বিচারক। তিনি কর্দোবা জামে মসজিদের এক জন সর্বজনমান্য ইমামও ছিলেন। জণগণ তাঁহার নেতৃত্বকে সাদরে গ্রহণ করিয়া লয়। তিনিও সৎ ও অভিজ্ঞ পরামর্শদাতাদের লইয়া একটি জনকল্যাণমূলক শাসন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য চেষ্টা করিতে শুরু করেন। তাঁহার উপদেষ্টাগণের মধ্যে ছিলেন মুহাম্মদ বিন আরিম, হাওজানি, ইবনে হাজ্জাজ এবং আবুবকর জুবাইদী। তাঁহারা প্রত্যেকে পাণ্ডিত্যে ও অভিজ্ঞতায় কর্দোবাসীর শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। শাসন কাঠামো যোগ্য ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করিয়া তিনি সামরিক বাহিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন। বিশৃঙ্খল বাহিনীকে নূতন করিয়া বার্বার, শ্লাভ ও আরবদের দ্বারা পুনর্গঠিত করেন। এই অনুপ্রাণিত বাহিনীর সহায়তায় তিনি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে মোকাবেলা করেন।

এই সময় এক অভূতপূর্ব প্রবাহে আবুল কাসিমের জনপ্রিয়তা অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পায়। ১০২৭ সালে মালাগা অধিপতি ইয়াহয়া বিন আলী সেভিল অক্রমণ করেন এবং নগরের গণ্যমান্য অর্থাৎ শক্তিশালী অভিজাত ব্যক্তিদের পুত্রদিগকে জামিনস্বরূপ দাবী করেন। রাজ্যের এই বিপদে কেউ নিজ পুত্রদিগকে অনিশ্চিত ভাগ্যের হাতে সোপর্দ করিতে রাজী ছিলেন না। বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আবুল কাসিম নিজ পুত্র অব্বাদকে ইয়াহয়ার নিকট জামিন স্বরূপ প্রেরণ করিয়া নগরের আতংকভাব তিরোহিত করেন। ইয়াহয়া খুশী হইয়া চলিয়া যান এবং নগরবাসীও আনন্দাশ্রুতে তাঁহাকে স্বাগত জানায়। তিন খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠেন এবং বেজা, বাদাজোজ এবং পার্শ্ববর্তী অনেক অঞ্চল অধিকার করিয়া কর্দোবাকে পর্যন্ত বিপদাপন্ন করিয়া তোলেন। তিনি ১০৩৫ সালে বাদাজোজের আফতাছিদ শাসক মুহাম্মদকে মুক্তি প্রদান করেন। অবশ্য ৪ বৎসর পর কাসিমের পুত্র ইসমাইল যখন লিয়োনের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে যান তখন সুযোগমত বাদাজোজের আফতাছিদগণ তাঁহাকে প্রতি আক্রমণ করিয়া বিদাপন্ন করেন।

বার্বারগণ এই সময় মালাগা অধিপতি ইয়াহয়াকে অতিশয় শক্তিশালী করিয়া তোলে। কর্দোবা ও সেভিলকে পর্যন্ত গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। জনগণও গোত্রপতি শাসনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। কারণ প্রতিটি বংশগত প্রদেশই শক্রতায় লিপ্ত। তাহারা এইবার কেন্দ্রীয় শাসনের জন্য উমাইয়া খলিফা অন্বেষণ করিতে শুরু করে। বার্বারদের বিরুদ্ধে আরব ও শ্লাভগণ ঐক্যবদ্ধ হয় এবং এই অবস্থায় আবুল কাসিম তাঁহার হাযিব হইয়া বার্বারদের বিরুদ্ধে আরব ও শ্লাভগণকে একত্রিত করেন। সম্মিলিত শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী লইয়া আবুল কাসিম এইবার মালাগায় ইয়াহয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। অভিযানে ইয়াহয়া পরাজিত ও নিহত হন এবং আবুল কাসিম কারমানা দখল করেন। তিনি আলমেরিয়া এবং

গ্রানাদার উপর হামলার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। ২০ বৎসর রাজত্বের পর তিনি ১০৪২ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আবু আমর আব্বাদ

আবু আমর আব্বাদ পিতার মৃত্যুর পর হাযিব পদে অভিষিক্ত হন। তখনও ছদ্মবেশী হিশাম (২য়) সিংহাসনে উমাইয়া খলিফার ধারক হইয়া আসেন। আবু আমর পরবর্তীকালে আল মুতাদিদ বিল্লাহ্ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি নিজে একজন কবি ছিলেন এবং বিদ্যানুরাগীদের উদারভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। শাসন ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই দক্ষ ও সিদ্ধ হস্ত। তবে মদ্যপান, জুয়াখেলা এবং ক্রীতদাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা তাঁহার বদ অভ্যাস ছিল। কথিত আছে যে তাঁহার হেরেমে পছন্দসই ৮০০ ক্রীতদাসী ছিল।

সিংহাসনে উপবেশন করিয়া তিনি পিতৃশত্রু মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে আবদুল্লাহ্ ১০৪২ সালে নিহত হন। আটলান্টিক তীরভূমির দিকে রাজ্যসীমানা বিস্তৃত করিবার জন্য নিয়েবলার আরব প্রধান মুহাম্মদ বিন ইয়াহয়া আল-ইহাসূবীর বিরুদ্ধে অভিযান করেন। কিন্তু মুতাদিদ বিল্লাহ্ সম্মিলিত বার্বার প্রধানদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারেন নাই। নিয়েবলার আরব প্রধানের সাহায্যার্থে আসেন গ্রানাদার বাদিস, মালাগার মুহাম্মদ, আলজিসিরাসের মুহাম্মদ এবং বাদাজোজের মোজাফফর। তবে সেভিলকে গ্রাস করিতে বার্বারগণের সমবেত চেষ্টা সফল হয় নাই। তিনি বারংবার আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণ করিয়া নিয়েবলা জয় করিতে সমর্থ হন। মুতাদিদ তাঁহার দুই পুত্র ইসমাইল ও মুহাম্মদের অসীমসাহসী রণকুশলতার সাহায্যে অনেকগুলি ছোট ছোট শহর দখল করেন। এইভাবে মুতাদিদ বিপুল সাফল্যে পশ্চিমে তাঁহার আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

মুতাদিদ দক্ষিণে বার্বার অঞ্চলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। মোরোনা ও রোনদাতে তিনি অভাবিত ভাবে অভ্যর্থিত হন। তাহা ছাড়া আশেপাশের বার্বার গোত্রগুলিও তাঁহার দখলে আসে। মুতাদিদের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া অসি প্রতিযোগিতার চক্রান্তের দ্বারা তাঁহার জীবনলীলা সাঙ্গ করিবার জন্য বার্বার প্রধান চেষ্টা করেন। কিন্তু মুআজ বিন আবিকোরা দয়াপরবশ মুতাদির জীবন রক্ষা করেন। সেভিলে প্রত্যাবর্তনের পর মুতাদিদ রোনদা মেরোনার ও জারেজের ৬০ জন নেতাকে সেভিলে আমন্ত্রণ জানান। তবে অতি আশ্চর্যের বিষয়, মুতাদিদের জীবনরক্ষক মু'আজ ব্যতীত সকলকেই হত্যা করিয়া তাহাদের পূর্ব চক্রান্তের একটি উচ্চপদ দান করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত ও উপকৃত করেন। আরব সৈন্যদের সাহায্যে তিনি মেরোনা, আরকোস, জারেজ, রোনদা এবং অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল দখল করেন।

বার্বার নেতা বাদিজ মুতাদিদের প্রভাব ও শক্তিকে ক্ষুণ্ন করিবার জন্য নানা প্রকারে চেষ্টা করিতে থাকেন। তিনি আরবদের নিহত করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু পূর্বাপর চিন্তা করিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন। বাদিজ অবশেষে মুতাদিদ অধিকৃত অঞ্চলের মোহাজেরদের লইয়া সেভিল আক্রমণ করেন। সেভিলবাসী বাদিজের আক্রমণকে প্রতিহত

করিয়া বার্বারগণকে জিব্রাল্টারের অপর পারে বিতাড়িত করেন। তথায় তাহারা অনাহারে, অনাশ্রয়ে ও দুর্ভিক্ষে অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মুতাদিদ ১০৫৮ সালে হাম্মুদীয় শাসক কাসিমকে পরাজিত করিয়া কর্দোবাতে বিতাড়িত করেন। তিনি তাঁহার দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের বিজয় সমাপ্ত করিয়া ১০৫৮ সালে ছদ্মবেশী খলিফা হিশাম (২য়) কে অপসারণ করিয়া নিজেকে আমির বলিয়া ঘোষণা করেন। ১০৬৩ সালে বিধ্বস্ত আজ-জাহরা দখলের জন্য পুত্র ইসমাইলকে প্রেরণ করেন। ইসমাইল প্রয়োজনীয় সৈন্য সংগ্রহে ব্যর্থ হইয়া মালাগার আবু আব্দুল্লাহ নামক এক ভাগ্যান্বেষী যুবকের প্ররোচনায় নিজেকে আলজিসিরাসের শাসক বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু সর্বশেষ মুতাদিদ তাঁহার অবাধ্য পুত্রকে মৃত্যু দণ্ড দ্বারা চরম শাস্তি প্রদান করেন।

মালাগার অসন্তুষ্ট আরবগণ বাদিজের শাসনে অতিষ্ট হইয়া মুতাদিদকে মালাগা আক্রমণে আমন্ত্রণ জানান। আমিরজাদা আবুল কাসিম মুহাম্মদের নেতৃত্বে সেভিলের সৈন্যদল মালাগার অভিযান করেন। অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সেভিলবাহিনী মালাগার রক্ষী বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া পর্যুদস্ত করেন এবং সমগ্র মালাগা আমিরজাদার দখলে চলিয়া আসে। দুর্ধর্ষ নিগ্রোবাহিনী মালাগার এই দুর্দিনে অসম সাহসিকতার সঙ্গে লড়িতে থাকেন। বাদিস তাঁহার নিগ্রোবাহিনী লইয়া আকস্মাৎ নিরস্ত্র আমোদ-প্রমোদে উন্মত্ত সামরিক বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন। সেভিল বাহিনী এই আক্রমণে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং কাসিম মুহাম্মদ রোনদায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেভিলবাহিনীর এহেন পরাজয়ে মুতাদিদ ক্রুদ্ধ হইয়া কাসিমকে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তবে কাসিমের সানুনয় অনুরোধ পিতৃহৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হয়।

খ্রিস্টান আক্রমণ

মুসলিম শক্তির পতন আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উত্থান, খ্রিস্টান প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য হয় এক মহা সুযোগ। খ্রিস্টানগণ এই সুযোগে প্রতিটি রাজ্যে কৌশলের সঙ্গে মিত্ররূপে শত্রুতা সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রশস্ত করে। ফারনান্ডো (১ম) মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে অপ্রতিগত হইয়া ক্ষমতা বিস্তার করিতে শুরু করেন। তিনি একে একে বাদাজোজ, দারো, তলেদো, সারাগো সা প্রভৃতি মুসলিম শক্তির কেন্দ্র ভূমিগুলি গ্রাস করেন। মুতাদিদ সেই সময়ে ক্ষুদ্র রাজবংশের মধ্যে প্রতাপশালী হওয়া সত্ত্বেও খ্রিস্টানদের পরাজিত করার মত শক্তি তাঁহার ছিল না। ১০৬৩ সালে ফারনাণ্ডো সেভিল অবরোধ করিয়া ১০৬৪ সালে কমরা দখল করিয়া ৫০০ মুসলমানকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। খ্রিস্টানগণ ভ্যালেনসিয়াও দখল করেন। কিন্তু তলেদোর শাসক মামুনের সাহায্যে আবদুল মালিক ভ্যালেনসিয়া পুনরুদ্ধার করেন। ১০৬৫ সালে ফারনান্ডোর মৃত্যুর পর মুসলিম স্পেনের উপর নূতন করিয়া বিপদ শুরু হয়। মুতাদিদ ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১০৬৯ সালে সুদীর্ঘ ৩০ বৎসর ধরিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। যদিও বার্বার শক্তিকে নির্মূল করিতে পারেন নাই তথাপি তাঁহাদের প্রভাব ক্ষুণ্ন করিয়াছেন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বংশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নিজেকে শক্তিশালীরূপে প্রতিপন্ন করেন। তবে তাঁহার এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব মুসলিম শক্তিকে হীনবল করিয়া

ফেলে এবং উত্তরের খ্রিস্টানদের আক্রমণ ও উত্তর আফ্রিকার আল মোরাবিত অভিযানকে সার্থক করিবার পথ প্রশস্ত করে।

মুতামিদ

পিতার মৃত্যুর পর ১০৬৯ সালে আবুল কাসিম মুহাম্মদ (২য়) আল মুতাদিম সেভিলের শাসনভার হাতে নেন। তিনি কাব্য, সাহিত্য ও শিল্পে খুবই অনুরাগী ছিলেন। কবিতা রচনা করা ও আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তিনি পত্নী ইতিমাদ রুমাইকিয়াহ্‌কে অতিশয় ভালবাসিতেন। কারণ তিনিও রুচিশীল ও সংস্কৃতিমনা রমণী ছিলেন। ড. ইমামউদ্দীন সাহেব তাঁহার সঙ্গে ভারতের মুঘল রমণী নূরহাজানের তুলনা করেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা পূরণ করিতে মুতামিদ কখনও দ্বিধা করিতেন না। তিনি রাজকার্যেও সমান কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

তাঁহার প্রধানমন্ত্রী ইবনে আম্মারও একজন সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। মুতা-মিদের সহচর ও উপদেষ্টা হিসেবে তিনি বহুদিন হইতে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি ভাগ্যকে খুবই পরিশ্রম করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধু মুতামিদ তাঁহাকে খুবই সাহায্য করেন। পুরাতন বন্ধুকে যোগ্যপদে বরণ করেন যথাসময়ে। এই দুই সাহিত্যসেবী রাজা ও মন্ত্রী যৌথ প্রচেষ্টায় সেভিলের দরবার, কানন ও প্রান্তর কবিত্বময় করিয়া তোলেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হিট্টি সাহেব মুতামিদের সম্পর্কে ইবনে খাল্লিকানের উদ্ধৃতি এইভাবে পেশ করিয়াছেন—

The most munificient, the most Popular and most powerful of all kings. He, "Whose court was the halting place of sojouerners the rendezvous of poets, the direction toward which all hopes were turned and the haunt of men of excellence."

মুতামিদ প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির দুর্বলতার সুযোগ লইয়া নিজেকে স্পেনে অতিশয় শক্তিশালী করিয়া তোলেন। তবে খ্রিস্টানদের সঙ্গে মোকাবেলা করিবার মত সাহস থাকিলেও শক্তি ছিল না। খ্রিস্টান রাজ্য লিয়োন ও ক্যাস্টাইলের শক্তিই তাঁহাকে অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে। নিজ রাজ্যকে তাঁহাদের আক্রমণ হইতে নিরাপদ রাখিবার জন্য তিনি ফার্ডিন্যাণ্ডের পুত্র আলফানসো (৬ষ্ঠ) কে নিয়মিত অর্থ যোগান দিতেন। মুতা-মিদ বর্হিশত্রু আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিতে যে পথ অবলম্বন করেন তাহা রাজ্যের মঙ্গলের পথে ছিল বিরাট হুমকিস্বরূপ। কারণ একদিকে বিপুল অর্থ খ্রিস্টানদেরকে প্রদান করিবার ফলে যাহা কিছু থাকিত তাহা তিনি নিজের প্রমোদ ব্যবস্থায় ব্যয় করিতেন। ফলে অন্যদিকে সৈন্যবাহিনী দারুণ অর্থ সংকটে পড়ে, তাহাদের সামরিক শক্তিও হ্রাস পাইতে শুরু করে। খ্রিস্টানগণ শুধু অর্থের লোভী ছিলেন না। তাঁহারা মুসলিম রাজ্য গ্রাস করিবার চেষ্টায়ও ছিলেন। বিপুল সৈন্যবাহিনী মৌজুদ করিয়া তাঁহারা সেভিল আক্রমণের ব্যাপক প্রস্তুতি নিলে মুতামিদ খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে সাহসী না হইলেও বিজ্ঞমন্ত্রী ইবনে আম্মার তাঁহার রাজনৈতিক কলাকৌশলে খ্রিস্টানদেরকে পরাজিত করেন। ইবনে আম্মার ইতিপূর্বে আলফানসোর দরবার অনেকবার ঘুরিয়া আসেন এবং তিনি জানিতেন রাজার

রুচি ও হবি কি। তিনি ভালভাবেই জানিতেন যে, মুসলিম সৈন্যগণ খ্রিস্টানদের মোকাবেলায় টিকিতে পারিবে না তাই তিনি অন্য পথ ধরেন। আবলুসকাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারুকার্যখচিত একটি দাবার বোর্ড লইয়া তিনি আলফানসোর শিবিরে গমন করেন। তিনি আলফানসোর একজন ব্যক্তিগত সচিবকে তাঁহার অপরূপ দাবা বোর্ডটি সম্পর্কে রাজাকে অবহিত করিতে বলেন। যথাসময়ে রাজা বোর্ডটির সংবাদ পান। ইবনে আম্মারকে তলব করিয়া বলেন যে, আপনার সেই দাবা বোর্ডটি কি দেখতে পারি ? বিজ্ঞ মন্ত্রী বলেন, নিশ্চয়ই, আপনাকে দেখাব, কিন্তু একটি শর্ত আছে। আমরা উভয়ে খেলিব। আপনি যদি জয়ী হন, তবে বোর্ডটি আপনারই আর যদি পরাজিত হন তবে আমি যাহা চাহিব দিবেন কি ? রাজা ইহাতে সম্মত হইলেন। ইবনে আম্মার বোর্ডটি দেখাইলেন। রাজা বোর্ডটির সৌন্দর্য ও কারুকার্য দেখিয়া রীতিমত তাজ্জব হইয়া যান। তাঁহার পর ইবনে আম্মার খেলিতে বসেন। ভাগ্য তাঁহার অনুকূলে ছিল। তিনি রাজাকে পরাজিত করিয়া দাবী করেন যে, খেলায় পূর্বশর্ত রাজা পূরণ করবেন কি না। রাজার সম্মতি লইয়া তিনি বলেন যে, খ্রিস্টানবাহিনীকে সেভিল আক্রমণ না করিয়া এইবার ফিরিয়া যাইতে হইবে। রাজার তো মহা আক্রোশ। এমন প্রস্তাব যে ইবনে আম্মার করিতে পারেন তিনি ভাবিতেও পারেন নাই। অগত্যা শর্ত পালন করিতেই হইল। এমনিভাবে আসল দাবার গুটি দ্বারা রাজনীতির দাবাখেলায় ইবনে আম্মার জয়ী হইয়া সেভিলকে আসন্ন পতনের হাত হইতে রক্ষা করিলেন।

ইবনে আম্মারের এই অপূর্ব বিজয় সাফল্যে সেভিলের জনমনে জাগে তাঁহার প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস। ইবনে আম্মার সেনাবাহিনীর মধ্যেও আস্থাভাজন হইয়া উঠেন। এইবার তাহাদের সহায়তায় মুরসিয়া আক্রমণ করেন। আবুবকর বিন জায়দুনকে পরাজিত করিয়া মুরসিয়া দখল করেন। বলিজ দুর্গের আরব প্রধান ইবনে রাশিকের সাহায্যে তিনি নিজকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার এই উচ্চাভিলাষই শেষ পর্যন্ত তাঁহার চরম পরিণতি হইয়া দাঁড়ায় কার্যতঃ ইবনে রাশিক তাঁহাকে সময়মত সাহায্য করেন নাই। ইবনে আম্মার লিয়োনরাজের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াও সফল হন নাই। ফলে তাঁহার দুর্ভোগ নামিয়া আসে। মুতামিদ তাঁহার প্রধানমন্ত্রীর এই বিদ্রোহাত্মক কার্যকে কোনমতে বরদাশ্‌ত করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে বন্দী করা হয় এবং শৃঙ্খলিত করিয়া মুতামিদের সম্মুখে আনা হয়। হতভাগ্য মন্ত্রী তাঁহার কৃতকর্মের জন্য সাশ্রু-নয়নে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও মুতামিদ তাঁহাকে ক্ষমা করেন নাই। তাঁহাকে হত্যা করিয়া বিদ্রোহের শাস্তিবিধান করেন।

মন্ত্রী ইবনে আম্মারের স্থলে মুতামিদ আবুবকর ইবনে জয়দুনকে নিয়োগ করেন। মন্ত্রীর পরিবর্তন হইল, কিন্তু মুতামিদ তাঁহার বৈদেশিক নীতির পরিবর্তন করিতে পারেন নাই। সম্রাট আলফানসো সমগ্র স্পেন বিজয়ের জন্য বিপুল প্রস্তুতি নেন। সেনাবাহিনীর বিরাট বহর লইয়া তলেদো অধিকার করিবার জন্য ১০৮৫ সালে অবরোধ শুরু করেন। সুদীর্ঘ ৪ বৎসর ধরিয়া অবরোধের পর তলেদো দখল করেন। তিনি সেভিলের শাসনকর্তা মুতামিদের নিকট হইতে বার্ষিক কর আদায়ের জন্য ইহুদী কর্মচারী ইবনে শালিবকে প্রেরণ করেন। কিন্তু ইবনে শালিব মুতামিদের প্রদত্ত মুদ্রা গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। কারণ মুদ্রাগুলিতে নাকি প্রয়োজনের তুলনায় ধাতব পদার্থ অপ্রতুল ছিল। তাহা ছাড়া ইবনে শালিব

মুতামিদের সহিত জঘন্য ভাষায় অসৌজন্যমূলক আচরন করেন। মুতামিদ এহেন আচরণে ক্ষুণ্ণ হইয়া তাঁহাকে নিহত করেন। এই সময়ে সেভিল, গ্রানাদা, বাদাজোজ এবং অন্যান্য রাজ্যগুলির প্রধানগণ প্রমাদ গুণিলেন যে, মুসলিম শক্তির উপর খ্রিস্টানদের আক্রমণ অত্যন্ত ভয়াবহ। তাহাদের নিজস্ব শক্তি যৌথভাবে প্রয়োগ করিয়াও খ্রিস্টানদিগকে প্রতিহত করা সম্ভব হইবে না। তাই কর্দোবা, গ্রানাদা ও বাদাজোজের কাজীগণ যথাক্রমে ইবনে আদাহাম, আবু জাফর কলাই ও আবু ইবনে জায়দুনকে দলের নেতৃত্বে দিয়া আফ্রিকার মুরাবিত শাসক ইউসুফ বিন তাশফিনের নিকট যান। তাঁহারা স্পেনের সামগ্রিক অবস্থার সবিশেষ বিবরণ পেশ করিয়া স্পেনের মুসলমানদের জাতীয় দুর্দিনে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আবেদন জ্ঞাপন করেন। তাঁহাদের কথায় ইউসুফ সম্মত হইয়া বিপুল বাহিনী লইয়া স্পেনে উপস্থিত হন। যথাযোগ্য সমাদর ও সম্মানে মুতামিদ ইউসুফ বিন তাশফিনকে গ্রহণ করেন।

আলফানসো মুতামিদের প্রেরিত অর্থ সংগ্রাহক দূতের হত্যার খবর শুনিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, ত্রিতত্ববাদের শপথ, মুসলিম শক্তি নির্মূল করিয়া স্পেনকে খ্রিস্টান স্পেনে পরিণত করিয়া মুতামিদকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইবে। তিনি ৫০,০০০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী লইয়া সেভিল আক্রমণ করেন। মুসলিম শক্তির সম্মিলিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল মাত্র ২০,০০০ হাজার। বিখ্যাত জাল্লাকা প্রান্তরে যুদ্ধ শুরু হয়। মুতামিদ স্বয়ং অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। ইউসুফ বিন তাশফিন ও তাঁহার মুরাবিত সৈন্যবাহিনী লইয়া অদ্ভুত রণকৌশল প্রদর্শন করিয়া আলফানসোর তাঁবু আক্রমণ করেন। সম্মুখভাগে মুতামিদ আর পশ্চাতে ইউসুফ। মুসলমানদের প্রচণ্ড আক্রমণে খ্রিস্টান সৈন্যগণ বেশিক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্রে টিকিতে পারে নাই। আলফানসো আহত হইয়া কোন রকমে অশ্বারোহী বাহিনীর সাহায্যে পলায়ন করেন। এই যুদ্ধের ফলাফল মুসলমানদের অনুকূলে ছিল। খ্রিস্টানদের ভয়াবহ আক্রমণ ও সমূহ বিপদ হইতে মুসলিম স্পেন রক্ষা পায়। ১০৮৬ সালের ২৩শে অক্টোবর জাল্লাবর জাল্লাকা যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয়ী হইয়া খ্রিস্টান জগতে এক আতংক সৃষ্টি করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই উল্লেখযোগ্য বিজয়ের সুফল হইতে মুস-লমানগণ বঞ্চিত হয়। ইউসুফ বিন তাশফিন এই যুদ্ধের পর জানিতে পারিলেন, সিউটাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। এই দুঃসংবাদে তিনি স্পেন ত্যাগ করিয়া অবিলম্বে আফ্রিকায় প্রত্যাবর্তন করেন। ইউসুফের স্পেনে অনুপস্থিতি মুসলমানদের উপর নামিয়া আসে দুর্দিনের অভিশাপ। খ্রিস্টানগণ মুসলিম স্পেনের উপর বারংবার হামলা করিয়া তাহাদিগকে হয়রান করিতে শুরু করে। যদি জাল্লাকা যুদ্ধের ফলাফল ধরিয়া মুসলমানগণ খ্রিস্টানদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেন তবে স্পেনের ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে লিখিত হইত। অবশ্যম্ভাবী পতনের পথ রুদ্ধ হইয়া আরও কিছুকাল সেখানে তাহারা রাজত্ব করিতে পারিতেন। এই যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে ডজি সাহেব বলেন, "এই অপূর্ব বিজয়ের ফলে আকাঙ্ক্ষিত ফলাফল মুসলমানগণ লাভ করিতে পারেন নাই।"

ইউসুফ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ৩০০০ আফ্রিকান সৈন্য স্পেনে রাখিয়া যান। তথাপি মুতামিদ খ্রিস্টানদের আক্রমণ হইতে নিজেকে বিপদমুক্ত করিতে পারেন নাই। খ্রিস্টানদের মুসলিম জনপদ দখল, হত্যা, লুণ্ঠন ও নির্যাতন

দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। খ্রিস্টানদিগকে শায়েস্তা করিবার জন্য মুতামিদ আবার ইউসুফ বিন তাশফিনকে আমন্ত্রণ জানান। ইউসুফ তাঁহার আমন্ত্রণে নূতনভাবে সাড়া দেন। এইবার তিনি স্পেন বিজয় করিতে আসেন। ১০৯৫ সালে কেবল তিনি সেভিল বিজয় করিয়া মুতা-মিদকে তাঁহার রাজ্যহারা করিলেন তাহাই নহে, একে একে সমগ্র আন্দালুসিয়া নিজের শাসনাধীনে আনিলেন। মুতামিদ মরক্কোর নিকট আঘামাতে নির্বাসিত হন এবং সেখানেই ১০৯৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। মুতামিদের শেষ জীবন অত্যন্ত দুঃখে অতিবাহিত হয়। কথিত আছে যে, তাঁহার স্ত্রী-পুত্র কন্যাকে শেষ পর্যন্ত রুটি-রুজির জন্য কায়িক পরিশ্রম করিয়া দিনাতিপাত করিতে হয়।

মুতামিদ সুদীর্ঘ বাইশ বৎসর ব্যাপী সেভিলের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁহার রাজত্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রুচিশিল্পের উৎকর্ষ সাধন। তিনি নিজে ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক। উন্নত রুচি ও পরিমার্জিত স্বভাবের জন্য তাহার দরবার জ্ঞানী ও মনীষীদের দ্বারা অলংকৃত থাকিত। তিনি যেমন জ্ঞানানুরাগী তাঁহার প্রধানমন্ত্রী ইবনে আম্মারও ছিলেন তেমনি সাহিত্যমোদী। উভয়ে মিলিয়ে সেভিলের রাজদরবারকে শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সফলে সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন। তাঁহার শিক্ষানুরাগ ও সংস্কৃতি সাধনাই তাঁহাকে উদার হইতে সাহায্য করে। তাঁহার দরবারে সর্বশীর্ষে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন সেই যুগের প্রখ্যাত কবি আবদুল জলিল। মুতামিদ স্পেনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদের মধ্যে ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী। তবে অধিকাংশ সময় জ্ঞান সাধনা, আমোদ-প্রমোদ ও বিলাস ব্যসনে নিমগ্ন থাকায় সৈন্যবাহিনীকে খ্রিস্টান শক্তির মোকাবেলায় উপযুক্তরূপে গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। ফলে খ্রিস্টান শক্তির নিকট তাঁহাকে নতিস্বীকার করিতে হয়। পরিশেষে সামরিক শক্তি ও জনবলের অভাবে সেভিল অধিপতি মুতামিদ তাঁহার গৌরবময় রাজত্ব ও জীবনের অবসান ঘটায়। সেভিল পতনের পর সমগ্র স্পেন স্পেনবাসীর শাসন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং উত্তর আফ্রিকার শাসন শুরু হয়।

ষোড়শ অধ্যায়
উত্তর আফ্রিকার শাসন ১০৯০-১২৬৯

[সার সংক্ষেপ ঃ সূচনা ❑ উত্তর আফ্রিকার শাসন ❑ মুরাবিতগণ ❑ আল মুয়াহহিদুন ।]

মুরাবিতগণ (১০৫৬-১১৪৬)

মুরাবিত আরবী শব্দ। ইহার অর্থ রাবাতে (উপাসনালয়ে অথবা সরাইখানাতে) অবস্থানকারী উপাসক বা সন্ন্যাসী। রাবাতে অবস্থান করিয়া ধর্মীয় নেতাগণ আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করিতেন এবং সেখানে জনগণ সমবেত হইত তাঁহাদের নিকট হইতে ধর্মীয় উপদেশ গ্রহণ করিতে। এইভাবে রাবাত জনগণের নিকট অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হইয়া উঠে। ধর্মীয় নেতাগণ জনসাধারণের মধ্যে ধর্মের প্রচারণার মাধ্যমে বিশেষ প্রভাবশালী হইয়া উঠেন। হাবিব আল মনসুরের মৃত্যুর পর বার্বারগণ তাঁহাদের একজন মুরাবিতকে (ধর্মীয় নেতাকে) নিজেদের শাসকরূপে বরণ করিয়া নেয়। তাঁহাদের নেতৃত্বে বার্বারগণ সমগ্র উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় অর্থাৎ আলজিরিয়া হইতে নিগার হইয়া সেনিগাল নদ পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করে। মুরাবিতগণকে আবার মুলাচ্ছামিনও বলা হইত। কারণ তাঁহারা সাহারার উত্তপ্ত হাওয়া হইতে দেহ রক্ষার জন্য মুখাবরণ পরিধান করিতেন। তাঁহাদের বংশধরগণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহারা হিমারীয় গোত্রের লোক। হযরত আবু বকর (রাঃ) এর সময় ইয়েমেন হইতে সিরিয়ায় চলিয়া আসেন এবং তথা হইতে উত্তর আফ্রিকায় হিজরত করেন। আবার অনেকে বলেন যে, তাঁহারা সিনহাজাহ বার্বার গোত্রের লোক। এই গোত্রের ইয়াহয়া বিন ইব্রাহিম নামক এক জন নেতা ১০৩৯ সালে মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় কায়রোয়ানের প্রখ্যাত মালেকী মাজহাবের ধর্মশাস্ত্রবিদ আবু ইমরান আলফাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি উক্ত আলেমকে তাঁহাদের অঞ্চলে একজন ধর্ম প্রচারক প্রেরণ করিবার অনুরোধ জানান। আবু ইমরান যথাসময়ে আবদুল্লাহ ইয়ামিনকে মরক্কোতে প্রেরণ করেন। তিনি এখানে আসিয়া একটি রাবাত নির্মাণ করিয়া ধর্মপ্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার বহু ভক্ত ও অনুসারী জোটে। তাঁহাদের মধ্যে ইয়াহয়া বিন ওমর ও আবুবকর বিন ওমর নামক দুইজন শিষ্য বিশেষ খ্যাতিমান। আবদুল্লাহ বিন ইয়ামিন ধীরে ধীরে বার্বার গোত্রের মধ্যে ক্ষমতাশালী হইয়া রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতার গৌরব অর্জন করেন। তিনি আবার যুদ্ধবিদ্যায়ও

পারদর্শী ছিলেন। সমস্ত বিচ্ছিন্ন বার্বার গোত্রগুলিকে একত্রিত করিয়া শক্তিশালী ইউনিট গঠন করেন। যুদ্ধবিদ্যা, শৃঙ্খলাবোধ এবং ধর্মীয় প্রভাবের সমন্বয় সাধন করিয়া এই বার্বার জাতিকে তাহার অনুসারী ইয়াহয়া বিন ওমরের নেতৃত্বে সঞ্জীবিত করিয়া তোলেন। ইয়াহয়া সংঘবদ্ধ বার্বার শক্তিকে লইয়া বহু অঞ্চল দখল করিয়া ওয়াদি-দারা এবং সিজিলমাছাহ পর্যন্ত অগ্রসর হন। এমনকি তিনি সেনাপতি মুসা বিন নুসাইর অনধিকৃত অঞ্চল সাহারা অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। ১০৫৯ সালে ইয়াহয়া বারগাতাহ বার্বার গোত্রের সঙ্গে সংঘর্ষকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আবুবকর

ইয়াহয়ার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা আবুবকর অসীম সাহসিকতার সঙ্গে বারগাতাহ গোত্রের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান পরিচালনা করেন। নূতন সেনাপতির নব বিক্রমে সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে দেখা যায় অপূর্ব প্রেরণা। তাই অতি সহজেই উক্ত গোত্রকে পরাজিত করিয়া নিজের দখলে আনিয়া ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। আবু বকর অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠেন এবং ইদ্রিসীয় রাজ্যকেও দখল করিয়া নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। দেশের শাসনভার সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইউসুফ বিন তাশফিনকে দায়িত্ব অর্পণ করিয়া নিজে মরুভূমির মুরাবিতগণের বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য গমন করেন। যথাসময়ে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা দমন করিয়া আবু বকর প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস। তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য হইতে বঞ্চিত করা হয় এবং পরিশেষে তাঁহাকে নির্বাসিত হইয়া ১০০৭-৮ সালে মৃত্যুবরণ করিতে হয়। মুরাবিতগণের উৎপত্তির এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ইউসুফ বিন তাশফিন

ইউসুফ বিন তাশফিন মুরাবিতগণের নেতৃত্ব দেওয়ার ফলে ইতিহাসে তাহাদের কীর্তি এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে। ইউসুফ অতিশয় বুদ্ধিমান, সংগঠক ও সমর নিপুণ ছিলেন। সাংগঠনিক প্রতিভার ফলে বার্বার গোত্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তিনি এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। ইহা ব্যতীত ধর্মীয় নীতির ক্ষেত্রে তাঁহার সুনাম ছিল যথেষ্ট। তাঁহার ধর্মানুরাগ এত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী ছিল যে, ইসলাম জগতের শ্রেষ্ঠমনীষী হযরত ইমাম গাজ্জালী ১০৮৬ সালে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে যান। ইউসুফ বিন তাশফিন আব্বাসীয় খলিফার দরবার হইতে আমির উল–মুসলিমিন উপাধিও লাভ করেন। ইউসুফ যখন এমন গৌরবময় যুগ সৃষ্টি করিয়া উত্তর আফ্রিকার শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করিতে ছিলেন, তখন স্পেনের অবস্থা ছিল মহাসংকটময়। মুসলিম স্পেনকে সমূলে উৎখাতের জন্য খ্রিস্টানগণ, উদ্যত, অথচ মুসলমানদের মধ্যে এমন কোন ঐক্যবদ্ধ শক্তি ছিল না যাহা তাহাদিগকে প্রতিহত করিতে পারে। বনু আব্বাস বংশীয় মুতামিদ তাই নিজ রাজ্যের খ্রিস্টানদের হাত হইতে রক্ষার জন্য ইউসুফের নিকট সাহায্য কামনা করেন। ইউসুফ স্পেনের এই দুর্দিনে এই বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া স্পেনে উপস্থিত হন। বিশ হাজারের

এই সামরিক শক্তি লইয়া তিনি বাদাজোজের দিকে অগ্রসর হন। ২৩ শে অক্টোবর ১০৮৩ সালে আলফানসো (৬ষ্ঠ) ৫০,০০০ হাজারের এক বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া সৈন্যদের গতিরোধ করেন। জাল্লাকা প্রান্তরে এক ভীষণ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয়। যুদ্ধে খ্রিস্টানগণ ভীষণভাবে পরাজিত হয় এবং আলফানসো কোনক্রমে ৩০০০ সৈন্য লইয়া পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করেন। এই যুদ্ধের পর ইউসুফ স্পেনবাসীদের নিকট গভীর শ্রদ্ধা ও প্রচুর আস্থা অর্জন করিতে সক্ষম হন। স্পেনবাসী তাঁহাকে তাদের রক্ষক হিসাবে চিহ্নিত করেন। ইউসুফ ৩০০০ সৈন্য রাখিয়া উত্তর আফ্রিকায় প্রত্যাবর্তন করেন।

ইউসুফের প্রত্যাবর্তনের পর খ্রিস্টানগণ পুনরায় তাহাদের মুসলিম বিরোধী অভিযান শুরু করে। তাহারা মুরসিয়া, লোরসা ও আলমেরীয়ার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে থাকে। জাল্লাকা যুদ্ধের ফলাফলের উপর বিশ্বাসী হইয়া মুতামিদ খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন করেন। কিন্তু মুতামিদের ৩০০ সৈন্য খ্রিস্টানদের ৭০০ সৈন্য দ্বারা পরাজিত হয়। এই নিদারুণ পরাজয়ের পর মুসলিম ফকিহ্ ও উলামা এবং নেতৃবৃন্দ আবার ইউসুফকে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিবার জন্য মোতামিদকে অনুরোধ করেন। মুতামিদ পুনরায় ইউসুফকে আহ্বান জানান। ইউসুফ দ্বিতীয়বারের জন্য স্পেনে পদার্পণ করেন। ইউসুফের নেতৃত্বে এক শক্তিশালী ঐক্যজোট গঠিত হয়। সেভিলের মুতামিদ, মালাগার তামিম, গ্রানাদার আবদুল্লাহ, আলমেরীয়ার মুতাসিম এবং মুরসিয়ার রাসিক সকলেই একত্রিত হইলেন খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের জন্য। তাঁহারা খ্রিস্টানদের শক্তির কেন্দ্র তলেদো অবরোধ শুরু করেন। সুদীর্ঘ ৪ মাস ব্যাপী ১৩০০০ হাজার খ্রিস্টান দুর্গবাসীকে অবরোধ করিয়া রাখেন। এই সময়ে মুসলমানদের মধ্যে আবার গোত্রকলহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। মুতাসিম মুতামিদকে ঘৃণা ও অপমান করিতে চান। আবার আলেমেরীয় শক্তিও মুতামিদের পতন কামনা করে। মুতামিদও রাসিককে উৎখাত করিতে উদ্যত। এইভাবে তাঁহারা সেখানেই গৃহযুদ্ধ শুরু করেন। এমতাবস্থায় ইউসুফ দেখিলেন যে, আত্মকলহ প্রবণ সেনাবাহিনী লইয়া অবরোধ চালনো আর সম্ভব নহে। তাই বাধ্য হইয়া অবরোধ উঠাইয়া ইউসুফ এইবার অন্যপথ ধরিলেন। মালেকী ফকিহদের অনুপ্রেরণায় ইউসুফ গ্রানাদা অবরোধ করিলেন এবং কাজী আবু জাফরের সহায়তায় গ্রানাদা দখল করেন। গ্রানাদা অধিকার করিবার পর সেখানে তাহার একজন প্রতিনিধি রাখিয়া মরক্কোতে প্রত্যাবর্তন করেন।

এইবার স্পেনের মুসলমান শাসকবৃন্দ খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে অভিযানের কথা বেমালুম ভুলিয়া ইউসুফের বিরুদ্ধে অসি উন্মুক্ত করেন। কর্দোবা, মালাগা, সেভিল এবং অন্যান্য স্থানের প্রধানগণ ইউসুফের প্রতিনিধি আবু বকরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য খ্রিস্টানদের সাহায্য কামনা করেন। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়া ভ্রাতৃকলহে নিজদেরকে ধ্বংস করিবার পথ তাহারা বাছিয়া লয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতনোন্মুখ স্পেনীয় শাসকদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান পরিচালনার জন্য স্পেন, উত্তর আফ্রিকা ও এশিয়ার উলামাবৃন্দ জিহাদের ফতওয়া প্রদান করিয়া আবু বকরের শক্তিকে অপরাজেয় করিয়া তোলেন। কর্দোবা অধিকার করিয়া সেভিল অবরোধ করিলে মুতামিদের প্রার্থনা মোতাবেক ক্যাস্টাইল সৈন্যবাহিনী আলবার ফানেজের নেতৃত্বে

আবুবকরকে বাধা দেয় কিন্তু ক্যাস্টালীয়ান সৈন্যরা মোরাবিতগণের নিকট চরমভাবে পরাজয় বরণ করে। সেভিল দীর্ঘদিন ধরিয়া অবরোধ রাখিবার পর ৭ই সেপ্টেম্বর ১০৯০ সালে আবুবকর ইহা দখল করিতে সমর্থ হন। মোতামিদের পুত্রদ্বয় মুতাদ ও রাজী যথাক্রমে মারতোলা ও রোনদায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন কিন্তু মোরাবিতগণের নিকট শেষ পর্যন্ত এইগুলি হস্তান্তর করিতে হয়। আব্বাস বংশের পতনের পর মুরাবিতগণ একে একে আলমেরীয়া, মুরসিয়া, দেনিয়া, যাতাভিয়া, বাদাজোজ প্রভৃতি অঞ্চলগুলি দখল করিয়া নেন। ভ্যালেনসিয়া অধিকার করিতে পারেন নাই কারণ উহা শক্তিশালী খ্রিস্টান অধিপতি সাইদের (Cid) দখলে ছিল। অবশেষে ১১০২ সালে সাইদের মৃত্যুর পর ভ্যালেনসিয়া অধিকৃত হয়।

একমাত্র বনু হুদের সারাগোসা ব্যতীত সমগ্র স্পেন মুরাবিতগণের অধীনে চলিয়া আসে এবং তেরটি মুসলিম ক্ষুদ্র রাজ্য মুরাবিতগণের কদর রাজ্যে পরিণত হয়। স্পেন দখলের পর ইউসুফ স্পেনের দুর্বল শাসনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। অর্থনৈতিক অবস্থান উন্নতির জন্য শরীয়ত বিরোধী সকল প্রকার নির্যাতনমূলক কর রহিত করেন। ফলে জনগণের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং রাজস্ব আরও বৃদ্ধি পায় কথিত আছে যে, ইউসুফ বিন তাশফিনের মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারী রাজকোষে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ পাইয়াছিলেন প্রায় ৬০,০০০ হাজার সের বা ১২০,০০০ পাউণ্ড স্বর্ণ। জনগণের অভাব দূর হয় এবং দ্রব্যমূল্য যথেষ্ট হ্রাস পায়। শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠনের ফলে দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং জনগণ জানমাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা লাভ করে। উলামাবৃন্দকে মুরাবিতগণ ভাল চক্ষে দেখেন নাই। খ্রিস্টান ও ইহুদীগণ স্ব স্ব ধর্মকর্ম নিরাপদে পালন করিতে পারিতেন। কারণ পরধর্মের প্রতি যথেষ্ট উদার দৃষ্টি দিয়া ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিয়া মুরাবিতগণ জনগণের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জন করেন।

আলী বিন ইউসুফ

১১০৭ সালে ইউসুফের পুত্র আলী মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে মরক্কোর সিংহাসনে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি পিতার ন্যায় রাজ্য শাসননীতি অবলম্বন করেন। যোগ্য ও অভিজ্ঞ এবং অনুগত ব্যক্তিদিগকে স্পেনের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। এই সময়ে ইউসুফের আর এক পুত্র তামিম কুটনৈতিক বুদ্ধিমত্তায় সারাগোসাবাসীর জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এবং অনায়াসেই সারাগোসা দখল করেন। ১১০০ সালে সারাগোসা দখল স্পেনের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ এই সারাগোসাই ছিল এ্যবরো উপত্যকার গুরুত্বপূর্ণ শহর। সারাগোসাধিপতি ইমাদুদ্দৌলা রোয়েদায় পলায়ন করেন এবং ১১৩০ সালে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তামিম খ্রিস্টানদের সঙ্গে স্পেনীয় অঞ্চল লইয়া কয়েকটি যুদ্ধ করেন, কিন্তু বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। তামিমের মৃত্যুর পর সারাগোসা এবং সন্নিকটবর্তী অনেক অঞ্চল খ্রিস্টানদের দখলে চলিয়া যায়। ফ্রাঙ্কদের সহায়তায় খ্রিস্টানগণ বর্তমান পর্তুগালও অধিকার করিয়া নেয়। এই সমস্ত অঞ্চল হাতছাড়া হইয়া যাওয়াতে আলি এক শক্তিশালী বহর লইয়া স্পেনে আসেন কিন্তু উত্তর আফ্রিকায় গোলযোগের সংবাদে তাঁহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। আলি পিতার ন্যায় অত বেশি যোগ্য ছিলেন না।

ফলে শাসনব্যাপারে জটিলতার সৃষ্টি হয়। চতুর্দিকে অসন্তোষ বিরাজ করিতে থাকে এবং বার্বারগণ পরিশেষে নূতন বংশের দিকে ধাবিত হয়। এইভাবে স্পেনে মুরাবিতগণের শাসনের অবসান ঘটে।

আল মুয়াহহিদুন (১১৪৬-১২৬৯)

দ্বাদশ শতকের শুরুতে উত্তর আফ্রিকার সুসের অধিবাসী আবদুল্লাহ বিন তুর্মাতের পুত্র আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ নামক এক ব্যক্তি মৌরিতানিয়া বিভক্তকারী বিশাল পর্বতশ্রেণীর অধিবাসী বার্বারগণের মধ্যে আবির্ভূত হন। তিনি আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং বার্বার গোষ্ঠির মধ্যে লালিত–পালিত হন। তাঁহার পিতা আবদুল্লাহ বিন তুর্মাত সুস পল্লীর একটি মসজিদের বাতি জ্বালানোর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যৌবনে কর্দোবা, কায়রো এবং বাগদাদ এই তিনটি ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র পরিভ্রমণ করিয়া ধর্ম, আইন দর্শন সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানার্জন করেন। ইমাম আল গাজ্জালী, আত-তারতুশী ও অন্যান্য জ্ঞানীদের নিকট তিনি উল্লেখিত বিষয়ে অতি মনোযোগের সংগে অধ্যয়ন করেন। এই সময় ইমাম গাজ্জালীর গ্রন্থসমূহ কর্দোবাতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং সম্ভবতঃ এই ঘটনা যুবক মুহাম্মদের অন্তরে আঘাত হানে। জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি সর্বশ্রেণীর জনগণের মধ্যে নৈতিক অধঃপতন এবং তাদের শির্ক বিদাত ও অনৈসলামিক কার্যে নিপতিত দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হন। তাই ধর্মের মূল বিষয়বস্তুর দিকে লোকজনকে হেদায়েত করিবার জন্য তিনি আটলাস পর্বতের বার্বারদের মধ্যে ধর্ম সংস্কারমূলক প্রচার অভিযান শুধু করেন। তিনি তৎকালীন অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী না হইয়া কোরআন, সুন্নাহ ও এজমায়ে সাহাবার দিকে লোকজনকে আকৃষ্ট করিতে থাকেন। তিনি এক সময় নিজেকে মাহদী বলিয়া ঘোষণা করেন। অচিরেই অসংখ্য লোকজন চতুর্দিক হইতে আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে শুরু করেন। ইবনে তুর্মাত জনৈক ধনী সওদাগরের পুত্র আবদুল মুমিনকে তাহার সহকারী নিযুক্ত করেন। তাঁহার অনুসারিগণ নিজদিগকে আল মুয়াহহিদুন বা একেশ্বরবাদী বলিতেন।

মাহদী নাফিস নদের সন্নিকটে একটি জনপদে মসজিদ নির্মাণ করিয়া ইবাদত করিতে থাকেন। সেখান হইতে তিনি তাঁহার ধর্মপ্রচারের কাজের মাধ্যমে রাজনৈতিক ভাবধারা জনগণের মধ্যে প্রচার করিতে থাকেন। আবদুল মুমিন মাহদীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। তিনি তাঁহার খুবই প্রিয় অনুরক্ত হইয়া উঠেন এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার গুণাবলী অর্জন করেন। আবদুল মুমিনের ন্যায় মাহদীর আরও ১০ জন সহচর ও উপদেষ্টা ছিলেন। মুয়াহহিদুন সম্প্রদায়ের মধ্যে ৫০ জনের আরও একটি দল গঠিত হয়। তাঁহারা বার্বার গোত্রের প্রতিনিধিত্বকারী ছিলেন। এই সময় মুরাবিতগণের শাসন ব্যবস্থার গলদসমূহ মুয়াহহিদগণ জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়া নিজেদের রাজনৈতিক মতাদর্শকে ব্যাপকভাবে প্রচার করিতে থাকেন। অবশেষে ধর্মের ডাক দিয়া তাঁহারা মুরাবিতগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। মুয়াহহিদগণের স্বপক্ষে কতিপয় বার্বারগোত্র সমর্থন দিয়ে মুরাবিত শাসনকর্তার নিকট কর প্রদান বন্ধ করিয়া দেয়। সুসার গভর্ণরকে সর্বপ্রথম উৎখাত করিয়া

মাহ্দী তাঁহার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অভিযানের কূটনৈতিক সাফল্য অর্জন করেন। এই সাফল্যের ফলে বহু লোকজন মাহ্দীর দলে যোগ দিতে থাকে। ইহার পর আরও তিনটি যুদ্ধে মুরাবিতদের সঙ্গে জয়লাভ করিয়া মুয়াহ্হিদগণ মাহ্দীর নেতৃত্বে ৪০০০০ সৈন্য লইয়া মরক্কো আক্রমণ করেন। কিন্তু মাহদী জয়লাভ করিতে পারেন নাই। ফলে তাঁহাকে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। এই যুদ্ধের পর মাহ্দী আর বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। ১১২৮-৩০ সালের মধ্যে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আবদুল মুমিনকে তাঁহার দলের প্রধানরূপে মনোনীত করেন।

আবদুল মুমিন ক্ষমতার একক অধিকারী হইয়া ইতিপূর্বে উল্লেখিত ১০ সদস্য ও ৫০ সদস্যের দুইটি উপদেষ্টা ভাঙ্গিয়া একটি পরিষদে পরিণত করেন। তিনি তাঁহার সৈন্যবাহিনীকেও বিশেষ শক্তিশালী করিয়া তোলেন। এই সময়ে মুরাবিত শাসক আলি বিন ইউসুফ বিশেষ দুর্বল হইয়া পড়েন। যদিও তাঁহার রাজত্বের প্রথমদিকে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় নাই কিন্তু শেষের দিকে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা আরও মারাত্মক রূপ ধারণ করে। তবুও তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত আবদুল মুমিন মুরাবিত শক্তিকে পর্যুদস্ত করিতে পারেন নাই। আলি বিন ইউসুফের শেষ জীবনে তাশফিনকে স্পেন হইতে মরক্কোতে আসিতে নির্দেশ দেন। অতঃপর ১১৪৩ সালে আলি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাশফিন রাষ্ট্রের ক্ষমতা লইয়া সর্বপ্রধান বিপদে পড়িলেন উদীয়মান শক্তি মুয়াহহিতগণকে লইয়া। তাই তাহাদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ পরিচালনার জন্য স্পেন হইতে সংগ্রহীত ৪০,০০০ মোজারব বাহিনী নূতন করিয়া সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করেন। মুয়াহহিদগণ অচিরেই তিলিমাছান নামক স্থানে মুরাবিতগণকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করেন। এইবার তাঁহারা রাজধানী মরক্কো অবরোধ করেন। সুদীর্ঘ ১১ মাস ব্যাপী তাশফিন রাজধানীকে রক্ষা করিবার প্রয়াস চালান। নগরে খাদ্যাভাবের ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং মুয়াহহিদগণের প্রবল আক্রমণের মুখে তাশফিন ১১৪৬ সালে নগর ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। দুর্গ দখলের পর দুর্ভিক্ষকবলিত ৭০,০০০ হাজার লোককে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। মুরাবিতগণ অপেক্ষা তাঁহারা অতি সুবিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হন।

স্পেনের অবস্থা

স্পেনের আত্মকলহ ও খ্রিস্টানদের আক্রমণের দুর্দিনে মুরাবিতগণ স্পেনকে রক্ষা করিয়া সেখানে বহু দিন তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হন। তাঁহারা শুধু রাজ্যবিস্তার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং রাজ্যের জনগণের অবস্থার উন্নতির দিকেও দৃষ্টি দেন। দেশের আর্থিক ও বৈষয়িক উন্নতি হয় এবং জনগণ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে দিনযাপন করিতে থাকে, শিল্প, কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু এই সময়ে দর্শন ও স্বাধীন চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এক দুর্যোগ নামিয়া আসে। কবি ও দার্শনিকগণ স্পেনকে তাঁহাদের জন্য নিরাপদ মনে করেন নাই কারণ ধর্মান্ধ উলামা সম্প্রদায় এই বিষয়ে সম্পূর্ণ আপোষহীন ছিলেন। বিখ্যাত কবি ইবনে বাকী, দার্শনিক মালিক বিন ওহাব প্রভৃতি মনীষীগণ স্পেনে এক দারুণ নৈরাশ্যময় জীবনযাপন করেন। কর্দোবার কাজী ইবনে হামদুন আলি বিন ইউসুফের সম্মতিতে ইমাম গাজ্জালীর যাবতীয় গ্রন্থাবলী বাজেয়াপ্ত করেন। মুরাবিতগণ

শিল্পকলা ও স্থাপত্যশিল্পেরও খুব বেশি সমঝদার ছিলেন না। তাহা ছাড়া ইহুদী ও খ্রিস্টান প্রজাবৃন্দ মুরাবিত শাসনে খুশী ছিলেন না। আলফানসোর মৃত্যুর ফলে খ্রিস্টানগণ আত্মকলহে লিপ্ত হইয়া দুর্বল হইয়া পড়ে, কিন্তু মুরাবিতগণ এই সুযোগে তলেদো পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হয় নাই। তাশফিনের মৃত্যুর পর স্পেনীয় জনগণ আবার গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়ে এবং তাহারা স্পেনের সর্বত্রই বিদ্রোহের দাবানল প্রজ্জ্বলিত করে। তাশফিনের প্রতিনিধি ইবনে জামিকে শেষ পর্যন্ত বেলারিক দ্বীপপুঞ্জের দিকে বিতাড়িত করেন এবং মুরাবিতগণকে গ্রানাদায় অন্তরীণ করিয়া রাখেন। এমনিভাবে মুরাবিতগণ অসহায় হইয়া পড়ে এবং স্পেন আবার গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়। মুরাবিত ও মুয়াহহিদগণ যখন উত্তর আফ্রিকায় ক্ষমতাদ্বন্দ্বে লিপ্ত তখন খ্রিস্টানগণ মুসলিম স্পেন ভাগ-বাঁটোয়ারা, লুটপাট, হত্যাযজ্ঞ চালাইবার সুযোগ গ্রহণ করে। স্পেনের শক্তিশালী নদীবন্দর আলমেরিয়ায় দারুণ গোলযোগের সৃষ্টি হয়। ভেনিস, জেনোয়া ও ক্যাস্টাইলের শক্তি একত্রিত করিয়া খ্রিস্টানগণ আলমেরিয়া আক্রমণ করিয়া দখল করে। ইটালীয়ান নৌবহরের সাহায্যে বারসিলোনার রাজা তরতোসাও এ্যাবরো উপত্যকা অধিকার করেন। ১১৩৮ সালে মুসলিম স্পেনের উপর ভীষণ বিপদ দেখা দেয়। আলফানসো (৭ম) কর্দোবা, সেভিল, কারমোনা ও কার্দিজ পদানত ও ধ্বংস করিয়া জারেজ নগর অগ্নিতে ভস্মীভূত করেন। জায়েন ও বায়জা, উবেদা এবং আনদুজার তাহারা দখল করিয়া ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। খ্রিস্টানদের দ্বারা এইরূপে সামগ্রিকভাবে বিপদাপন্ন স্পেনবাসী আবার উত্তর আফ্রিকার সাহায্য প্রার্থী হয়।

স্পেন বিজয়

যদিও আবদুল মমিন সমগ্র উত্তর আফ্রিকা তখনও বিজয় করিতে পারেন নাই তথাপি স্পেনের অবস্থা অনুধাবন করিয়া তিনি ৩০,০০০ হাজার সৈন্য সহ আবু আমীর মুসাকে স্পেনে প্রেরণ করেন। উত্তর আফ্রিকার বার্বার সৈন্যদের নিকট স্পেনবাসী নগরদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। এবং তাহাদিগকে নূতন শাসকরূপে বরণ করে। ১৯৪৭ সালে মুসা স্পেনে উপস্থিত হইলে বাদাজোজের সৈন্যগণও তাঁহার দলে যোগ দেয়। সেভিল মালাগা এবং কর্দোবাও মুয়াহহিদগণের দখলে আসে। মুরাবিতগণ এই সকল স্থানে বাধা দিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। যে সমস্ত জেলাগুলিতে মুরাবিতগণের আধিপত্য বেশি ছিল সেখানেও ক্রমে ক্রমে মুয়াহহিদগণ নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতে থাকেন। অতএব দেখা যায় যে, তাহারা মুরাবিতগণকে পরাজিত করিয়া খ্রিস্টানদিগকেও পরাভূত করিতে আরম্ভ করেন। যদিও শক্তিশালী নদীবন্দর আলমেরিয়া ও ভ্যালেনসিয়া খ্রিস্টানদের দখলে ছিল, কিন্তু এই সময় উত্তর আফ্রিকা হইতে মুসার সাহায্যার্থে স্পেনে আবদুল মুমিন নূতন সৈন্য প্রেরণ করিতে পারেন নাই। কারণ এই সময় উত্তর আফ্রিকাতে আর একজন মাহদীর আবির্ভাব ঘটে। তিনি একজন রজকের পুত্র ছিলেন এবং নিজকে মাহদী বলিয়া ঘোষণা করেন। নূতন পথ ও মতের দিকে বার্বারগণ আকৃষ্ট হইয়া অনেক অঞ্চল আবদুল মুমিনের নিকট হইতে দখল করিয়া লয়। এমনকি তাহারা ফেজ ও মরক্কো ব্যতীত বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগের অধিকারী হইয়া বসে। কিন্তু আবদুল মুমিন অবশেষে এই মাহদীকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করিয়া পুনরায় তাঁহার শক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশে শৃঙ্খলা

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। দেশের বিপ্লব মূলোৎপাটিত করিয়া স্বীয় পুত্র আবু সাঈদের নেতৃত্বে ২০,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী আলমেরিয়া দখলের জন্য স্পেনে প্রেরণ করেন। অতি সহজেই আলমেরিয়া ও নিয়েবেলা পদানত করিয়া আবু সাঈদ গ্রানাদা জয় করেন। স্পেন বিজয়ের জন্য আবদুল মুমিন স্বয়ং স্পেনে আসিতে পারেন নাই, আবদুল মুমিন স্পেনের দিকে পুনরায় দৃষ্টি না দিয়া তিনি উত্তর আফ্রিকাতে তাঁহার শক্তি আরও সুসংহত করিতে থাকেন। ১১৬০ সালের মধ্যে তিনি আলজেরিয়া, তিউনিস, ত্রিপলী এবং মাহদীয়া পর্যন্ত অধিকার করিয়া আমিরুল মোমেনিন উপাধি ধারণ করেন। আবদুল মুমিনের রাজ্যসীমা উত্তর আফ্রিকার আটলান্টিক হইতে মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল ভূ-ভাগের অধিকর্তা হইয়া আবদুল মুমিন তাঁহার পুত্রগণকে বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত করিয়া রাজ্যকে বিদ্রোহমুক্ত করেন। তাঁহার জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি ৫০০০০০ লাখের এক বিশাল বাহিনী লইয়া সমগ্র স্পেন বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার পরিকল্পনা সফল হয় নাই। তিনি ১১৬৩ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আবদুল মুমিনের কৃতিত্ব

সুদীর্ঘ ৩৩ বৎসর কাজ করিয়া আবদুল মুমিন শাসনকার্য ও সামরিক শক্তিতে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। শুধু দেশ জয় করিয়াই তিনি বিজয়ী খেতাবে সন্তুষ্ট ছিলেন না। বিজিত অঞ্চলে শাসন, শৃঙ্খলা ও জনগণের কল্যাণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁহার যোগ্যতা ও মহত্ত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেন। তিনি পুরাতন দুর্গগুলি সংস্কার করিয়া সেইগুলি শক্তিশালী করেন। প্রয়োজনে নূতন দুর্গও গড়িয়া তোলেন। ভূমধ্যসাগরে তাঁহার রণতরীর শুভ্র পতাকা সগৌরবে উড্ডীন ছিল। দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পের যথেষ্ট উন্নতিবিধান করেন। দেশ-বিদেশ হইতে বহু জ্ঞানী ও মনীষী মরক্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানের সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন। এই সময়ে মরক্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল অনূন্য ৩০০০০ হাজার। দেশের প্রধান শহরে স্কুল-কলেজ স্থাপিত করিয়া জ্ঞানের সেবা করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। স্পেনের শাসন যতদূর সম্ভব তিনি নিজেই চালাইতেন। সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল সজাগ। তবে সময়ের অভাবে স্পেনের অবস্থার উন্নতি করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

আবু ইয়াকুব ইউসুফ

আবদুল মুমিনের মৃত্যুর পর আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ পিতার স্থলাভিষিক্ত হন, কিন্তু শাসন ব্যাপারে অযোগ্যতার জন্য কিছুদিন পরেই সভাসদগণ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তৃতীয় পুত্র আবু ইয়াকুব ইউসুফকে সিংহাসনে বসান। শক্তি, সাহস ও রণনৈপুন্যে আবু ইয়াকুবের যোগ্যতা ছিল প্রশংসনীয়। সিংহাসনে বসিবার সঙ্গে সঙ্গেই আটলাসের বার্বার গোত্রেরা তাঁহাকে নানাবিধ অসুবিধার মধ্যে নিক্ষিপ্ত করে, কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে তাঁহারা সহজেই পরাভূত হয়। আভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিরসনের পর তিনি

স্পেনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তিনি ২০০০০ সৈন্যসহ সেভিলে উপস্থিত হন। ভ্যালেনসিয়ার শাসক ইবনে সা'দ মিনকা যুদ্ধে নিহত হন এবং তাঁহার পুত্রগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াও তাহাদের রাজ্য ভ্যালেনসিয়া, মুরসিয়া, লোরসা প্রভৃতি অঞ্চল রক্ষা করিতে পারে নাই। তবে ইউসুফের সঙ্গে ভগ্নীর বিবাহ দিয়া একটি আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া নিজেদের প্রতিপত্তি সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হন। ইউসুফ এক বৎসর স্পেনে অবস্থান করিয়া তাগুস হইতে কর্দোবা পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল দখল করেন এবং শাসন ও পূর্তকার্যে জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেন। তিনি রাজ্যময় মসজিদ, মিনার, দুর্গ, সেতু ও স্নানাগার তৈয়ার করেন। তাঁহার নির্মিত মসজিদ ও জিরাল্ডা মিনার সত্যই স্থাপত্যশিল্পের খ্যাতির দাবীদার। তবে জিরাল্ডা মিনার তাঁহার সময়ে শেষ হয় নাই। তাঁহার বংশধরেরা ইহাকে আরও সুন্দর, মনোরম ও কারুকার্যময় করিয়া তোলেন। স্পেনের মুসলিম স্থাপত্যশিল্প দর্শনের মধ্যে ইহা অনন্য কীর্তি। ১১৭৬ সালে উত্তর আফ্রিকায় ভীষণ আকারে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে ইউসুফকে সেখানেই থাকিতে হয়। এই আট বৎসর পর্যন্ত তিনি স্পেনে আসিতে পারেন নাই। তাঁহার অনুপস্থিতির ফলে জনগণ ও গভর্ণরদের উচ্চাভিলাষ বৃদ্ধি পায় এবং অনেকেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ঠিক পিতার ন্যায় তিনি এই অবাধ্য গভর্ণরদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার মানসে ৭০ হাজার পদাতিক ও ৩০ হাজার অশ্বারোহী সিউটাতে সমবেত করেন। অতঃপর সেভিলে উপস্থিত হইয়া আরদ্ধ কার্য শুরু করেন। ১১৮৪ সালে মানতারিম দুর্গ অবরোধকালে ইউসুফ খ্রিস্টানদের দ্বারা আহত হন এবং এই যুদ্ধে মুসলমানেরা ভীষণভাবে পরাজয় বরণ করেন। এই আঘাতের দরুণ তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

আবু ইউসুফ ইয়াকুব

আবু ইয়াকুব ইউসুফের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আবু ইউসুফ ইয়াকুব ক্ষমতার অধিকারী হন। তিনি ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি আল মনসুর বিল্লাহ উপাধি গ্রহণ করেন। দয়া, ধর্ম, সুবিচার ও জনকল্যাণে তিনি ছিলেন বিখ্যাত। দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা সুসংহত ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানকল্পে তিনি পুলিশের শক্তি ও সংখ্যাকে বৃদ্ধি করেন। ধৃত অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। যাতায়াতের রাস্তাগুলিকে বিপদমুক্ত করিয়া পথিকদের নিরাপত্তা বিধান করেন। তাহাদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য প্রয়োজনমাফিক রাস্তার পার্শ্বে কূপ খনন করেন এবং সরাইখানা নির্মাণ করেন। জনসাধারণ যাহাতে অহেতুক করভারে নিগ্রহ ভোগ না করে তাহার জন্য তিনি সকল প্রকার নির্যাতনমূলক কর রহিত করেন। প্রাচ্যের হারুন-অর-রশিদ আর প্রতীচ্যের আবদুর রহমান (৩য়) এর ন্যায় তিনি ছিলেন প্রজাহিতৈষী শাসক। শিক্ষা, শিল্প ও কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি করিয়া রাজ্যের মঙ্গল সাধন করেন। শিল্প প্রতিষ্ঠান, সেচ প্রকল্প ও স্থাপত্যশিল্প প্রতিষ্ঠায় তাঁহার খ্যাতি ও গৌরব অদ্যাবধি অম্লান ও চির ভাস্বর। তাঁহার পিতা কর্তৃক নির্মীয়মাণ সেভিল মসজিদের জিরাল্ডা মিনার তিনিই সমাপ্ত করেন। ইহার উচ্চতা ৩০০ ফুট এবং ইহা ছিল একাধারে মিনার ও মানমন্দির। এই বিখ্যাত মিনারটির নির্মাণকার্য শুরু হয় ১৯৭২ সালে এবং সমাপ্ত হয় ১১৯৫ সালে। ভিত্ হইতে ৮৭ ফুট

উচ্চতা পর্যন্ত ইহা প্রস্তরে নির্মিত ছিল এবং বাকী অংশে ছিল ইটের গাঁথুনী। ইহা ব্যতীত মরক্কোতে প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালটি তৎকালীন বিশ্বে ছিল অদ্বিতীয়। তাঁহার দরবার বিখ্যাত জ্ঞানসাধকদের দ্বারা অলংকৃত ছিল। তাঁহাদের মধ্যে বিখ্যাত জ্ঞান চিকিৎসক ইবনে জুহর (Aven Zoar) ও ইবনে বাজ্জাহ (Avempace) এবং প্রখ্যাত দার্শনিক ইবনে রুশ্‌দ (Averroes)। ইবনে রুশ্‌দ কার্দোবার কাজী ছিলেন। শাসন ও সমরক্ষেত্রে তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব সুদূরপ্রসারী ছিল। সালাউদ্দীন আইয়ুবী তাঁহার নিকট ক্রুসেড্‌দের বিরুদ্ধে সাহায্য কামনা করিয়া প্রেরণ করেন। তিনি ১৮০ খানা জাহাজ বোঝাই করিয়া খ্রিস্টানদের মোকাবেলার জন্য মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করেন। অতএব ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, ইয়াকুব ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের একজন খ্যাতিমান শাসক।

ইয়াকুব ক্ষমতায় আসিবার অব্যবহতি পরেই কয়েকজন বিদ্রোহীর সম্মুখীন হন। ইয়াকুবের ভ্রাতাগণও এই বিদ্রোহীদের সঙ্গে ঐক্যজোট গঠন করেন কিন্তু ইয়াকুব এই সমস্ত বিদ্রোহীর স্পর্ধা নীরবে সহ্য করিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি সৈন্য প্রেরণ করিয়া বিদ্রোহীদের হত্যা করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে তাঁহার আপন ভ্রাতাগণও ছিলেন। এই সময় ইয়াকুব আর একটি সাংঘাতিক সমস্যার সম্মুখীন হন। তৃতীয় ক্রুসেডের জন্য সারা খ্রিস্টানবাহিনী জেরুজালেমের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। তাঁহারা মুসলিম শক্তিকে উৎখাত করিবার জন্য প্রাণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। কতিপয় ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ জেরুজালেম যাওয়ার পথে মুসলিম স্পেনের কয়েকটি শহরে (বেজা এভোরা ও সালভিস) হত্যাযজ্ঞ চালায়। তাহার পর ক্যাষ্টিলিয়ান সৈন্যরা ফরাসীবাহিনী দ্বারা পুষ্ট হইয়া মুসলিম স্পেন আক্রমণ করেন। খ্রিস্টানদের এই দুঃসাহসিক কার্যের কথা শ্রবণ করিয়া ইয়াকুব ৩ লক্ষ সৈন্যবাহিনীর এক বিশাল বহর লইয়া স্পেনে উপনীত হন। বাদাজোজের নিকট আলারকাসে আলফানসো (৮ম) এর নেতৃত্বে খ্রিস্টানগণ মুসলিম বাহিনীর সম্মুখীন হয়। এই ভীষণ যুদ্ধে প্রখ্যাত সেনাপতি সানানী ও ইয়াকুব বীরবেগে মুসলিম বাহিনী পরিচালনা করিয়া খ্রিস্টান শক্তির দর্পচূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করেন। এই ভয়াবহ যুদ্ধে খ্রিস্টানদিগকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়। খ্রিস্টানগণ অনেকে পালাইয়া কালাতরাভাতে চলিয়া যায় এবং আলফানসো তলেদোতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং লিয়োন ও সাভারি রাজগণকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। তলেদোও হস্তগত হয় কিন্তু আলফানসোর বৃদ্ধ মাতার ও স্ত্রীর অনুরোধে ইয়াকুব নগরের ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হইতে বিরত থাকেন। এইভাবে মুসলিম স্পেনের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া ইয়াকুব খ্রিস্টানদিগকে শায়েস্তা করেন। তিনি তাঁহার প্রশাসনিক কেন্দ্র সেভিলের শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠন করিয়া ১১৯৭ সালে মরক্কোতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই যোগ্য অভিজ্ঞ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক এবং সামরিক শক্তির পুনরুজ্জীবক শাসনকর্তা ১১৯৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। ক্রুসেড যুগে তাঁহার মত শক্তিশালী শাসন এবং ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম শক্তির দেদীপ্যমান সমরনায়ক তৎকালীণ যুগে সত্যই বিরল ছিল। শুধু মুয়াহহিদ বংশে নহে বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

মুহাম্মদ আল-নাসির বিন ইয়াকুব

পিতার মৃত্যুর পর তিনি ১১৯৯ সালে আল নাসির দ্বীন ইল্লাহ্ উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে বসেন। তবে পিতার ন্যায় তিনি কি সমরক্ষেত্রে, কি আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমনে, কি শিক্ষা সভ্যতার বিস্তারে সুনাম অর্জন করিতে পারেন নাই। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু এবং উদার। এই জন্যই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় যোগ্যতার স্থলে ব্যর্থতার পরিচয় প্রদান করেন। অবশ্য ইয়াকুবের মৃত্যুতেই মুয়াহহিদ বংশের পতনের ঘন্টাধ্বনি বাজিয়া উঠে। বেলারিক দ্বিপপুঞ্জ ও ফেজে আবার বিদ্রোহের দাবানল জ্বলিয়া উঠে যদিও ফেজের বিদ্রোহ দমন করিতে বিলম্ব হয় নাই তথাপি বেলারিক দ্বীপপুঞ্জের বিশৃঙ্খলা আরও জটিল আকার ধারণ করে। কারণ সেখানে ইউসুফ বিন তাশফিনের ইয়াহয়া নামক একজন বংশধর নিজের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি এতদূর শক্তিসঞ্চয় করেন যে, উপকূলীয় অঞ্চলগুলি দখল করিয়া মাহ্দীয়াও অধিকার করিয়া বসেন। পরে কায়রোয়ান দখল করিতে গেলে তিনি পরাজিত হইয়া সাহারার দিকে পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

স্পেনের অবস্থা এই সময় গুরুতর আকার ধারণ করে। আলফানসো (৯ম) তাঁহার শক্তিকে বৃদ্ধি করিয়া মুসলিম স্পেনের উপর নিপতিত হন। সেভিল ও কর্দোবা পর্যন্ত তিনি তাঁহার প্রভাব কায়েম করিতে সক্ষম হন। মুসলিম স্পেনের এই বিপদে মুহাম্মদ ৩ লক্ষের এক সৈন্যবাহিনী লইয়া স্পেনে উপনীত হন। কিন্তু তিনি ছিলেন বড়ই অদূরদর্শী। কালাতরাভার গভর্ণর ইউসুফ বিন কাজীকে তিনি নিহত করেন। কারণ তাঁহার অপরাধ ছিল খ্রিস্টানদের নিকট তিনি পরাজিত হইয়াছেন। এদিকে ইউসুফ ছিলেন জনগণের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র। তাই মুহাম্মদের এই নৃশংসতায় তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে এবং তাহার সহযোগিতা করা হইতে বিরত থাকে। আত্মকলহ ও দ্বন্দ্বের মুহূর্তে খ্রিস্টানগণ দ্বিগুণ শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে। এই সময় সমগ্র খ্রিস্টান জগৎ মুসলিম স্পেনকে গ্রাস করিবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করে। মুসলিমদিগকে সামগ্রিক অধঃপতন আর খ্রিস্টানদের নবজাগরণ স্পেনের মুসলিম শাসনের অবসানের কারণ। সমগ্র ইউরোপ হইতে দলে দলে খ্রিস্টানগণ তাহাদের পর্তুগাল প্রভৃতি স্থান হইতে ব্যাপকভাবে ক্রুসেডের ডাকে বিপুলভাবে সাহায্য আসে। এই প্রচণ্ড রণদামামা অলি আকাব নামক প্রান্তরে বাজিয়া উঠে। মুহাম্মদ সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া খ্রিস্টানদের মোকাবেলায় উপস্থিত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ছিল মুহাম্মদের সৈন্যবাহিনী হইতে ৬০,০০০ সৈন্য তাঁহাকে ত্যাগ না করিত, তবে হয়ত স্পেনের ভাগ্যাকাশে গৌরব রবি অস্তমিত এত ত্বরিতে হইত না। অবশিষ্ট বার্বার সৈন্যগণ প্রাণপণ লড়াই করিয়াও যুদ্ধের গতি মুসলমানদের অনুকূলে আনিতে ব্যর্থ হন। এই যুদ্ধে খ্রিস্টানগণ জয়ী হয় এবং অসংখ্য মুসলমান এই যুদ্ধে প্রাণ হারান। মুহাম্মদ কোনক্রমে ৪ হাজার সৈন্য লইয়া সেভিলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভগ্ন হৃদয়ে পরাজয়ের গ্লানি লইয়া তিনি মরক্কোতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১২১৪ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। স্পেনের এই ভাগ্য নির্ধারণী যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের ফলে মুসলিম জনগণের মধ্যে আসে দারুণ হতাশা আর চরম নিরাপত্তাহীনতা। তাহারা এইবার লক্ষ্য করিল খ্রিস্টানদের রোষ আর নৃশংসতা। তাই দলে দলে মুসলমানগণ উত্তর আফ্রিকাতে হিযরত করিতে শুরু করেন। বলা হয় যে,

৫ লক্ষাধিক লোক স্পেন ত্যাগ করিয়া উত্তর আফ্রিকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। মুহাম্মদের মৃত্যুর ১৫ বৎসরের মধ্যে ৪ জন শাসনকর্তার রদবদল হয়। এবং অবশেষে আবু আলি ইদ্রিস আল মামুনই একটু কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন। বাকী তিনজন যথাক্রমে ইউসুফ আবু ইয়াকুব আল মুসতানসির বিল্লাহ্, ওয়াহিদ আল মাখলু ও আবু মুহাম্মদ আল আদিল ছিলেন অযোগ্য ও দুর্বল।

আবু আলি ইদ্রিস ছিলেন এই দুর্বল শাসকদের মধ্যে একটু শক্তিশালী। তিনি সেভিলের গভর্ণর হিসাবে যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করেন। এই সময় উত্তর আফ্রিকার সঙ্গে স্পেনের গভর্ণরদের সদ্ভাব না থাকায় স্পেন লইয়া খ্রিস্টানগণ আবার রণ উন্মাদনায় মাতিয়া উঠেন। আফ্রিকা হইতে মামুনের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে উৎখাত করিবার ষড়যন্ত্র করা হয় কিন্তু মামুন এইবার খ্রিস্টানদের সাহায্য কামনা করেন। ক্যাষ্টাইল অধিপতি ফার্ডিনাণ্ড (৩য়) এর সহায়তায় আফ্রিকান বাহিনীকে পরাজিত করেন। তবে সুচতুর ফার্ডিনাণ্ড মুসলিম স্পেনের অবস্থা সরজমিনে দেখিয়া সুযোগ গ্রহণ করেন। দেশে লুণ্ঠনকার্য দ্বারা সীমান্তবর্তী লোজা ও প্রিয়েজো দুর্গ দখল করিয়া জায়েন অবরোধ করেন। এইবার মামুন সসৈন্যে খ্রিস্টানদের মোকাবেলা করিতে আসেন। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে অবরোধকারীদের বিতাড়িত করিয়া হৃত অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করেন। ১২২৮ সালে স্পেনের অবস্থা আয়ত্তে আনিয়া তিনি উত্তর আফ্রিকায় গমন করেন। তবে তাঁহার অনুপস্থিতিতে স্পেনে ব্যাপকভাবে বিদ্রোহ শুরু হয়। মামুন মরক্কোতে ১২৩২ সালে মৃত্যুবরণ করেন। মামুনের মৃত্যুতে মুয়াহিদগণের শক্তি একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং স্পেনের বিদ্রোহাত্মক অবস্থা মারাত্মক আকার ধারণ করে। যদিও মামুনের পর আরও চারজন শাসক মুয়াহহিদ শক্তির শাসনভার গ্রহণ করেন তথাপি তাঁহারা আর স্পেনের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবসর পান নাই। এমনিভাবে ১২৬০ সালে স্পেন ভূমি হইতে মুয়াহহিদগণের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়। মুয়াহহিদগণের শেষ শাসক আবুল উল আবু দাবালাছ ১২৬৯ সালে বনু মারিন গোত্রের বার্বারদের দ্বারা যুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার হত্যাই মুয়াহহিদ বংশের ১২৫ বৎসরের রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটায়।

মুয়াহহিদগণের পর স্পেনের অবস্থা

মুয়াহহিদগণ যতদিন প্রবল ও শক্তিশালী ছিলেন ততদিন স্পেনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু মুয়াহহিদগণের দুর্বল শাসন আমলে যদিও স্পেনের উন্নতি ব্যাহত হয় তবুও রাজনৈতিক ভারসাম্য বজায় ছিল। কিন্তু মুয়াহহিদগণের পতনের পর স্পেনে দেখা দেয় মারাত্মক গোলযোগ, বিদ্রোহ আর অশান্তি। দেশের তিনটি স্পেনীয় শক্তির অস্তিত্ব ঘোষণা করিলেও আদতে তাহাদের শক্তি ছিল সীমিত। অন্যদিকে খ্রিস্টানগণ ক্রমান্বয়ে শক্তি সঞ্চয় করিয়া মুসলমানদের দুর্বলতা ও অনৈক্যের সুযোগ গ্রহণ করে। স্পেনীয় তিনটি রাজ্যের মধ্যে গ্রানাদার বনু নসর বংশ কিয়ৎকাল খ্রিস্টানদের সঙ্গে মোকাবেলা করিয়া মুসলিম শান্তি, শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতা বজায় রাখে। কিন্তু আলফানসো (৮ম) এর মুসলমানদের উপর বিজয়ের পর ক্রমে ক্রমে

স্পেনে আধিপত্য বিস্তার হইতে থাকে। কিন্তু আলফানসো (৮ম) এর পৌত্র ফারনাণ্ডো (৩য়) এর সময় হইতে মুসলিম স্পেনের দ্রুত পতন শুরু হয়। একদিকে মুসলিম শক্তির অনৈক্য অন্যদিকে খ্রিস্টানদের ক্রুসেডের উন্মাদনা। তাই তাঁহারা ঝঞ্ঝাবেগে একের পর এক মুসলিম জনপদগুলি কব্জা করিতে শুরু করে। ১২৪৬ সালে জায়েন ও মুরসিয়া এবং ১২৪৮ সালে সেভিল খ্রিস্টানগণ অধিকার করিয়া লয়। মুসলমানদের নিকট হইতে বেলারিক দ্বীপপুঞ্জ, ভ্যালেনসিয়া, আলসি, আলিকান্তি ও নিয়েবলাও শেষ পর্যন্ত হস্তচ্যুত হইয়া যায়। সমগ্র স্পেন খ্রিস্টানদের অধিকারে চলিয়া যায়, কেবল বাকী থাকে ক্ষুদ্র গ্রানাদা রাজ্য ও কয়েকটি ক্ষুদ্র বন্দর। এইগুলি মুসলমানদের হাতে রহিল কারণ এই সময় খ্রিস্টান রাজ্যের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।

খ্রিস্টানদের দ্বারা মুসলিম জনপদগুলি হস্তগত হওয়ার পর সেখানে শুরু হয় অত্যাচর আর মুসলিম নিধন ও উচ্ছেদের তাণ্ডবলীলা। জানমাল ইজ্জত লইয়া মুসলমানগণ চরম অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে কাল কাটাইতে থাকে। আশ্বাস না পাইয়া তাঁহারা দেশ ত্যাগ করিতে শুরু করে। এমনিভাবে এককালে মুসলিম শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র এবং তাঁহাদের হাতে গড়া সাধের সৌধ ত্যাগ করিয়া শূন্য হাতে দেশত্যাগ করিতে হয়। খ্রিস্টানগণ ইহুদিগণকে এই সময় কিছুটা সুযোগ ও সুবিধা দান করে। কারণ তাহারা মুসলিম উচ্ছেদে খ্রিস্টানদের সাহায্য করে। এই জন্য মুসলিম পরিত্যক্ত আবাসভূমিতে তাহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়।

সপ্তদশ অধ্যায়

গ্রানাদায় নসর বংশ ও মুসলিম রাজত্বের শেষ অধ্যায়
(১২৩২-১৪৯২)

[**সার সংক্ষেপ :** সূচনা ❑ মুহাম্মদ (১ম) ❑ চরিত্র ❑ মুহাম্মদ (২য়) ❑ মুহাম্মদ (৩য়) ❑ আলনসর ❑ আবদুল ওয়ালিদ ইসমাইল (১ম) ❑ মুহাম্মদ (৪র্থ) ❑ ইউসুফ (১ম) ❑ মুহাম্মদ (৫ম) ❑ ইসমাইল (২য়) ❑ আবু সাঈদ মুহাম্মদ (৬ষ্ঠ) ❑ আবদুল্লাহ ইউসুফ (২য়) ❑ বোয়াবদিল।]

স্পেনে মুসলিম রাজত্বের শেষ অধ্যায়ে গ্রানাদায় নসর বংশের উত্থান-পতন উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সুদীর্ঘ আড়াইশত বৎসরের অধিকাকাল এই বংশ গ্রানাদার বিপুল বৈভব ও বিস্তর শান-শওকতের সহিত তাঁহাদের আধিপত্য কায়েম রাখেন। খ্রিস্টানদের সহিত মোকাবেলা করিয়া কিছুকাল তাহারা নিজেদের প্রধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় অপূর্ব উৎকর্ষ সাধন করেন। এই সময়ে তাহারা তমসাচ্ছন্ন ইউরোপ ভূখণ্ডে জ্ঞানের বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করেন। বনু নসর বংশ এই জন্য স্পেনের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান দখল করিয়া আছে।

বনু নসরের মত তাহাদের আদিপুরুষ হইলেন হযরত মুহাম্মদের (সা.) সমসাময়িক মদীনার খাজরাজ দলপতি সাদ বিন উবাদা। উমাইয়াগণ যখন স্পেন বিজয় করিতে আসেন তখন বনু নসরের পিতৃপুরুষগণ সেনাপতি মুসার সৈন্যদলে ছিলেন। তাহার পর হইতে তাঁহারা সেনাবাহিনীতে বিশেষ সম্মানের পদ দখল করিয়া স্পেনে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন।

মুহাম্মদ (১ম) (১২৩২-১২৭২)

১২৩২ সালের দিকে মুয়াহহিদগণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। তাঁহাদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া খ্রিস্টানগণ ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের অধিকৃত অঞ্চল ও দুর্গগুলি হস্তগত করিতে থাকে। মুরসিয়াতে বনু হুদ ও ভ্যালেনসিয়াতে বনু মারাদানিস সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা লইয়া আত্মকলহে নিমগ্ন হয়। এহেন সংকটময় মুহূর্তে মুহাম্মদ বিন ইউসুফ বিন আহমদ বিন নসর ছিলেন কর্দোবার আরজোনা দুর্গের অধিপতি। মুহাম্মদ সাধারণতঃ ইবনুল আহমর নামেই পরিচিত। তিনি পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া

আরজোনাতে সুলতান উপাধি লইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। জায়েন, বায়রজা প্রভৃতি অঞ্চলের জনগণ তাঁহাকে বিপুলভাবে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ইবনুল আহমর বনু হুদের বিরুদ্ধে মোকাবেলার জন্য ক্যাষ্টাইলের রাজার সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি করেন। তিনি ফার্ডিনাণ্ডের সঙ্গেও অনুরূপ চুক্তি করেন। তাহাদের সাহায্যে ১২৩৭ সালে গ্রানাদা দখল করেন এবং পরবর্তী বৎসরে মালাগা ও আলমেরীয়া দখল করেন। গ্রানাদা অধিকারের পর এখানে তিনি তাহার রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি এই সময়ে আল গালিব বিল্লাহ উপাধি গ্রহণ করেন।

তিনি নিজের জন্য বিখ্যাত আলহামরা প্রাসাদ ও দুর্গ নির্মাণ করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ আলহামরাকে আরও সম্প্রস্যারিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া তোলেন। খ্রিস্টানদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া বহু পণ্ডিত মনীষী এবং সাধারণ লোক গ্রানাদায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। আগালিব বিল্লাহ নিজের অবস্থাকে সুদৃঢ় করেন এবং খ্রিস্টান শক্তির যথার্থ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিক ছিলেন। ক্ষমতা দখলের জন্য খ্রিস্টানদের সাহায্যে প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। কারণ তিনি জানিতেন খ্রিস্টানগণ সুযোগ পাইলে তাঁহাকেও রাজ্যহারা করিতে দ্বিধা করিবে না তাই তাহাদের সম্ভাব্য হামলার জন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করেন। নূতন করিয়া দুর্গ নির্মাণ ও পুরাতনগুলির সংস্কার সাধন করিয়া সেগুলিকে শক্তিশালী করেন। জিব্রালটারও উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণ খ্রিস্টান শাসনের নাগপাশ হইতে মুক্তির জন্য আল-গালিব বিল্লালের সাহায্য কামনা করেন। অতঃপর খ্রিস্টানগণ গ্রানাদা আক্রমণের জন্যও অভিযান শুরু করে। কিন্তু আল গালিব সে প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া কর্দোবা দখলের চেষ্টা করেন। খ্রিস্টানদের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ হয়। কিন্তু মালাগা ও ওয়াদি আসের মুসলিম গভর্ণরদের বিশ্বাসঘাতকতা ও খ্রিস্টানদের পক্ষ অবলম্বনের জন্য আল-গালিব যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। পরবর্তীকালে গালিব মুসলিম গভর্ণরদের সমুচিত শাস্তিবিধান ও খ্রিস্টানদের দর্প খর্ব করিবার জন্য এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি তাহা সফল করিবার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

চরিত্র

নসর বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আল-গালিব বিল্লাহ একজন যোগ্য, বুদ্ধিমান, সমরকুশলী ও দূরদর্শী শাসক ছিলেন। পতনোন্মুখ মুসলিম স্পেনে তাঁহার আবির্ভাব অন্ততঃ আড়াই শত বৎসরের জন্য মুসলমানদের স্বাধীনভাবে বসবাসের নিশ্চয়তা দান করে। অর্থাৎ মুসলমানদের জীবন, সম্পদ ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য তাঁহার অবদান অবিস্মরণীয়। মৌরিতানিয়ার মারিণীয় নরপতিদের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল প্রগাঢ়। তাহাদের নামের সঙ্গে নিজ নামের সংযুক্তিতে মসজিদে খুতবা পঠিত হইত। শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতির জন্য তিনি উদার হস্তে অর্থ ব্যয় করিতেন। জনসাধারণের কল্যাণের জন্য তাঁহার দৃষ্টি ছিল উদার। তিনি সড়ক, সেতু, স্নানাগার ও হাসপাতাল নির্মাণ করিয়া জনগণের হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হন। সদাশয় ও দয়ালু শাসক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল প্রচুর।

মুহাম্মদ (২য়) (১২৭২-১৩০২)

১২৭২ সালে ইবনুল আহমরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি বিদ্বান ও আইনজ্ঞ ছিলেন এবং জ্ঞানসাধনার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। ইবনুল আহমরের মৃত্যুতে ক্যাষ্টাইলরাজ মনে করিয়াছিলেন যে, গ্রানাদায় যুদ্ধ শুরু হইবে ও তাহার সুযোগ লইয়া উহা হস্তগত করা সহজ হইবে কিন্তু মুহাম্মদ (২য়) সে সুযোগ দেন নাই। ১২৭৪ সালে ক্যাষ্টাইলবাসীগণ নানা গনজালেজ দ্যালাবার নেতৃত্বে গ্রানাদা আক্রমণ করেন। কিন্তু মারিণীয় অধিপতির সাহায্যে মুহাম্মদ তাহাদিগকে পরাজিত করেন। প্রায় ৮০০০ হাজার খ্রিস্টান তাহাদের সেনাপতি সহ নিহত হয়। পুনরায় আরাগণের রাজা জেমস্ (১ম) এর পুত্র স্যানকোর নেতৃত্বে খ্রিস্টানগণ মুহাম্মদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিন্তু এইবারও জায়েনের নিকটে তাহারা পরাজিত হয় এবং স্যানকো নিহত হয়। ক্রমাগত দুইটি যুদ্ধে মারিণীয় সৈন্যরা তাহাকে সাহায্য করিয়া জয়যুক্ত করাতে প্রতিদান স্বরূপ মুহাম্মদ আলজিসিরাস ও তারিফা মরক্কোর সুলতানকে অর্পণ করেন। আফ্রিকান সৈন্যরা স্পেন ত্যাগ করিবার পর খ্রিস্টানগণ কয়েকবার গ্রানাদা অধিকারের জন্য আক্রমণ চালাইয়া ব্যর্থ হয়। মুহাম্মদ ৩০ বৎসর রাজত্ব করিবার পর ১৩০২ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মুহাম্মদ (৩য়) (১৩০২-১৩০৯)

মুহাম্মদ (৩য়) একই নামে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তাহার রাজত্বকাল স্বল্পস্থায়ী। আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং আলমেরিয়া ও গোয়াডেক্সর গভর্ণরদের স্বাধীনতা ঘোষণা তাহার রাজত্বকালকে দুর্যোগপূর্ণ করিয়া তোলে। এই গোলযোগের মধ্যেও তিনি শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং বিশেষভাবে স্থাপত্যশিল্পে যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করেন। তিনি গ্রানাদার জামে মসজিদ সুন্দর ও সুদৃশ্য করিয়া নির্মাণ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই মসজিদ গ্রানাদা পতনের পর গীর্জায় রূপান্তরিত হয়। তিনি ১৩০৯ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৩০৯ সালে আবুল জায়ুশ নসর বিন মুহাম্মদ বিদ্রোহী হইয়া তাহাকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। এইভাবে তাঁহাকে আল মুনিকারে বন্দী অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করিতে হয়।

আল নসর (১৩০৯-১৩১৪)

আবু নসর সিংহাসন অধিকার করিয়া শান্তিতে কাল কাটাইতে পারেন নাই। তাঁকে ক্যাষ্টাইল ও আরাগনীয়দের সঙ্গে কয়েকটি যুদ্ধ করিতে হয়। ফার্ডিনাণ্ড (৪র্থ) আলজিসিরাস আক্রমণ করিলে তিনি তাহাদের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হন ; এবং বহু অর্থ প্রদানে এবং বার্ষিক কর প্রদানে স্বীকৃত হইয়া তাহাদিগকে বিদায় করেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ ওয়ালিদ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। তিনি সে চেষ্টাও ব্যর্থ করিয়া দেন। একদা অসুস্থতার সুযোগ লইয়া মুহাম্মদ (৩য়) সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিবার প্রয়াস চালান কিন্তু নসর এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ করিয়াছেন। এইভাবে বারংবার আভ্যন্তরীণ শত্রুতা ও বহিঃ আক্রমণ দ্বারা বিপদাপন্ন হওয়ার জন্য তাঁহাকে দুর্ভাগ্য শাসক বলিয়া অভি-হিত করা হয়। এই সময় ফার্ডিনাণ্ডের মৃত্যু ঘটে এবং তের মাসের শিশু আলফানসো

(১১শ) সিংহাসন লাভ করেন ও তাঁহাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এই সময় মুসলমানদের নিকট তাহাদের হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের একটা সুযোগ আসে। কিন্তু গ্রানাদায় প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ফলে সে সুযোগ হইতে নসর বঞ্চিত হন। ১৩১৪ সালে নসর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল ওয়ালিদের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পরে তিনি গোয়াডেক্সের গভর্ণরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৩২১ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আবদুল ওয়ালিদ ইসমাইল (১ম) (১৩১৪-২৫)

ইসমাইল ছিলেন বনু নসর বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইবনুল আহমারের ভ্রাতা ইসমাইলের পৌত্র। ১৩১৬ সালে ক্যাষ্টাইলবাসীগণ তাঁহার নিকট হইতে কয়েকটি নগর অধিকার করিয়া লয়। তথাপি তিন বৎসর পর তিনি ১৩১৯ সালে শক্তিশালী বায়জা দুর্গ অবরোধ করেন। শায়খ আল গুজ্জাতের সাহায্যে তিনি খ্রিস্টানদিগকে পরাজিত করেন। ১৩১৯ সালে পেড্রোর নেতৃত্বে শেষবারের মত গ্রানাদা দখলের জন্য এক বিরাট বাহিনী অগ্রসর হয়। তাঁহার সঙ্গে পঁচিশ জন যুবারাজও ছিলেন। তন্মধ্যে ইংলণ্ডের একজন যুবরাজও ছিলেন। কিন্তু ডন পেড্রোসহ সকলেই যুদ্ধে নিহত হন। এই বিজয়ের পর ইসমাইল গ্রানাদায় বিপুল আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়া অভ্যর্থিত হন। কিন্তু ১৩২৫ সালে তিনি মুহাম্মদ বিন ইসমাইল কর্তৃক নিহত হন। ইসমাইল ছিলেন জনগণের অত্যন্ত প্রিয় এবং খ্রিস্টান শক্তির প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ।

মুহাম্মদ (৪র্থ) (১৩২৫-৩৩)

ইসমাইলের চার পুত্রের মধ্যে ১২ বৎসর বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ (৪র্থ) সিংহাসন লাভ করেন। সুচতুর মন্ত্রী আল মাশুরুক তাঁহার অভিভাবকত্ব লইয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। তিনি কৌশলে অনেক যোগ্য ও বিজ্ঞ সভাসদ এবং মুহাম্মদের ভ্রাতাদের দরবার হইতে অপসারণ করেন। কিন্তু মন্ত্রী তাঁহার উদ্দেশ্যে শেষ পর্যন্ত পৌছাইতে পারেন নাই। কারণ মুহাম্মদ বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যোগ্যতা ও তেজস্বিতার পরিচয় প্রদান করিয়া শাসনকার্য স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী মাশুরুককে পদচ্যুত করিয়া বন্দী করেন এবং তদস্থলে ইবনে ইয়াহয়াকে নিয়োগ করেন। রাজকীয় বাহিনীর প্রধান উসমান মুহাম্মদের সঙ্গে বিরোধিতা শুরু করেন এবং তিনি রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়া আনদারাক্সে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি ক্যাষ্টাইলবাসী এবং মরক্কোর সুলতান আবুল ইমাম আলীকে গ্রানাদা আক্রমণে আমন্ত্রণ জানান। আফ্রিকার সৈন্যবাহিনী আলজিসিরাস আক্রমণ করিলে প্রধানমন্ত্রী তাহা প্রতিহত করিতে যাইয়া প্রাণ হারান। তাঁহার পর তাঁহারা রোনদা এবং মারবেলা অধিকার করিয়া গ্রানাদার দিকে অগ্রসর হন। এইবার মুহাম্মদ তাঁহার সুশিক্ষিত ও অনুগত সৈন্য লইয়া আফ্রিকান সৈন্যদের মোকাবেলা করেন। তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া একে একে সকল অধিকৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন এবং ক্যাষ্টাইল সৈন্যদিগকেও পরাজিত করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে অভাবনীয় রণচাতুর্যে তিনি যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন।

জিব্রাল্টার ইতিপূর্বে খ্রিস্টানদের হস্তগত হয়। তিনি ১৩৩৩ সালে ইহা তাহাদের নিকট হইতে পুনরুদ্ধার করেন। দূর্গ পরিদর্শন হইতে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি পর্বতগুহায় লুক্কায়িত একদল খ্রিস্টান গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ হারান।

ইউসুফ (১ম) (১৩৩৩-৫৪)

মুহাম্মদের (৪র্থ) পর তদীয় ভ্রাতা ইউসুফ গ্রানাদার শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি নসর বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি, ন্যায়পরায়ণতা ও সুশাসনে জনগণ সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করিতে থাকে। তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। স্থাপত্যশিল্পেও তাঁহার অবদান যথেষ্ট। তিনি বিখ্যাত আল হামরার শ্রীবৃদ্ধি করেন এবং ইহার বৃহৎ তোরণটি তিনি নির্মাণ করেন। তাঁহার সময়ে গ্রানাদায় মসজিদ, মাদ্রাসা ও এতিমখানা প্রচুর পরিমাণে নির্মিত হয়। তিনি মার্বেল পাইপের সাহায্যে সিয়েরা নেভেডা নদী হইতে কৌশলীদের দ্বারা অতি আশ্চর্যের সহিত পানি সরবরাহের সুব্যবস্থা করেন। মোট কথা, তিনি রাজ্যের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য সবরকম প্রচেষ্টা করেন।

তাঁহার সময় যুদ্ধবিগ্রহেরও অন্ত ছিল না। ১৩৩৯ সালে মরক্কোর সুলতান আবুল হাসান সমগ্র স্পেন জয় করিবার জন্য অগ্রসর হন। তিনি আলজিসিরাস ও জিব্রাল্টার জয় করিতে সক্ষম হন কিন্তু খ্রিস্টানদের দ্বারা পরাজিত হন। ইউসুফও তাঁহার সঙ্গে মিলিত হন। তাঁহারা ক্যাস্টাইল সম্মিলিত বাহিনী লইয়া তারিফা অবরোধ করেন। সুশিক্ষিত ও ঐক্যবদ্ধ আরাগণ, পর্তুগাল ও সৈন্যগণ তারিফা উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করেন। ১৩৪০ সালে যুদ্ধ শুরু হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলিম বাহিনী পরাজয় বরণ করেন। ইউসুফ ও হাসান নদীপথে স্ব স্ব রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আলফানসো (১১শ) প্লেগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করেন। ক্যাষ্টাইলের সঙ্গে গ্রানাদার এই যুদ্ধের পর দশ বৎসরের জন্য একটি প্রতিরক্ষা ও শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এইভাবে পরাজিত হইয়া আফ্রিকাবাসী আর কখনও স্পেন আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয় নাই। ইউসুফ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেশের উন্নয়নমূলক কার্য শুরু করেন কিন্তু তাঁহাকে বেশিদিন রাজত্ব করিতে দেওয়া হয় নাই। তিনি ১৩৫৪ সালে রাজপ্রাসাদের মসজিদে নামাজ পাঠরত অবস্থায় ছুরিকাঘাতে নিহত হন।

মুহাম্মদ (৫ম) (১৩৫৪-৫৯)

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মুহাম্মদ আল গণি বিল্লাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া সুলতান হন। তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত ও রুচিবান শাসক। রাজ্যের জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পকলার উৎসাহ প্রদান ও উন্নতি সাধনে তিনি আন্তরিক প্রচেষ্টা চালান। লিসানুদ্দীন অর্থাৎ ধর্মের রসনা উপাধি পাপ্ত ও নসর বংশের ঐতিহাসিক খ্যাতনামা ইবনুল সুযোগ লইয়া তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ইসমাইল তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুৎ করেন। আল গণি আফ্রিকার ফেজে গমন করেন।

ইসমাইল (২য়)

ইসমাইল (২য়) যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিতে ব্যর্থ হন। কারণ তিনি ছিলেন অকর্মণ্য। তাঁহারই ভগ্নিপতি আবু সাঈদ তাঁহার উপদেষ্টা ছিলেন এবং তাঁহার প্ররোচনায় তিনি নিহত হন।

আবু সাঈদ মুহাম্মদ (৬ষ্ঠ) (১৩৫৯-৬২)

আবু সাঈদও খুব যোগ্য ছিলেন না। তাঁহার সেনাবাহিনী খ্রিস্টানদের দ্বারা ভীষণভাবে পরাজিত হয়। জনগণ তাঁহার কুশাসনে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে থাকে। অতঃপর আবু সাঈদ উপায়ান্তর না দেখিয়া ক্যাষ্টাইল রাজদরবারে গমন করেন। এবং সেখানে খ্রিস্টানগণ তাঁহাকে নিহত করে।

মুহাম্মদ (৫ম) (১৩৬২-৯১)

আবু সাঈদের মৃত্যুর পর গণি আবার ফেজ হইতে গ্রনাদায় ফিরিয়া আসেন এবং বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতায় অতিষ্ঠ জনগণ তাঁহাকে বিপুল হর্ষধ্বনির মাধ্যমে স্বাগত জানায়। দ্বিতীয়বার সিংহাসন লাভ করিয়া তিনি ত্রিশ বৎসরব্যাপী বিভিন্ন গোলযোগ ও অন্তবিপ্লবের মধ্যে রাজত্ব করেন। তিনি ক্যাষ্টাইলের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখেন এবং রাজ্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য নিজকে নিয়োজিত করেন। গ্রানাদার শিল্পকলা ব্যবসা-বাণিজ্য ও উন্নতির পূর্বযুগ ফিরিয়া আসে। কৃষি ও শিল্পের তিনি উন্নতি বিধান করেন। অতঃপর তিনি ১৩৯১ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সত্যই তিনি একজন প্রজাদরদী শাসক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু গ্রানাদার জন্য ছিল অপূরণীয় ক্ষতি।

আবদুল্লাহ ইউসুফ (২য়)

পিতার মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসন লাভ করেন কিন্তু বেশি দিন ক্ষমতায় থাকিতে পারেন নাই। পিতার নীতি অনুসরণ করিয়া ক্যাষ্টাইলবাসীর সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করিয়াও সফল হইতে পারেন নাই। যাহা হউক ১৩৯২ সালে ইউসুফকে ষড়যন্ত্রের দ্বারা নিহত করা হয়। বস্তুতঃ আল গণির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই গ্রানাদা রাজ্যের পতন শুরু হয়। আল গণির পর ১৪৯২ সালে ১২ জন সুলতান গ্রনাদার শাসনভার পরিচালনা করেন। তবে তাঁহারা মুসলিম শক্তির পতন রোধ করিতে পারেন নাই এবং ক্রমবর্ধমান খ্রিস্টান শক্তিকেও প্রতিহত করিবার মত শক্তিও অর্জন করিতে ব্যর্থ হন।

১৪৬৫ সালে আবুল হাসান আলী গ্রানাদার সুলতান হইয়া দ্রুত অবনতির দিকে ধাবমান গ্রানাদা শক্তির মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিতে সমর্থ হন। তিনি সাহসী, রণকুশলী ও প্রতিভাবান ছিলেন। গৃহযুদ্ধ ও অন্তবিপ্লব তাঁহার সমস্ত প্রতিভাকে বিনষ্ট করিয়া দেয়। সমগ্র গ্রানাদাবাসী যদি ঐক্যবদ্ধভাবে তাহাকে সাহায্য ও সমর্থন করিত তবে তিনি তাহার পূর্বপুরুষদের গৌরব অক্ষুণ্ন রাখিতে পারিতেন।

এই সময় খ্রিস্টান জগতে নূতন শক্তিজোটের আবির্ভাব ঘটে। আরাগনে ফার্ডিনাণ্ড

এবং ক্যাষ্টাইল ইসাবেলা সর্বময় ক্ষমতা লইয়া তীব্র আঘাত হানিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠেন। ১৪৬৯ সালে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বিবাহ হয় এবং ইহার ফলে সামরিক শক্তি অধিকতর মজবুত হয়। উভয়ে চরম মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন, তাই মুসলিম শক্তি ধ্বংসে যেন এই মৈত্রীর পূর্বশর্ত হিসাবে ইন্ধন যোগায়। তাঁহারা মুসলিম সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করিবার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। ১৪৮২ সালে খ্রিস্টানগণ সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদের আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করেন। তাঁহারা অনায়াসে আল হামরা দুর্গ অধিকার করেন। ইহা গ্রানাদা রাজ্যের প্রবেশদ্বার প্রহরাস্বরূপ ছিল। আবুল হাশেমের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া শত্রুরা ইহা দখল করিয়া নারকীয় হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। এমনকি, যে সমস্ত শিশু ও মহিলা মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁহারাও খ্রিস্টান সৈন্যের শাণিত কৃপাণ হইতে রেহাই পায় নাই। অসহায় বালক, শিশু ও নারীর রক্তে পবিত্র মসজিদ রঞ্জিত করিয়া ফার্ডিনাণ্ড ও ইসাবেলা পরম তুষ্টিলাভ করেন। সুদীর্ঘ আড়াই শত বৎসরের সুদৃশ্য সুরক্ষিত সমৃদ্ধিশালী আল হামরা ধর্মান্ধ খ্রিস্টানদের বর্বরোচিত হামলায় সমাধিক্ষেত্রে পরিণত হয়। জনগণসহ ইমারত, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চিহ্ন সব কিছুই তাঁহারা নিশ্চিহ্ন করে। আল হামরার পতন গ্রানাদার ধ্বংসের পূর্ব সংকেত ছিল। আবুল হাসান নগরটি পুনরুদ্ধারে দুইবার প্রচেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই। সেই চরম দুর্দিনে রাজ পরিবারের মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্বের এতটুকু ভাঁটা পড়ে নাই। আবুল হাসানের পুত্র আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ (বোয়াবদিল) রাজধানীতে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া পিতার মহৎ কার্যকে পণ্ড করিয়া দেন এবং নিজেদের পতনকে তরান্বিত করে। আবুল হাসানের দুই স্ত্রী ছিলেন একজন তাঁহার পিতৃব্য কন্যা আয়েশা, অন্যজন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া স্পেনীয় মহিলা ইসাবেলা দ্য সলিম। মুসলিমগণ তাঁহাকে জহুরা বলিয়া সম্বোধন করিত। এই দুই স্ত্রীর মধ্যে কোন্দল শুরু হয় ভাবী উত্তরাধিকারী লইয়া। স্ব স্ব পুত্রের ভবিষ্যতকে পরিস্কার করিতে নিজেরাই ব্যস্ত ছিলেন। সেখানে জাতীয় মহাসঙ্কটের বিষয়টি তাঁহাদের নিকট ছিল নগণ্য।

মুহাম্মদ (১১শ) (১৪৮১-৮৩)

ইতিপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে মুহাম্মদ আবু আবদুল্লাহ তাঁহার মাতা আয়েশার প্ররোচনায় পিতা আবুল হাসানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। কারণ পিতা তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে বেশি স্নেহ করেন। সৈন্যবাহিনীর সক্রিয় সমর্থনের ফলে ১৪৮২ সালে তিনি আল হামরা পুনরুদ্ধার করেন এবং কার্যতঃ গ্রানাদার কর্তা হইয়া পিতাকে মালাগায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। তখন মালাগার গভর্ণর ছিলেন আবুল হাসানের ভ্রাতা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আজ জাগাল। ১৪৮৩ সালে ক্যাষ্টাইলবাসী মালাগা আক্রমণ করে কিন্তু জাগাল এই আক্রমণকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করেন। এই বৎসরেই আবুল হাসানের পুত্র আবু আবদুল্লাহ বোয়াবদিল খ্রিস্টান শহর লুসান আক্রমণ করিয়া পরাজিত ও বন্দী হন। এই সময়ে আবুল হাসান গ্রানাদায় প্রত্যাবর্তন করিয়া কেবল সিংহাসন দখল করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁহার যোগ্য ভ্রাতা আজ জাগালের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া সপরিবারে আল মুনিকারে বসবাস করিতে থাকেন এবং সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মুহাম্মদ (১২শ) (১৪৮৩-৮৭)

ফার্ডিনাণ্ড বন্দী বোয়াবদিলকে গ্রানাদা ধ্বংসের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন। একদল সৈন্য দিয়া বোয়াবদিলকে প্রেরণ করেন তাঁহারই পিতৃব্য আজ জাগালের বিরুদ্ধে। বিশ্বাসঘাতক বোয়াবদিল ফার্ডিনাণ্ডের ধূর্তামির কথা বুঝিতে পারেন নাই এবং নিজেদের পতন নিজেদের দ্বারাই সংঘটিত হইবে এই কথা তখনও তাঁহার মনে জাগে নাই। খ্রিস্টানগণও উপযুক্ত মওকা পাইয়া তাহাদের লক্ষবস্তু বাজপক্ষীর ন্যায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পরিকল্পনা কার্যকরি করিতে থাকে। বোয়াবদিল ক্যাষ্টাইল সৈন্য ও আয়েশা কর্তৃক অর্থে শীভূত গ্রানাদাবাসীর সাহায্যে সুরক্ষিত শহরতলী আল বেসীন দখল করিয়া গ্রানাদা আক্রমণ শুরু করেন। আজ জাগাল উপায়ান্তর না দেখিয়া মুসলিম শক্তিকে টিকাইয়া রাখিবার মানসেই শত্রুদের মোকাবেলার জন্য লড়াই করিতে থাকিবেন। কিন্তু আজ জাগালের দেওয়া এই প্রস্তাব অযোগ্য ও হতভাগ্য বোয়াবদিল প্রত্যাখান করেন।

খ্রিস্টানগণ আজ জাগাল ও বোয়াবদিলের এই আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে আলোরা, কাসর বনেলা, রণ্ডা ও অন্যান্য শহরগুলি দখল করিয়া নেয়। ১৪৮৬ সালে লোজা অধিকার করিয়া পরবর্তী বৎসর আলমেরিয়া ও মালাগাও অধিকার করিয়া নেয়।

আজ জাগাল এই নগর রক্ষার জন্য প্রচেষ্টা চালান, কিন্তু হতভাগ্য বোয়াবদিল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। কার্যতঃ বোয়াবদিল এত অবিবেচক এবং হঠকারী ও অদূরদর্শী ছিলেন যে, এই নগরীগুলি অধিকার করিবার জন্য তিনি ফার্ডিনাণ্ডকে ধন্যবাদ জানান। যদিও এই নগর ও শহরগুলির জনগণকে সম্পূর্ণ জানমাল ইজ্জতের নিরাপত্তার ভিত্তিতে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করা হয় তথাপি বিশ্বাসঘাতক ফার্ডিনাণ্ড প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগকে হয় উচ্ছেদ করে নতুবা দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন। ফার্ডিনাণ্ড সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া বেজা আক্রমণ করেন। এইবার আজ জাগাল শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়া তাহারা আফ্রিকার মুসলমান ভাইদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, খ্রিস্টানদের কবল হইতে স্পেনীয় মুসলমানদিগকে রক্ষার জন্য। কিন্তু তাঁহার আবেদন রক্ষার জন্য প্রাণপণ লড়াই করেন কিন্তু ফার্ডিনাণ্ড কৌশলে খাদ্যাভাব ঘটাইয়া নগর অধিকার করিতে সক্ষম হন। ১৪৮৭ সালে আজ জাগাল আত্মসমর্পণ করিয়া মরক্কোতে চলিয়া যান এবং অতিকষ্টে সেখানেই দিনাতিপাত করেন। নগর দখল করিয়া সর্বশর্ত ভঙ্গ করিয়া তথাকথিত ধার্মিক রাজা ফার্ডিনাণ্ড ও রাণী ইসাবেলা জনগণকে ঘরবাড়ি হইতে বহিস্কার করিয়া ধনসম্পদ আত্মসাৎ করেন। আজ জাগাল গ্রানাদার শেষ বীর। মুসলমানদের জানমাল ইজ্জত রক্ষার্থে গ্রানাদার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। খ্রিস্টানদের সঙ্গে যুদ্ধে বিরুদ্ধাচারণ না করিয়া সহায়তা করিতেন তবে ফার্ডিনাণ্ড ও ইসাবেলা এত সহজে গ্রানাদা গ্রাস করিতে পারিতেন না। কিন্তু ইতিহাসের ধারা অন্যপথে প্রবাহিত হইতেছিল। তাই গ্রানাদার পতন ছিল অবশ্যম্ভাবী।

বোয়াবদিল (১৪৮৭-৯২)

আজ জাগালের স্পেন ত্যাগের পর গ্রানাদা ও ইহার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি অঞ্চল ব্যতীত মুসমানদের আর অবশিষ্ট কিছু ছিল না। আজ জাগালের পতনের পর বোয়াবদিল বিশেষ স্বস্তি লাভ করেন। তিনি মনে করেন যে, এইবার নির্বিঘ্নে গ্রানাদার সালতানাত তাঁহারই হইল। কিন্তু হতভাগার নির্বুদ্ধিতার ফসল অচিরেই ভোগ করিতে হইল। খ্রিস্টানদের প্রতারণা আর বিশ্বাসঘাতকতার নজীর বোয়াবদিলকে গ্রানাদা সমর্পণ করিতে আদেশ দেন। কিন্তু বোয়াবদিল নগর ছাড়িতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে খ্রিস্টান সৈন্যরা ৪০,০০০ হাজার পদাতিক ও ১০,০০০ অশ্বারোহী লইয়া গ্রানাদার উপর আক্রমণ করে। মুসলমানগণ বিখ্যাত সেনাপতি মুসা বিন আবুল গাজানের নেতৃত্বে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করেন। কিন্তু খ্রিস্টান বাহিনীর নিকট মুসলমানগণ বেশিক্ষণ টিকিয়া থাকিতে পারেন নাই। ফলে বিজয়ী খ্রিস্টান বাহিনী গ্রানাদার বহির্ভাগে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে। দশ বৎসর ধরিয়া যে মুসলিম বাহিনী খ্রিস্টানদের প্রতিহত ও বিতাড়িত করিবার জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন তাঁহারা এখন একান্ত বাধ্য হইয়া খ্রিস্টানদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। ফার্ডিনাণ্ড নগরের মধ্যে সমস্ত সরবরাহ বন্ধ করিয়া নগরবাসীকে চরম দুর্ভিক্ষের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আত্মসর্পণ করিতে বাধ্য করেন। অতঃপর ৭৮০ বৎসর ব্যাপী মুসলিম সভ্যতা অতি সযত্নে লালিত হইয়া ইউরোপ ভূখণ্ডে অজ্ঞতার অন্ধকার বিদূরিত করিয়া জ্ঞানস্পর্শে খ্রিস্টানদিগকে সভ্য করিয়াছে, আজ সেই মুসলিম শক্তিকে সেই খ্রিস্টানগণ অত্যন্ত নির্মমভাবে ধ্বংসের জন্য মাতিয়া উঠিল। মুসলিম স্পেনের শেষ শক্তির আধার, শেষ শাসনের চিহ্ন গ্রানদার পতন ঘটিল রবিউল আউয়াল মাসের ২ তারিখে ৮৯৭ হিজরীতে, ২রা জানুয়ারি ১৪৯২ সালে। খ্রিস্টানদের নিকট মুসলমানদের আত্মসর্পণ করিতে হইল। সেই আত্মসর্পণের শর্তগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

(১) *দুই মাসের মধ্যে মুসলমানগণ স্থলপথে বা পানিপথে উদ্ধারপ্রাপ্ত না হইলে গ্রানাদার খ্রিস্টানদের নিকট সমর্পণ করিতে হইবে।*

(২) *সুলতান, তাঁহার সেনাপতি, উজির, শায়খ ও জনসাধারণ সকলকেই ক্যাষ্টালীয় রাজা ও রাণীর নিকট আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে।*

(৩) *বোয়াবদিল আল-পুস্রারাস অঞ্চলের কিছু সম্পত্তি পাইবেন।*

(৪) *সকল মুসলমানদের জীবন, সম্পত্তি, অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্বাদি ভোগদখলের নিরাপত্তা থাকিবে।*

(৫) *সকলেই স্বাধীন ও বাধাহীনভাবে ধর্মকর্ম করিতে পারিবেন।*

(৬) *মসজিদ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ রক্ষা করা হইবে।*

(৭) *তাঁহাদের আদব-কায়দা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ভাষা ও পোষাক-পরিচ্ছদ সবই রক্ষিত হইবে।*

(৮) *কোন খ্রিস্টান জোরপূর্বক মুসলমানের গৃহে প্রবেশ কিংবা অত্যাচার বা অপমান করিতে পারিবে না।*

(৯) *সকল মুসলিম বন্দী মুক্তি পাইবে।*

(১০) সে সকল মুসলমান দেশত্যাগ করিয়া আফ্রিকায় যাইতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে শুধু ভাড়ার অর্থ লইয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্যাষ্টালীয় জাহাজে সেখানে পৌছাইতেই হইবে।

(১১) কাহাকেও অন্যের কৃত অপরাধের জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না।

(১২) কোন খ্রিস্টান মুসলমান হইলে তাহাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে ; এবং মুসলমান খ্রিস্টান হইতে চাহিলে আইনের মাধ্যমে সে সুযোগ দেওয়া হইবে।

(১৩) কোন মুসলমান খ্রিস্টানদের সঙ্গে থাকিলে বা ভ্রমণ করিতে চাহিলে তাহার জানমাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা থাকিবে এবং ইহুদীদের ন্যায় কোন বিশেষ চিহ্ন ধারণ করিতে হইবে না, ইত্যাদি।

খ্রিস্টানদের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে সেনাপতি মুসা খুব সচেতন ছিলেন। তাই তিনি এই আপত্তিকর ও দাসত্বমূলক আত্মসর্পণের বিরুদ্ধে জনগণকে শেষবারের মত সচেতন করিয়া দেন। তিনি সমবেত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এক ওজস্বিণী ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন, দাসত্বের গ্লানি ও লজ্জা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। তোমরা কি বিশ্বাস কর যে ক্যাষ্টাইলবাসীরা তাহাদের প্রতিজ্ঞা বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিবে ? তোমরা অপমান, গৃহ লুণ্ঠন, স্ত্রী কন্যাদের অসম্মান, মসজিদ অপবিত্রকরণ, এক কথায় অত্যাচার, অবিচার ও নিধন তাঁহার তুলনায় মৃত্যু কিছুই নহে। আমাদের অঙ্গারে পরিণত করিবার জন্য ইতিপূর্বেই জ্বালানী তৈয়ার করা হইয়াছে।

কিন্তু ধ্বংস ও পতনের সিঁড়িতে দাঁড়াইয়াও জগণের মাঝে কোন প্রকার চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় নাই। কথিত আছে, মুসা সাহসী যোদ্ধা সহচরদের জীবনের প্রতি ঘৃণা ও কটাক্ষ করিয়া এলভিরা তোরণ দিয়া অশ্বারোহণে নগর ত্যাগ করেন। নগরের বাহিরে অপেক্ষারত ১০ জন খ্রিস্টান অশ্বারোহীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং তাহাদের কয়েকজনকে নিহত করিয়া নিজেও আহত হন। পরে ক্লান্ত অবসন্ন দেহ মন লইয়া শেনিল নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়েন। এইভাবে গ্রানাদার শেষ বীর মুসার জীবনের অবসান হইল। সেনাপতি মুনা বিস নুসাইরের শৌর্যে ৭১২ সালে যে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত, ১৪৯২ সালে ঐ একই নামে মুসার জীবনাবসানে সেই শাসনের পরিসমাপ্তি হইল।

মিশর ও রোমের সুলতানদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করা হয়, কিন্তু নির্দিষ্ট সময় শেষ হইলেও কোন সাহায্য আসে নাই। অবশেষে খ্রিস্টানগণ ২রা জানুয়ারী ১৪৯২ সালে গ্রানাদায় প্রবেশ করে। অতঃপর বোয়াবদিল আল পুক্সরাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং পরে ফেজে নির্বাসিত হন। সেখানেই নিদারুণ দুঃখে কষ্টে দিনাতিপাত করিয়া ১৫৩৮ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

স্পেনের ইতিহাসে ১৪৯২ সাল খুবই স্মরণীয়। ৭১২ সালে যে রাজ্যের বুনিয়াদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহারই শোচনীয় পতন ৭৮০ বৎসর পরে ১৪৯২ সালে। স্পেনে এই সুদীর্ঘ সময়ের গ্রানাদা শাসনের সমাপ্তি ঘটে ফার্ডিনাণ্ড ও ইসাবেলার গ্রানাদা অধিকারের ফলে। খ্রিস্টানদের গ্রানাদা দখল ও মুসলমানদের আত্মসর্পণের মাধ্যমে সূচিত হয় ইতিহাসের নূতন অধ্যায়। মুসলমানদের ভাগ্যে নামিয়া আসে করুণ ও মর্মস্পর্শী বিপর্যয়। যে জাতি শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও কৃষ্টি দ্বারা একটি মহাদেশের জীবনযাত্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিল, সেই জাতির দুর্ভাগ্যের করুণ ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে আলোচিত হইল।

ধর্মের আবরণে আচ্ছাদিত ফার্ডিনাণ্ড অথবা তাহার সাধ্বী ইসাবেলা কেহই মুসলমানদের সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্তাবলী পালন করেন নাই। মুসলমানদের আত্মসমর্পণের কয়েকদিন পরেই ফার্ডিনাণ্ড তাঁহার ধর্মীয় আবরণ উন্মোচন করেন। তিনি আদেশ জারি করেন যে, ইসলাম ধর্ম স্পেনে নিষিদ্ধ। অতএব কেহ ইসলাম ধর্মের কোন প্রকার আচার-অনুষ্ঠান পালন করিতে পারিবে না। অপর একটি আদেশ এই মর্মে ঘোষিত হইল যে, মুসলমানদিগকে যে কোন প্রকারেই হউক খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করিতে হইবে। ফার্ডিনাণ্ডের এহেন কোন বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণে মুসলমান জনসাধারণের মধ্য সৃষ্টি হয় ভীষণ উত্তেজনা। আলবেজাতে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলিয়া উঠে। প্রবল খ্রিস্টান শক্তির নিকট মুসলমানগণ জয়যুক্ত হইতে পারেন নাই। অবশেষে তাহাদের উপর নামিয়া আসে নির্যাতনের ভয়ঙ্কর রূপ। বিভিন্ন প্রকারের জুলুম ও যন্ত্রণা শুরু হয়। এইবার ফার্ডিনাণ্ডের আদেশ আরও তীব্র আকার ধারণ করে। তিনি ঘোষণা করেন-নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হয় মুসলমানগণকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হইতে হইবে, না হয় মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। এহেন নির্মমতার শিকারে পরিণত হইয়া অসংখ্য মুসলমান ঘরবাড়ি, সহায়-সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুই পরিত্যাগ করিয়া তারা আল পুক্সারাসের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। খ্রিস্টানদের হামলায় বহু জীবন বিনষ্ট হয়। অত্যাচারী বাহিনী আল পুক্সারাসের মুসলমানদের উপরও ঝাঁপাইয়া পড়ে। সেখানে অসংখ্য নারী পুরুষ শিশু ও বৃদ্ধকে হত্যা করে। যাঁহারা প্রাণ রক্ষার্থে মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহাদিগকেও রেহাই দেওয়া হয় নাই। প্রাণ সংহার করিয়া পাশবিক আচরণে ঘরবাড়ি ও মসজিদগুলিকে অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করা হয়। এত বর্বর নির্যাতন ও নিধনযজ্ঞের মুখে যাহারা আত্মগোপন করিয়া জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন তাহারা তাহাদের ধর্মবিশ্বাসে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয় নাই।

১৫০১ সালে মুসলমানগণ নিজেদের শক্তিতে সংঘবদ্ধ করিয়া খ্রিস্টানদের মোকাবেলা করেন। অপূর্ব আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ় মনোবলের উপর আস্থাশীল হইয়া তাহারা সশস্ত্র সংগ্রামে খ্রিস্টানদিগকে পরাজিত করেন। অতঃপতনের শেষ ধাপে দাঁড়াইয়া মুসলমানদের এই খণ্ড বিজয়ে নিঃসন্দেহে তাহাদের পক্ষে কিছুটা নিরাপত্তা বিধান করে। বিজয়ের ফলশ্রুতিতে তাহারা যে সেখানে জানমাল ও ধর্ম লইয়া নিরাপদে বসবাস করিবে, সে বাসনা ছিল সুদূর পরাহত। তাবে তাহারা কিছু সংখ্যক মরক্কো, তুরস্ক ও মিশরে হিজরত করিতে সক্ষম হয়। জনগণের অধিকাংশ তখনও স্পেনে। নবোউদ্দীপনায় ও পূর্বাপেক্ষা কঠোরতার সহিত খ্রিস্টানগণ মুসলমানদিগকে জোরপূর্বক ধর্মান্তর করিতে শুরু করে। বালক ও শিশুদিগকে অপহরণ করিয়া খ্রিস্টান মিশনে লইয়া দীক্ষা দেওয়া হয়। বিবাহশাদী খ্রিস্টানমতে শুরু হয়। তবে নিষ্ঠাবান ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ গৃহে গোপনে ইসলাম ধর্মমতে পুনরায় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতেন। এই নামমাত্র খ্রিস্টানদিগকে সতর্কতার সহিত পর্যবেক্ষণে রাখা হইত। খ্রিস্টানধর্ম ভ্রষ্টতার সামান্যতম নিদর্শন পাইলেই তাহাদিগকে ধর্মীয় আদেশ বলে অগ্নিদগ্ধ করিয়া প্রাণসংহার করা হইত। এইভাবে যেনতেন কারণে-অকারণে স্পেনবিজয়ী বীরের বংশধরগণকে নিষ্ঠুরতম ব্যবহারে নিশ্চিহ্ন করা হয়। ১৫১৮ সালে ফিলিপ (২য়) স্পেনের শাসনভার হাতে লইয়া মুসলমানদের উপর (যাহাদিগকে তাহাদের ভাষায়

মরিস্কো[১] বলা হইত) নির্মম আচরণ শুরু করেন। তিনি এক নির্মম রাজ আদেশ জারি করেন। তাহাতে নির্দেশ প্রদান করা হইল যে, তিন বৎসরের মধ্যে মুসলমানদিগকে তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার ও যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি পরিত্যাগ করিয়া নোংরা দেহ লইয়া কাল কাটাইতে বাধ্য হইতে হয়। গোসল পর্যন্ত বন্ধ করিয়া একটি শুদ্ধ ও পবিত্র আচারে অভ্যস্ত জাতিকে কেমনভাবে দুর্গন্ধময় অনভ্যস্ত জীবনে নিক্ষিপ্ত করিল। এহেন নির্দেশ আজ সভ্যজগতে ভাবিতে সত্যই বিস্ময় বোধ হয়। খ্রিস্টানদের এই জঘন্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুলমানগণ আর একবার মাথা তুলিবার প্রচেষ্টা করেন কিন্তু তাহাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই নিস্ফল বিদ্রোহের পরিণাম হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। অস্ট্রিয়ান ডন জুয়ান বহু মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করে। আল পুক্সারাসের গ্রামগুলি কসাইখানায় পরিণত হয়। যাহারা পর্বতের গুহায় লুকাইয়া ছিলেন তাহাদিগকে আগুনের ধোঁয়া দিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া নিহত করা হয়। ১৬১০ সালে ফিলিপ (৩য়) মুসলিম নিধন ও উচ্ছেদ পিতার আরদ্ধকার্য অত্যন্ত উৎসাহের সহিত সমাপ্ত করেন। বিভিন্ন রাজ আদেশবলে অন্যূন ৫ লক্ষ লোককে জোরপূর্বক আফ্রিকায় নির্বাসিত করা হয়। তাহাদিগকে নিঃসম্বল করিয়া বন্য পশুর ন্যায় বিতাড়িত করা হয়। যাত্রাপথে বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রামের জন্যও তাহার নিকট হইতে কর আদায় করা হয়। এহেন নির্যাতনমূলক আচরণ মনে হয় জগতের বুকে নজীরবিহীন। বহু ব্যক্তিকে দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত করিয়া ফ্রান্সে বিতাড়িত করা হয়। একদা শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী জাতির ভাগ্য এমনিভাবে নিয়ন্ত্রিত হইল। ১৪৯২ সাল হইতে শুরু করিয়া ১৬১০ সাল পর্যন্ত অন্যূন ত্রিশ লক্ষ মুসলমানকে স্পেন হইতে বিতাড়িত করা হয়।

স্পেন হইতে মুসলমানদের বিতাড়ণ সম্পর্কে ঐতিহাসিক আমির আলি বলেন যে, গথদের অলস গরিমায় যে উপদ্বীপ মৃত ও অনুর্বর হইয়া পড়িয়া রহিয়াছিল, তাহাকে সক্রিয় পরিশ্রম বলে যে সাহসী, উদ্ভাবনশীল জ্ঞানালোকিত জাতি নূতন জীবন দান করিয়াছিল, যাহারা আন্দালুসিয়াকে উদ্যানে পরিণত করিয়াছিল, যখন চতুর্দিক অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল তখন যাহারা জ্ঞানবর্তিকার উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছিল, যাহারা কৃষ্টি বিস্তার করিয়াছিল, সভ্যতার উৎকর্ষসাধনে সহায়তা করিয়াছিল এবং বীরত্বের আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল, মোদ্দা কথায় যাহারা আধুনিক ইউরোপের জন্মদান করিয়াছিল তাহারা এক্ষণে স্পেনের বুক হইতে বিলুপ্ত হইল। আর স্পেন মুরদিগকে তাড়াইয়া কি লাভ করিল? বহু শতাব্দী ধরিয়া সংস্কৃতি, জ্ঞান ও শিল্পকলার আবাসভূমি মনোরম আন্দালুসিয়া পুনরায় উৎপাদনবিহীন হইয়া সাংস্কৃতিক ও নৈতিক অধঃপতনের নামান্তরে পরিণত হইল, স্পেনীয় ঐতিহাসিক কণ্ডে বলেন, 'মুসলমানদের উপস্থিতি যে সকল দেশকে জ্ঞানালোকিত ও সুসমৃদ্ধ করিয়াছিল উহা চিরন্তর অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইয়াছে। প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় নাই। সে চিরকালই হাস্যময়ী কিন্তু লোকদের মধ্যে ও তাহাদের ধর্মে পরিবর্তন

১. মরিস্কো অর্থাৎ ছোট মুর। গ্রানাদায় মুসলিম শাসনাবসানে যে সমস্ত মুসলমান খ্রিস্টান শাসনে বসবাস করিতেছিলেন তাঁহাদিগকে খ্রিস্টানগণ ব্যঙ্গ করিয়া মরিস্কো বলিত। ইতিপূর্বে উত্তরের খ্রিস্টান রাজ লিয়োন, ক্যাস্টাইল ও আরাগণে যে সমস্ত মুসলমান বসবাস করিতেন তাঁহাদিগকেও খ্রিস্টানগণ অনুরূপ ভাষায় মোদেযার নামে আখ্যায়িত করিত।

সাধিত হইয়াছে। কয়েকটি ভাঙ্গাচোরা স্মৃতিস্তম্ভ এখনও বিরান দেশের ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে সত্যের ধ্বনি উত্থিত হয়। বিজিত আরবদের জন্য সম্মান ও গৌরব এবং বিজেতা স্পেনীয়দের জন্য ধ্বংস ও দৈন্য, ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন, 'বিপথগামী স্পেনীয়গণ জানিত না যে তাহারা কি করিতেছে। মুরদের নির্বাসন তাহাদিকে আনন্দ দান করিল। কিছুকাল যাবৎ ইহার চেয়ে চমৎকার ও আবেগময় আর কোন ঘটনা ঘটে নাই। তৃতীয় ফিলিপ যে 'ন্যায় দণ্ডাজ্ঞা' দ্বারা মুরদের শেষ চিহ্নটুকুও নির্বাসিত করিয়াছিলেন লোপ ডি ভিগা ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।..... তাহারা বুঝিতে পারে নাই যে তাহারা তাহাদের স্বর্ণ ডিম্ব প্রসবিনী রাজহংসীকে হত্যা করিয়াছে। বহু শতাব্দী ধরিয়া স্পেন সভ্যতার কেন্দ্র, শিল্প ও বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সকল প্রকারের মার্জিত জ্ঞানালোকের পীঠস্থান ছিল। ইউরোপের আর কোন দেশই মুরদের সুসভ্য রাজ্যের এত নিকটবর্তী হইতে পারে নাই। ...... মুরগণ নির্বাসিত হইল, কিছুকাল পর্যন্ত খ্রিষ্টীয় স্পেন ধার করা আলোকে পূর্ণচন্দ্রের কিরণ বিকিরণ করিল। তাহার পর চন্দ্র রাহুগ্রস্থ হইল। সেই অবধি স্পেন ঐ অন্ধকারেই ডুবিয়া রহিয়াছে। মুরগণ একদা যেখানে বর্ধিষ্ণু দ্রাক্ষা জলপাই ও হরিৎ শস্যরাশি উৎপন্ন করিত তাঁহার অনুর্বর বিরাণ অবস্থার মধ্যে সেখানে একদিন জ্ঞান ও বুদ্ধি চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল সেখানে অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকদের অবস্থিতিতে এবং যে জাতি অন্যান্য জাতির তুলাদণ্ডে শোচনীয়রূপে অধঃপতিত হইয়াছে এবং যাহারা অবমাননার জন্য যথোপযুক্ত তাহাদের স্থবিরতা ও অপমানের মধ্যে মুরদের প্রকৃত স্মৃতিচিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

কর্দোবা

[সার সংক্ষেপ ঃ সূচনা ❑ কর্দোবা।]

কুরতুবা। কর্দোভা । কর্দোবা। কর্ডোভা। একটি নাম, একটি জাতির পরিচয়, একটি যুগবিপ্লব-উৎস, একটি যুগমানস চেতনাবহ্নি, যুগব্যাপী তমসাচ্ছন্ন একটি মহাদেশের আলোকজ্জল বাতিঘর। অশিক্ষা, আচার বর্জিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক বিশাল মানব সমাজ অধ্যুষিত মহাদেশ তদানীন্তন ইউরোপ। তাহার দুই দিকে অথৈঃ জলরাশি ও অপর একদিকে বিশাল পরিবেষ্টিত এবং নানামুখী সমস্যাবিজড়িত দেশ স্পেন। আফ্রিকার সাথে মাত্র ১৭ মাইলের দূরত্ব রাখিয়া উভয়ের মাঝে প্রবাহিত আটলান্টিক মহাসাগর ভূমধ্যসাগর সংযোগকারী প্রণালী জিব্রাল্টার বহু বৎসর ধরিয়া এই দেশটি রোমান ও গথজাতির সিংহনাদে শাসিত। অত্যাচারের পাহাড় বহিয়া এই দেশটি মানুষের মেরুদণ্ড বাকিয়া গিয়াছে, অবিচারের শোষণদণ্ডে হস্তপদ অবশ হইয়া গিয়াছে, নিপীড়নের নির্মমতায় ইহাদের প্রাণবায়ু নির্গমোদ্যত। এই মজলুম মানুষের আর্তনাদে যখন সমগ্র স্পেন প্রকম্পিত সেই ক্রান্তিকালে মানবতার অমিয় সুধা লইয়া ৭১১ সালে আসিল ইসলামী ঝাণ্ডাবাহী স্মরণীয় মুজাহিদবৃন্দ। সিপাহসালার তারিক বিন জিয়াদ। ৭১১ সালে ইউরোপের ইতিহাসে এক শুভ অধ্যায়। রাজা রডারিক লক্ষ সৈন্য লইয়া ও স্বল্প সংখ্যক মুসলিম মুজাহিদের দুর্বার গতিরোধ করিতে ব্যর্থ হয়। রাজধানী তলোদোর পতন ঘটে। একে একে প্রায় সমগ্র স্পেন মুসলমানদের অধিকারে চলিয়া আসে। তাহার পর প্রধান সেনাপতি মুসা বিন নুসাইর ও তারিক বিন জিয়াদ স্পেন সীমান্ত প্রহরী পীরেনীজ পর্বতমালার শিখরে আরোহণ করিয়া উল্লসিত প্রাণে, বিজয় জোয়ার রোমান্সে, বিজয়ী নেত্রে চাহিয়া থাকেন ফ্রান্সের দিকে। অতঃপর ইতিহাসের গতি আপন পথে চলিল। কর্দোবা মুসলিম স্পেনের প্রাণকেন্দ্র হইল। রাজধানী কর্দোবা রমণী নগরী কর্দোবা, ইউরোপের বাতিঘর কর্দোবা, ইউরোপের গৌরব এই কর্দোবা। ৭১১ সাল হইতে শুরু করিয়া ৭৫৬ সাল পর্যন্ত চলিল দামেস্কের শাসন। প্রাচ্যে উমাইয়া শক্তিকেন্দ্র ৭৫০ সালে বাগদাদে স্থানান্তরিত হওয়ায় প্রতীচ্যে এক নূতন উদ্দীপনায় এবং একান্ত নাটকীয়ভাবে দামেস্কে উমাইয়া রাজবংশোদ্ভূত আবদুর রহমান নামক এক ভাগ্যান্বেষী প্রতিভাধর যুবকের দ্বারা কর্দোবাতে উমাইয়া শক্তির পুনঃ অভিষেক

হয়। এই আবদুর রহমানের শৌর্যবির্য, সাধনা পরিশ্রম আর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার যাদুস্পর্শে অখ্যাত কর্দোবা ধীরে ধীরে খ্যাতির সোপানে আরোহণ করিতে শুরু করে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সড়ক, সেতু, মসজিদ, মিনার, প্রাসাদ, বাসগৃহ, স্নানাগার, বিপনী-বিতান, মকতব, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার পাঠাগার, এতিমখানা, মোসাফেরখানা, মোহাফেজখানা প্রভৃতি গড়িয়া উঠিতে শুরু করে আমিরের প্রাণঢালা সেবাযত্নে। ৭৫৬ হইতে শুরু করিয়া ১০৩২ সাল পর্যন্ত একটানাভাবে এই জগতমণি কর্দোবার সিংহাসনে পালা বদল হয় ১৯ জন নরপতির। তাহারা রূপ সৌন্দর্য ও প্রাণ চাহিদার তিলে তিলে গড়িয়া তোলেন তিলোত্তমা সুন্দরী নগরী কর্দোবা। কর্দোবা এক একটা অংশের বর্ণনায় এক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন সম্ভব। এখানে কর্দোবার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আলোচিত হইল।

কর্দোবাতে আবদুর রহমান আদ-দাখিল নির্মিত মসজিদ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য স্থাপত্য কীর্তির মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করিয়া আছে। আশি হাজার দীনার ব্যয়ে তিনি ইহা নির্মাণ করেন। তবে এই মসজিদ তাহার পরবর্তী বংশধরগণ সংস্কার, পুনঃনির্মাণ ও সম্প্রসারণ ও অলঙ্করণের দ্বারা ইহা তৎকালীন বিশ্বের বিস্ময় সৃষ্টিকারী ইসলামের তৃতীয় বৃহৎ মসজিদের মর্যাদা লাভ করে। ইহার ক্ষেত্রফল দাঁড়ায় ২৬,৫০০ বর্গ গজ। ইহার প্রাচীরের মজবুতী স্তম্ভ ছাড়া দৈ. ৪১০´ প্র. ৫৮৫´। মসজিদের দক্ষিণে কিবলাকোঠা। আঠারটি খিলান সারি ইহাকে ১৯টি খিলান পথে বিভক্ত করিয়াছে। রাস্তা হইতে তেরটি প্রবেশ পথ দিয়ে পবিত্র কোঠায় যাতায়াত করিবার বন্দোবস্ত আছে। সামনের দিকেও ছয়টি প্রবেশ পথ। সামনের তিনদিকে রিওয়াক। পবিত্র কোঠায় অন্তঃছাদ খিলানের উপর সমতল। কিন্তু বর্হিছাদ উর্মিমালা সদৃশ্য। এই মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে মনে হইবে যে দীর্ঘকায় বৃক্ষরাজিশোভিত কাননে আসিয়াছি। অর্থাৎ এখানকার স্তম্ভ (Column) ও পিল্পার (Pier) সংখ্যা অন্যান্য মসজিদ অপেক্ষা অধিক। এগুলির সংখ্যা হইল ১২৯৩টি। স্তম্ভ ও পিল্পার পাদদেশ হইতে শীর্ষদেশ পর্যন্ত বিভিন্ন অলঙ্করণে সুশোভিত। খিলানের সম্মুখভাগ লোহিত বর্ণের ইট ও শুভ্র পাথরের পালা এক অনুপম দৃশ্য সৃষ্টি করিয়াছে। ১০৮ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট মিনার হইতে মসজিদে আহবান করা হইত প্রত্যহ পাঁচবার অনুরক্ত ভক্তবৃন্দকে। চারিটি চৌবাচ্চা হইতে ভক্তবৃন্দ অঙ্গ প্রতঙ্গের নির্দিষ্ট অংশ বিধৌত করিয়া ময়লামুক্ত হইয়া সূচিশুভ্র দেহ-মন-প্রাণে প্রবেশ করিতেন এই মসজিদে। তিনশত খাদেম এই মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন। দৈহিক দশ হাজার শিখায় এই বিশাল মসজিদ আলোয় ঝলমল করিয়া উঠিত। জ্ঞান তাপস খলিফা আল হাকাম (২য়) এই মসজিদের মিম্বর তৈরিতে যে অনুপম রুচির পরিচয় দেন তাহা সত্যিই প্রশংসনীয়। সুদীর্ঘ ৭ বৎসর ধরিয়া শ্রম অর্থ ব্যয়ে ৩৬০০০ আবলুস কাষ্ঠখণ্ড ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক গজদন্ত দ্বারা নির্মিত হয় এই সুদৃশ্য কারুকার্যময় মিম্বরটি। এই সখ ও সাধের মসজিদটি 'লা-মজকিটা' নামে বাঁচিয়া আছে। এই মসজিদ ব্যতীত কর্দোবাতে আরও ৭০০ মসজিদ ছিল।

কর্দোবার স্থাপত্য ইতিহাসে আজ জাহ্‌রা প্রাসাদ অনন্য সৌন্দর্যসুষমামণ্ডিত। খলিফা আবদুর রহমান আন-নাসির লি-দ্বীনিল্লাহ তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী আজ-জাহ্‌রার অনুরোধে-

এই প্রাসাদনগরী নির্মাণ করেন। তাহারই নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হয় আজ জাহ্‌রা। কর্দোবার পাঁচ মাইল উত্তরে Hill of Bride-এর পাদদেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যক্রোড়ে এই সুরম্য প্রাসাদ। ৯৩৬ সালে ইহার নির্মাণ শুরু হয় এবং দীর্ঘ ২৫ বৎসর ধরিয়া বার্ষিক আয়ের এক তৃতীয়াংশ (৬২৩৫০০০ স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় করিয়াও খলিফা ইহার চূড়ান্ত সমাপ্তি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। এই প্রাসাদ নির্মাণ করিতে মোট ৪০ বৎসর লাগে। এই প্রাসাদ নির্মাণে দৈনিক দশ হাজার শ্রমিক পরিশ্রম করিত। গাঁথুনির জন্য প্রত্যহ ৬০০০ প্রস্তর খণ্ড মসৃণ করা হইত। নির্মাণ উপকরণ বহনে নিয়োজিত ছিল দৈনিক ১৫০০ ভারভাহী জন্তু। দেশ-বিদেশ হইতে আমদানী হইত নির্মাণ সামগ্রী। আজ জাহ্‌রার নির্মাণরীতি ছিল চিত্তাকর্ষক। প্রাসাদের সুদৃশ্য কারুকার্যখচিত কাষ্ট ও লৌহ এবং তাম্র মণ্ডিত কপাটের সংখ্যা ছিল ১৫০০০। এই প্রাসাদের কক্ষটি সর্বাপেক্ষা মনোরম। ইহার ছাদ ও প্রাচীর ছিল মর্মর খণ্ড ও স্বর্ণ মণ্ডিত। মার্বেল ও স্ফটিক নির্মিত স্তম্ভের উপর স্থাপিত ছিল বৃত্তাকারের গম্বুজটি। মণি কাঞ্চন ও হিরা মুক্তা অত্যাশ্চর্যরূপে শোভিত ছিল গম্বুজের অধঃঊর্ধ। হল ঘরের মধ্যভাগে ছিল পারদ আচ্ছাদনে মার্বেলের চৌবাচ্চা। প্রতি দিকে ছিল আটটি করিয়া গজদন্ত ও আবলুস কাষ্টনির্মিত গবাক্ষ। সূর্যরশ্মি যখন এই গবাক্ষ পথে পারদ হৃদে প্রতিফলিত হইত তখন অপূর্ব মনোমহিনী দৃশ্যের সৃষ্টি হইত। পারদে নিপতিত কম্পমান রবিরশ্মি সমস্ত হল ঘরে মায়াবিনী আলোর ঝলমলে ভরিয়া তুলিত। এই দৃশ্য যেমন ছিল মনোমহিনী তেমন বিস্ময়কর। একদিকে ছিল সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, অপর দিকে ছিল অনুপম সৌন্দর্য ও মার্জিত রুচি সৃষ্টি। এক মাইল দীর্ঘ ও অর্ধ মাইল প্রস্থ লইয়া এই বিশাল প্রাসাদ ভবনটি রাজকার্য নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধায় ভরপুর ছিল। কৃত্রিম ও স্বাভাবিক ঝর্ণা ও স্রোতস্বিনী, ফল-ফুল সম্ভারে পূর্ণ মনোরম উদ্যান ও পুষ্পকুঞ্জ, কর্মচারী ও সৈনিকদের বাসগৃহ সবই ছিল এই প্রাসাদ নগরীতে। রূপ সৌন্দর্যের প্রদর্শনী মেলা যেন এই প্রাসাদে নিত্য অতিথি ছিল। ইহা ব্যতীত কর্দোবার ছিল আরও অনেক প্রাসাদ।

(ক) পুষ্প প্রাসাদ (খ) প্রেম প্রাসাদ (গ) তৃপ্তি প্রাসাদ (ঘ) জাহিরা প্রাসাদ (ঙ) মুকুট প্রাসাদ (চ) দামেস্ক প্রাসাদ ইত্যাদি।

সব প্রাসাদগুলিই ছিল যথারীতি পুষ্পকুঞ্জ পরিবেষ্টিত, রজতশুভ্র মর্মরপ্রস্তর মণ্ডিত ; প্রত্যহ মেশক্ অম্বর বারিতে বিধৌত, বিভিন্ন লতাগুল্ম জ্যামিতিক রেখা অঙ্কন চিত্র লেখনীতে ভরপুর। প্রাসাদ অঙ্গনে পুষ্প উদ্দ্যানে প্রত্যহ যেন সমগ্র স্পেনের নীরদমালা আসিয়া সযতনে সপিয়া দিত বিনিদ্র নিশিতে এক ফোটা, একফোটা করিয়া নরম তুলতুলে শিশির। শর্বরীশেষে উষার আলো আসিয়া পড়িত পত্রপুষ্প পাপড়ি উপরি শিশির বিন্দুতে। অমনি মুক্তা সদৃশ বিন্দুগুলি সোনালী আভায় ঝিকমিক করিয়া উঠিত। তাহার পর প্রভাব সমীরণের ঈষৎ আলোড়নে নামিয়া পড়িত বিন্দুগুলি—মনে হইত যেন সমস্ত পুষ্পকুঞ্জ হইতে ঝরঝর করিয়া গলিয়া পড়িতেছে তরল স্বর্ণ। এই দৃশ্য যে কোন দর্শকের মনে দিত অফুরন্ত আনন্দ।

পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, অজু ও গোসলের দ্বারা কর্দোবার মুসলিম সুলতানগণ ইউরোপে আনিয়া দেন এক নূতন সভ্যতার সওগাত। মুসলিম শাসন পূর্ব ইউরোপ দেহকে ময়লামুক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তায় এত বেশি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল যে, সে কথা শুনিলে আজও বিংশ

শতকের ইউরোপবাসী ঘৃণায় থুথু ফেলিবে। The moors in Spain এর লেখক Stanley lane poole সাহেব তাঁহার গ্রন্থের ১৩৫ পৃষ্ঠায় এই অশুচি ও অনাচার সম্পর্কে এক তথ্য দিয়াছেন। একজন সন্নাসিনী সুদীর্ঘ ষাট বছর পর্যন্ত স্নান অথবা দেহের কোন অংশ ধৌত না করিয়া কেবলমাত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠের সময় অঙ্গুলির অগ্রভাগে পানি স্পর্শ করিয়া পবিত্রতা রক্ষার এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা সৃষ্টি করেন। অথচ মুসলমানগণ সেখানে পবিত্রতা রক্ষা ও দেহ ময়লামুক্ত রাখিবার জন্য অজু গোসলের কি সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছে। সারা স্পেনে গোসলের নিয়ম পদ্ধতি প্রচলিত হয় এবং সর্বত্রই সরকারী গোলখানা তৈয়ারী করা হয়। একমাত্র কর্দোবাতেই ৯০০ সরকারী গোসলখানা ছিল। অতীতে গোসল যেখানে পাপ ছিল পরবর্তীতে তাহা পুণ্যে পরিণত হইল।

জনসাধারণকে রোগমুক্ত ও সুস্থ রাখিবার জন্য দেশের সর্বত্রই রোগ নিরাময় নিকেতন ছিল। একমাত্র কর্দোবাতেই ৫০টি হাসপাতাল ছিল। ইহা ব্যতীত অসংখ্য ভ্রাম্যমান হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্র নগরবাসীর স্বাস্থ্য রক্ষার্থে নিয়োজিত ছিল।

কর্দোবার গৌরবময় যুগে ইহার লোক সংখ্যা ছিল দশ লক্ষ। ষাট হাজার প্রাসাদ ও দুই লক্ষ বাড়ি ছিল কর্দোবায়। আশি হাজার বিপনী বিতান বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় পণ্যে বোঝাই ছিল।

শহরের সড়কগুলি ছিল পাকা গাঁথুনিতে মসৃণ ও মজবুত। এই সড়কের দুইধারে ছিল সারিবদ্ধ বাসগৃহ। রাত্রিতে জ্বলিত অসংখ্য বাতি। দুই ধারের গৃহবাতি রশ্মিতে রাস্তা হইত আলোকিত। হিট্রি সাহেব মন্তব্য করেন যে, এই সময়ের সুদীর্ঘ সাত শত বৎসর পরেও লন্ডন অথবা প্যারিসের রাজপথে কোন সরকারী বাতি দেখা যায়নি। শুধু তাহাই নহে বর্ষায় রাস্তাগুলি কর্দমাক্ত হইয়া পড়িত আর হাটু পর্যন্ত সে পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে হইত।

শিল্প বাণিজ্যে কর্দোবার খ্যাতি সুদূর প্রসারী ছিল। বস্ত্রশিল্প, চর্মশিল্প, লৌহশিল্প এবং অলঙ্কার তৈয়ারী শিল্পে কর্দোবা সমৃদ্ধ ছিল। উন্নত মানের মিহি সূতীবস্ত্র, রেশম সিল্ক ও লিনেন, ইত্যাদি বস্ত্র বয়নে কর্দোবার বয়ন শিল্পীরা খুবই দক্ষ ছিলেন। তাহাদের তৈয়ারী বস্ত্র দেশের চাহিদা পূরণ করিত এবং বিদেশে রপ্তানীর মাধ্যমে অর্থ ও সুনাম উভয়ই অর্জিত হইত। একমাত্র রাজধানীতে ১০,০০০ হাজার বস্ত্রবয়ন শিল্পী ছিলেন। সুন্দর ও মনোরম বস্ত্রের দ্বারা রুচিসম্মত পোশাক পরিচ্ছদ তৈয়ারীতে স্পেনীয় দর্জিগণও যথেষ্ট সুখ্যাতির দাবিদার। রাজধানীর চামড়ার কারখানাও তখন জগত বিখ্যাত ছিল। চামড়া লেবাছ, সামরিক সরঞ্জাম এবং পাকা চামড়ার উপর উন্নতমানের হরফের বিভিন্ন পদ্ধতির লেখনী মরক্কো, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে যথেষ্ট সমাদৃত হয়। সেই সময়ের চামড়ার উপর রুচিশীল অলঙ্কার কাজ আজও বিশ্বের নামকরা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। লৌহ ও ইস্পাত দ্বারা কৃষি, শিল্পের ও গৃহস্থলীর কার্যনির্বাহক যন্ত্রপাতি এবং সামরিক প্রয়োজনে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণেও কর্দোবার কর্মকারগণও কম খ্যাতিমান ছিলেন না। দেশে তাহাদেরও যথেষ্ট সুনাম ছিল। কৃষি ক্ষেত্রে পানি সেচের জন্য তামার ও সীসার পাইপযোগে পানি শস্যক্ষেত্রে সরবরাহ করা হইত। তাহা ছাড়া রাজধানীর পানি সরবরাহ পাইপের দ্বারা হইত। রাজধানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল পুষ্পকানন। বিভিন্ন রং ও সুগন্ধি যুক্ত পুষ্পের মেলা বসিত বিভিন্ন ঋতুতে-কর্দোবার প্রায় প্রতিটি ভবন সুন্মুখস্থ পুষ্প উদ্যানে। অন্ন আর পুষ্প এই

দুইটি বস্তুর চাহিদাও যেমন ছিল বিপুল আর সংগ্রহও ছিল তেমনি অঢেল। কর্দোবার বাজার রকমারি পণ্যে ছিল বোঝাই। ফলমূলের দোকানগুলিতে সর্বদা ক্রেতার আর বিক্রেতার ভীড়ে সরগম থাকিত। জলপাই, আঙ্গুর, ডালিম, নাশপাতি, কমলা, পীচ, খুবানী ডুমুর, আখ, মধু ও জাফরাণ ইত্যাদি দোকানগুলিতে থরে বিথরে সাজানো থাকিত।

কর্দোবার সভ্যতা আর জ্ঞানশিখা সমগ্র ইউরোপ গগনে রবিরশ্মির ন্যায় বিকীর্ণ হইত। তদানীন্তন বিশ্বে বাগদাদ কনষ্টানটিনপল ও কর্দোবাই ছিল বিশ্বের সভ্যতার পীঠস্থান। কিন্তু কর্দোবার সভ্যতা যেন সবাইকে অতিক্রম করিয়াছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানে কর্দোবার খ্যাতি ছিল বিশ্ব বিখ্যাত। প্রত্যেক নরপতিই ছিলেন বিদ্যানুরাগী ও জ্ঞান সেবক। ছোট বড় প্রত্যেক শহরেই ছিল শিক্ষায়তন। বড় বড় উচ্চ শিক্ষার জন্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষা বিস্তারে উমাইয়া আমির বা খলিফাগণ অকৃপণভাবে খরচ করিতেন। কবি, সাহিত্যিক, ধর্মশাস্ত্রবিদ, চিকিৎসক, গবেষক, গায়ক ও কলাবিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার মনীষীবৃন্দ যে কর্দোবাকেই তাহাদের নিরাপদ আশ্রয় ও সম্মানিত নিবাসরূপে বাছিয়া লইয়াছিলেন। জ্ঞানচর্চা এতবেশি জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, প্রসিদ্ধ ওলন্দাজ ঐতিহাসিক ডজি তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ spainsh Islam-এ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, স্পেনের প্রতিটি নাগরিকই লেখাপড়া জানিত। অথচ সেই সময় ইউরোপ অজ্ঞতা ও মূর্খতায় নিমজ্জিত ছিল। কেবলমাত্র গুটিকয়েক অভিজাত ও ধর্মযাজক শ্রেণীর মধ্যে লেখাপড়া সীমিত ছিল। জ্ঞানার্জনের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা দিতে খলিফাগণ কোন সময় ত্রুটি করেন নাই। ফলে জ্ঞান শাখার বিভিন্ন দিক চরম উৎকর্ষ লাভ করে। গবেষণালব্ধ জ্ঞান ভাণ্ডারে কর্দোবার বিশ্ববিদ্যালয় কক্ষগুলি পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। নব নব সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার দীপালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গণ। পণ্ডিতপ্রসূ কর্দোবার যশঃরাশি ছড়াইয়া পড়ে সমগ্র জাহানে। ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা হইতে ছুটিয়া আসে দলে দলে বিদ্যার্থীগণ। লন্ডন, গ্রীস, জার্মানী ও ইতালীর জ্ঞানপিপাসুদের ভিড়ে কর্দোবার বিদ্যায়তনগুলি কলমুখরিত হইয়া উঠে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে জ্ঞানপিপাসুদের আগমন ঘটে কর্দোবার উন্মুক্ত জ্ঞান সরোবরে। যুগে যুগে মনীষীদের সৃজনশীল জ্ঞান সাধনার ফসলে সমৃদ্ধ হয় কর্দোবার জ্ঞান ভাণ্ডার। অসংখ্য কবি, ভাষাবিদ, সাহিত্যিক, বৈয়াকরণিক, শাস্ত্রবিদ, চিকিৎসক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, জ্যোর্তিবিদ কর্দোবার জ্ঞান ভাণ্ডারের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে দার্শনিক, ইবনে মাসরাহ, শাস্ত্রবিদ, ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়া, ঈসা বিন দীনার, আবু ইব্রাহীম, আবু বকর বিন মাবিয়া, সাঈদ বিন রাজিক, ঐতিহাসিক, ইবনুল আহমর, আবদুল্লাহ্ বিন মামার, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ, আতরাফ ইবনুল কুতিয়া, জ্যোর্তিবিদ আহমদ বিন নসর, মাসলামাহ ইবনুল কাসিম, আবুল কাসিম, চিকিৎসক, আরিব বিন সাঈদ, ইয়াহয়া বিন ইসাহাক, হাসদাই (ইহুদী) আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবদুল উজরী, আবদুর রহমান ইসাহক বিন হাইসাম ও প্রখ্যাত সার্জন আবুলকাসিম ভাষা বৈয়াকরণিক ও সাহিত্যিক আবু আলি আল কুতিয়াহ, আবু আলী আল কুলী, কিতাবুল আইন প্রণেতা আবু বকর আল জুবাইদী, ইব্রাহিম বিন নাজর ; কবি উবাদা বিন আবদুল্লাহ, আবদুল ওয়ারিস বিন সুফিয়ান, সাঈদ বিন উসমান এবং সাঈদ বিন হাসান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থাগার

পুস্তক সংগ্রহ ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় কর্দোবার আমির ও খলিফাগণ সবিশেষ যত্নশীল এবং আগ্রহী ছিলেন। সকলেই দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন। গ্রন্থ সংগ্রহে খলিফা দ্বিতীয় হাকাম সর্বাপেক্ষা কৃতিত্বের দাবীদার। বেতনভূক কর্মচারী নিয়োজিত করিতেন দেশবিদেশ হইতে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য। দামেস্ক, বাগদাদ, কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, কনষ্টানটিনপল প্রভৃতি কেন্দ্র হইতে সংগ্রাহকগণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া গ্রন্থ সংগ্রহ করিতেন। গ্রন্থ সংগ্রহের ইতিহাসে এক অনন্য কীর্তি তৎকালীন জগতে স্থাপন করে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার চারলক্ষ পাণ্ডুলিপিতে সমৃদ্ধ ছিল। এত অধিক সংখ্যক গ্রন্থ আর কোথাও ছিল না। ক্রমিক সংখ্যা নিরুপণের জন্য ৪৪ খানা তালিকা গ্রন্থ ছিল। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ব্যতীত কর্দোবাতে আরও ৭০টি গ্রন্থাগার ছিল। খলিফা দ্বিতীয় হাকামের সময় কর্দোবা বইয়ের বাজারে পরিণত হয়। ইহার দ্বারা বই কেনার আগ্রহ কত সার্বজনীন ছিল তাহা সহজে অনুমান করা যায়।

শিক্ষা, সংস্কৃতি, আচার, ব্যবহার রীতিনীতি আদব কায়দা, চাল চলন, আহার বিহার, পোষাক পরিচ্ছদ, খেলাধুলা, অবসর বিনোদন ও ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদনে কর্দোবা ইউরোপের সমাজে এক নূতন জীবনের শুভ অভ্যুদয় ঘটায়। মার্জিত রুচি, পরিচ্ছন্ন দেহ, সুবাসিত পরিচ্ছদ, শালীন ব্যবহার, রুচিসম্মত আহার, ভদ্র সম্ভাষণ, বিনম্র চালচলন, নয়নাভিরাম সাজ-সজ্জা ইত্যাদিতে কর্দোবা ছিল সমগ্র ইউরোপের শিক্ষাকেন্দ্র। লিয়োন, ন্যাভারী অথবা বার্সিলোনার শাসনকর্তাদের যখনই কোন সার্জন, রাজমিস্ত্রি, সঙ্গীতের ওস্তাদ, অথবা উন্নতমানের দর্জির প্রয়োজন হইত তখনই কর্দোবার শরণাপন্ন হইত। এই মুসলিম রাজধানীর যশোঃ গাঁথায় সুদূর জার্মানীর একজন মঠবাসী সন্নাসিনী মুগ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, 'কর্দোবা জগতমণি'—The jewel of the world.

হিরা কাঞ্চন, চুনিপান্না-মণিমুক্তা অলঙ্কারে বিভূষিতা আন্দালুসিয়া কণে কর্দোবা। দক্ষ অভিজ্ঞ ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন মহান জ্ঞান তাপস ও প্রজাহিতৈষী সুলতানগণ তাহার শিরোপা সদৃশ, যশস্বী কবিগণের ভাষা সমুদ্রের মুক্তায় ও ছন্দ তরঙ্গের কাঞ্চন আভায় গ্রথিত কাব্যমালা তাহার কণ্ঠহার, জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পকলার অনন্য প্রতিভাধর পণ্ডিতগণ তাঁহার সাজ-সজ্জা, তুষার ধবল মর্মর মণ্ডিত প্রাসাদগুলিই তাঁহার বাসভবন, পুষ্পউদ্যান ও কাননকুঞ্জে মৌসুমী প্রস্ফুটিত সুরভী পুষ্পই তাঁহার ওষ্ঠাধারের রক্তিম আভা, অঢেল শস্য আর বিপুল ফলমূল এবং অজস্র ঐশ্বর্যশালীনী রূপে অপসরী, যশে গরবিনি এক অপরূপ নয়নাভিরাম ছবি।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কর্দোবা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার গৌরবভেরী বাজাইয়া অবশেষে মুসলিম শাসনাবসানে চির নিদ্রায় নিদ্রিত। আজও সেখানে সেই সড়ক সেতু প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ মুসলিম কীর্তির স্বাক্ষর লইয়া কি যেন বলিতেছে। স্পেনে মুসলিম শাসনাবসান এক নিদারুণ শোকাবহ ইতিহাস, সে ইতিহাস বড় দুঃখের, গভীর আফসোসের, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক লেনপুল সাহেব বলেন, "যদিও ১৪৯২ সালে গ্রানাদা পতনের চল্লিশ বৎসরের মধ্যে তুর্কী মুসলমানেরা (প্রাচ্যের দিক হইতে) কনষ্টানটিনপাল জয় করিতে সমর্থ হয় এবং ইউরোপে প্রবেশ করে তথাপিও সেই ক্ষতির নিকট এই লাভ নিতান্তই নগণ্য। তুর্কীরা কোনদিন অদ্বিতীয় কর্দোবা তৈয়ার করিতে পারে নাই।"

উনবিংশ অধ্যায়

স্পেনে উমাইয়া যুগের শাসন ব্যবস্থা

[সার সংক্ষেপ ঃ সূচনা ❑ স্পেনে উমাইয়া যুগের শাসনব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থা ।]

৭১১ সালে দামেস্কের উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের সময় স্পেন বিজিত হয়। ৭১১ সাল হইতে ৭৫৬ সাল পর্যন্ত স্পেনের যে শাসন ব্যবস্থা তাহা মূলতঃ তিনটি নিয়মে ছিল। এই অঞ্চলের শাসন পরিচালনা কখনও দামেস্ক খলিফার আদেশে, কখনও উত্তর আফ্রিকার গভর্ণর জেনারেলের আদেশে, আবার কখনও স্পেনের সামরিক বাহিনীর ইচ্ছায় পরিচালিত হইত। ১০৩১ সালে উমাইয়া যুগের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত যে শাসন ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন আমির বা খলিফা। তিনি ছিলেন সামরিক, প্রসাসনিক ও ধর্মীয় প্রধান। তাঁহার নামে খুত্‌বা পাঠ করা হইত, মুদ্রায় নাম অঙ্কন করা হইত এবং রাষ্ট্রীয় আদেশে নাম উল্লেখ থাকিত। আমির বা খলিফা অধিকাংশ সময়ে উত্তরাধিকার সূত্রে মনোনীত হইতেন এবং মাঝে মাঝে অমাত্য ও অভিজাত শ্রেণীর দ্বারা নির্বাচিত হইত। আমির বা খলিফা শাসনকার্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার জন্য হাযিব বা প্রধানমন্ত্রী, কায়েদ বা সেনাবাহিনী প্রধান ও কাজী বা প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করিতেন। ইহা ব্যতীত আরও অনেক কার্যনির্বাহী দফতর ছিল। বর্তমান যুগের ন্যায় কর্দোবার সেতুর নিকটে একটি মন্ত্রণালয় ছিল। সেই মন্ত্রণালয় আল-কাজার ইমারতে অবস্থিত ছিল। সমগ্র প্রশাসনকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় (১) অর্থ (Finance) (২) সামরিক (Military) এবং (৩) বিচার (Judiciary)। সুশিক্ষিত, সুদক্ষ এবং অভিজাত শ্রেণীগণই রাজ্যের উচ্চ ও গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হইতেন। নওমুসলিম এবং অমুসলিমগণও রাজ্যের বিভিন্ন পদে সমাসীন ছিলেন। খলিফা বা আমিরের একটি মন্ত্রী পরিষদ ছিল। ইহাকে ওজারাত বলা হইত। প্রত্যেক উজির স্বীয় বিভাগের প্রধান ছিলেন। আবদুর রহমানের (১ম) সময়ে বেশ কিছু সংখ্যক উপদেষ্টা ছিলেন। ইহাদিগকে শাইখ বলা হইত। রাজ্যের চারিটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় ছিল যথা— অর্থ, বিচার, পররাষ্ট্র ও সমর মন্ত্রণালয়।

হাযিব

মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি ছিলেন হাযিব। এখানে হাযিবকে প্রধান মন্ত্রীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তিনি খলিফার প্রতিনিধি হইয়া রাষ্ট্রের কার্য খলিফার নামে করিতেন। সামরিক অভিযানেও তিনি খলিফার প্রতিনিধিরূপে সেনাপতিত্ব করিতেন। তিনি মন্ত্রী, প্রাদেশিক গভর্ণর ও বিচারপতিদের নিয়োগ এবং বরখাস্ত খলিফার অনুমোদন সাপেক্ষে করিতেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাবলিতে তিনি খলিফা ও জনগণের মাঝখানে থাকিতেন। খলিফাকে জনগণ হইতে আড়াল করিয়া রাখিতেন বলিয়া তাহাকে হাযিব বলা হয়।

খুত্তাহ্ বা সচিবালয়

এই বিভাগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইহার প্রধান কার্য ছিল রাজ্যের আয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা। এই সচিবালয়ের একজন প্রধানও ছিলেন। তাহাকে মন্ত্রীর পদমর্যাদায় বেতন ও সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইত। এই সচিবালয়ে খাতিম আল রাসায়েল এবং খাতিব আল জামাম নামে দুইজন অফিসার ছিলেন। প্রথম জন রাষ্ট্রীয় চিঠিপত্র এবং দ্বিতীয় জন সরকারী অর্থ বিভাগের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন।

বিচার বিভাগ

আমির বা খলিফাগণই ছিলেন রাজ্যের প্রধান বিচারপতি। তবে সাধারণ বিচার কার্যনির্বাহের জন্য একটি বিচার বিভাগ ছিল। রাজ্যের প্রধান বিচারালয় কর্দোবাতে ছিল। প্রধান বিচারপতিকে কাজী আল কুজ্জাত বলা হইত। ছোট ছোট শহরে যিনি বিচারপতি ছিলেন তাহাকে হাকিম বলা হইত। সামরিক ছাউনী বা সামরিক বাহিনীতেও কাজী থাকিতেন। তাহাকে কাজী আল জুন্দ বলা হইত। প্রধান কাজীর কার্যের সুবিধার্থে আসহাবুল রা'য় নামে একটি পরিষদ ছিল। এই পরিষদ জটিল সমস্যার সমাধানে প্রধান বিচারপতিকে সাহায্য করিতেন। প্রধান বিচারপতি এত ক্ষমতা রাখিতেন যে, তিনি আমিরকেও পর্যন্ত আদালতে হাজির করিতে পারিতেন। ন্যায়বিচার এবং আইনের নিকট সমান এই নীতি তিনি বলবৎ রাখেন।

বিচার বিভাগের কার্যকে সহজ করিবার জন্য আরও কতকগুলি পদ ছিল। সেই পদে যাহারা অধিষ্ঠিত ছিলেন তাহারা হইলেন– (১) কাজী আল আছাকীর (সামরিক বিভাগে বিচারপতি) (২) সাহিবুল মাজালিম (মজলুমদের প্রতি ইনসাফ কায়েমের বিচারপতি) (৩) সাহিব আল রা'দ (বিচারকদের বিরুদ্ধে অভিযান শ্রবণ ও বিচারের বিচারপতি) (৪) সাহিবুল শুরতাহ (পুলিশ প্রধান) (৫) সাহিবুল সুক (বাজার প্রধান) (৬) সাহিবুল মাওয়ারিস (এতিম ও ওয়ারেস সম্পর্কিত বিচারের বিচারপতি) ইহা ব্যতীত প্রতি শহরে একজন সাহিবুল লায়ল ও একজন সাহিবুল মদীনা থাকিতেন। প্রদেশে সাহিবুল আহদাস অবিকল কেন্দ্রের সাহিবুল শুরতাহর কার্য করিতেন। দশম শতকে সাহিবুল সুক মোহতাসিব নামে অভিহিত হন। মোহতাসিব বাজর দর নিয়ন্ত্রণ, জনগণের নৈতিক অপরাধ নির্ধারণ ও শাসন

করিতেন। মিথ্যা, জুয়াখেলা, ওজনে কম দেওয়া ইত্যাদি অপরাধে শাস্তি দেওয়া হইত। হাতকাটা ও মৃত্যুদণ্ড আইন বলবৎ ছিল। রাত্রিতে নগরদ্বারে যে প্রহরী থাকিত তাহাকে আল দারাবুন বলা হইত। ইহা ব্যতীত যাত্রাপথে জনগণের জানমাল ও ইজ্জত হেফাজতের জন্যও প্রহরী ছিল।

প্রাদেশিক শাসন

(১) কর্দোবা কেন্দ্রীক দক্ষিণ স্পেন (২) মধ্য স্পেন (৩) পশ্চিম স্পেন (গ্যালিসিয়া লুসিপিনিয়া) বর্তমান পর্তুগাল (৪) এবরোনদের উভয় তটভূমি (৫) দক্ষিণ ফ্রান্স (সেপটিমনিয়া) এই পাঁচটি অঞ্চলকে পাঁচটি প্রশাসনিক প্রদেশ হিসাবে গণ্য করা হইত। এই প্রদেশগুলিতে বেসামরিক অথবা সামরিক গভর্ণরদের দ্বারা শাসিত হইত। গভর্ণরকে ওয়ালি বলা হইত। প্রদেশগুলি আবার জেলায় বিভক্ত ছিল। জেলা প্রধানকে হাকিম বলা হইত। গভর্ণর বা ওয়ালি সাধারণতঃ সুদক্ষ সামরিক অফিসারকে করা হইত। প্রদেশেও মন্ত্রীপরিষদ ছিল। প্রদেশের প্রধান কার্য ছিল কেন্দ্রে সৈন্য সরবরাহ করা এবং স্থানীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রে প্রেরণ করা।

জনকল্যাণ ও পূর্তকর্ম

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সর্বদা প্রচুর অর্থ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষানিকেতন, সরকারী ভবন, প্রাসাদ, পুষ্পকানন, সেতু সড়ক, এতিমখানা, মোহাফেজখানা, হাসপাতাল, মসজিদ, মানমন্দির ইত্যাদিতে ব্যয় করিতেন। দুর্ভিক্ষ, ফসলহানি ও যুদ্ধকালীন ক্ষয়ক্ষতিতে জনগণের অভাবের সময় সরকার বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। সরকারী কোষাগার ও শস্যভাণ্ডার হইতে পর্যাপ্ত অর্থ ও খাদ্য সরবরাহ করা হইত। হাযিব আলী মনসুরের সময় দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় ২০০০,০০০ খাদ্য শস্য বিতরণ করা হয়।

সৈন্যবিভাগ

চারটি পদ্ধতিতে সৈন্যবাহিনী সংগৃহিত হইত। (১) স্থায়ী সৈন্য (সদর দফতর কর্দোবা) (২) সামরিক জায়গীরদারদের দ্বারা নিয়মিত সৈন্য (৩) অনিয়মিত সৈন্য ও (৪) প্রয়োজনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী।

প্রথমদিকে সৈন্যবাহিনীকে বেতনের পরিবর্তে জায়গীর প্রদান করা হইত। কিন্তু এই ব্যবস্থায় যথেষ্ট ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ায় আমির ও খলিফাগণ পরবর্তীকালে ইহা পরিবর্তন করেন। দেশীয় আরব, হিমারীয়, মুধারীয়, বার্বার ও নওমুসলিম ইত্যাদি সৈন্যদের মধ্যে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব ও সমঝোতার অভাবের ফলে শাসকগণ বিদেশী সৈন্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়েন। আবদুর রহমানের (১ম) অধীনে ৪০০০০ হাজার বার্বার সৈন্য ছিল। হাকামের (১ম) সময়ে ৫০,০০০ মামলুক সৈন্য ছিল। আবদুর রহমানের (২য়) সময় কর্দোবার নাগরিকগণকে বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। আবদুর রহমানের (৩য়) ১৫০০০০ সৈন্য ছিল এবং দেহরক্ষীর সংখ্যা

১৫০০০-এ পৌঁছায়। আবদুর রহমান সেনাবাহিনীতে আরবদের বিশৃঙ্খলতা ও আভিজাত্য খর্ব করিবার মানসে শ্লাভ বাহিনী গঠন করেন। খলিফা হাকামের (২য়) সময়ে দেশীয় সৈন্যবাহিনী সংগ্রহের পরিবর্তে শ্লাভ বাহিনী সংগঠনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

সৈন্যবাহিনীর সংগঠনের দিক দিয়াও স্পেনের উমাইয়াগণ সতর্ক ছিলেন। দক্ষতা, নিপুণতা, শৃঙ্খলা ও অভিজ্ঞতা বর্ধন কল্পে সংগঠন মজবুত করেন। ৫০০০ সৈন্যের একটি দল একজন আমিরের কমাণ্ডে থাকিত। এই বিভাগে একটি বৃহদাকার পতাকা থাকিত, তাহার নাম রায়াহ। এই বিভাগ আবার পাঁচভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক বিভাগে ১০০০ করিয়া সৈন্য একজন কায়েদের অধীনে থাকিত। এখানেও পতাকা ছিল, তাহার নাম আলম। এই বিভাগ আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল প্রতিটি ভাগে ২০০ সৈন্য একজন নকীবের অধীনে থাকিত। এখানকার পতাকার নাম লিউয়া। পুনরায় এই বিভাগ পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রতি ভাগে ৪০ জন সৈন্য একজন আরিফের অধীনে ছিল এবং সর্বনিম্ন ভাগে ৮ জন সৈন্য একজন নাজিরের অধীনে ন্যস্ত হইত। সৈন্যবাহিনী তদারকী করিবার জন্য একজন পরিদর্শক ছিল। তাঁহার নাম সাহিবুল আরজ। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীর বিন্যাস নিম্নরূপ ছিল—

পদাতিক বাহিনী (ঢাল, তরবারী, বর্শাসহ)
তীরন্দাজ বাহিনী (সুতীক্ষ্ণ তীরসহ)
অশ্বারোহী বাহিনী (প্রয়োজনীয় অস্ত্রসহ)

নৌবাহিনী

প্রথমদিকে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানগণ নৌবাহিনী গঠনের উপর মোটেই গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। কিন্তু নৌবাহিনী গঠনের অনুকূল পরিবেশ স্পেনে ছিল। ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক উপকূলে শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠনের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমির বা খলিফাগণ এদিকে বিশেষ নজর দেন নাই। তবে আবদুর রহমানের (২য়) সময়ে যখন নরম্যান দস্যুগণ স্পেনের উপকূলীয়বন্দরে লুণ্ঠনকার্য শুরু করে, তখনই তিনি তাহাদের বিতাড়িত করিবার জন্য নৌবাহিনীর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। উপকূলীয় বন্দরকে শক্তিশালী করিবার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ভূমধ্যসাগরের আধিপত্য স্থাপনের বিষয় লইয়া আবদুর রহমান (৩য়) ফাতেমীয় খলিফাদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তিনি নৌবাহিনীর উপর সেই সময়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। আবদুর রহমান (৩য়) ও হাকামের (২য়) সময়ে কায়েদ বাহার ছিলেন আবদুল্লাহ বিন রিয়াহীন তরতোসা, দেনিয়া, আলকানতি, আলমেরিয়া ও আলজিসিয়াস প্রভৃতি উপকূলীয় বন্দরে নৌবাহিনীর ঘাটি স্থাপন করেন। গোয়াদালকুইভার নদীর তীরে অনেকগুলি নৌযান নির্মাণ কারখানা ছিল। স্পেনীয় মুসলমান নাবিকগণ সমুদ্র যাত্রায় বিশেষ অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা ভূমধ্যসাগর, আটলান্টিক মহাসাগরের দূরপাল্লায় যাত্রা করিতেন। কলোম্বাস ও ভাস্কো-ডা-গামার নৌপথ আবিষ্কারের মূলে স্পেনীয় মুসলিম নাবিকদের অবদান উল্লেখযোগ্য ছিল। মুসলিম নাবিকদের সাহায্যেই তাহারা সমুদ্রপথে তাহাদের লক্ষ্যস্থানে পৌঁছাইতে সক্ষম হন। যদি স্পেনে

মুসলিম শাসনের শুরুতেই নৌবাহিনীকে স্থলবাহিনীর ন্যায় শক্তিশালীরূপে গড়িয়া তোলা হইত, তবে মুসলমানদিগকে অত সহজে এমন অসহায়ভাবে স্পেন হইতে বিতাড়িত করা সম্ভব হইত না।

উমাইয়া যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা

তিন শতাব্দী ব্যাপী স্পেনে উমাইয়া রাজত্বের অর্থনৈতিক ইতিহাস জানিতে হইলে আমাদের উৎসের সন্ধান লইতে হইবে। এই উৎসগুলি হইল সাধারণতঃ (১) ভূগোল গ্রন্থ (২) ইতিহাস গ্রন্থ (৩) জীবনী (৪) কৃষি (৫) চুক্তিনামা (৬) হিসবা (শহর এবং বাজার আইন) (৭) আইনশাস্ত্র (৮) কোর্টের রায় (৯) শিল্পকলা ও স্থাপত্য (১০) শিল্পজাত দ্রব্য (যেগুলি বিভিন্ন যাদুঘরে রক্ষিত) উপরোক্ত উৎস হইতে আমরা উমাইয়া যুগে স্পেনের অর্থনৈতিক ইতিহাসের কথা জানিতে পারি। প্রথমতঃ কৃষির কথাই আলোচনা করা যাক।

কৃষি

মুসলমানদের স্পেন বিজয় করিবার পর হইতে স্পেনের ভূমি বন্দোবস্ত ছিল জায়গীর প্রথায়। বার্বার, আরব ও সিরীয় এমনকি খ্রিস্টানদের নিকটও এই জায়গীর ভূমি ছিল। দেশের নিরাপত্তামূলক কার্যের বিনিময়ে এই ভূমি তাহারা লাভ করিতেন। তাহারা ভূমি আবাদ এবং ভূমির খাজনাও আদায়ের বন্দোবস্ত করিতেন। জায়গীরদারগণও বর্গা প্রথার দ্বারা প্রধানতঃ এই কাজ করিতেন। আমির হাকামের (১ম) সময় হইতে জুন্দ (নিয়মিত) এবং বালাদীস অনিয়মিত (সন) প্রথার প্রবর্তন হয়। কিন্তু দশম শতকে বিপুল সংখ্যক নিয়মিত সৈন্য মোতায়েন রাখার বন্দোবস্তের ফলে জায়গীরদারগণকে উৎপন্ন শস্যের রাজকোষে দিতে হইত। জায়গীরদার, জমিদার, বর্গাদার এবং ভূমি কর্ষণের জন্য চাষীদের মধ্যে একটি কৃষি চুক্তি থাকিত যাহার ফলে কৃষিকাজ যথেষ্ট উন্নতির সাথে চলিত। জমিদারগণ ও জায়গীরদারগণ খামার সংলগ্ন বাড়িতে অথবা শহরের বিলাসবহুল বাড়িতে বসবাস করিতেন। তবে কৃষকের অবস্থা খুবই সুবিধাজনক ছিল। পতিত জমি আবাদ করিতে হইলে ভূমি মালিককে জমি চাষ করিয়া শস্য বপণ উপযোগী করিয়া দিতে হইত এবং বীজের ১/৩ অংশ সরবরাহ করিতে হইত। প্রথম বৎসরের সমস্ত ফসল কৃষক পাইত এবং পরবর্তী বৎসরে একটি চুক্তির মাধ্যমে ১/৩ অংশ, ১/৪ অংশ, ১/৬ অংশ কিংবা ১/ঃ অংশ ভূমি মালিককে দিতে হইত। খুবই ফলনশীল আবাদী জমি হইলে ফসলের অর্ধেক কৃষক পাইত। দিনমজুর ভূমিমালিকের জমি দেখাশুনা, চাষাবাদ, ফসল বোনা ও কাটার কাজ ছাড়াও মনিবের পশুচারণ করিতে হইত। এই সমস্ত দিনমজুরকে চুক্তির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদে বা ফসলী সনের জন্য রাখা হইত। তাহাকে বেতন আহার এবং বস্ত্র দেওয়া হইত।

অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, তুষারপাত, কুয়াসা, পোকার আক্রমণ, বন্যজন্তুর উপদ্রব এবং সামরিক অভিযানের জন্য ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি হইলে কৃষককে ক্ষতিপূরণ দিতে হইত। মালিক যদি ক্ষতিপূরণ না দিতে চাহিত হবে আদালতে বিচারের মাধ্যমে আদায় করা হইত।

আরবগণ চাষাবাদের কাজে খুবই উৎসাহী ছিলেন। তাহারা শহরে চিত্তবিনোদনের জন্য অট্টালিকা নির্মাণ করিতেন সত্য, কিন্তু স্থায়ীভাবে কৃষিক্ষেত সংলগ্ন গ্রামে বসবাস করিতে অধিক পছন্দ করিতেন। যোসেভ ম্যাকভ বলেন যে, এমন এক সময় ছিল যখন ভূমিদাস বা ক্রীতদাস খুঁবই বিরল ছিল। আরবগণই চাষাবাদে উৎসাহী ছিলেন। গুয়াদাল কুইভার নদীর তীর জুড়ে ১২০০০ হাজার সুখী পল্লী গড়িয়া উঠে।

উৎপন্ন শস্য গুদামজাত করণের ব্যবস্থা খুবই সুন্দর ছিল। দশ বৎসর কিংবা শস্যবিশেষে তারও অধিককাল খাদ্য মজুত করা যাইত। রাজ্যের প্রায় সবকটি প্রদেশেই গুদামঘর ছিল। তবে শস্যের গুদামের জন্য সারাগোসা, তলেদো, সেভিল এবং লোরসা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গুদামজাত শস্যগুলি অভাবের দিনে বিতরণ করা হইত। গম ১০০ বৎসর পর্যন্ত রাখা যাইত। ফল শুকনা অবস্থায় ৫/৬ বৎসর রাখা যাইত। বিভিন্ন সূত্রে একথা বর্ণিত যে, তলেদোর আবহাওয়া এত অনুকূল ও সুন্দর ছিল যে, গত ৫০, ৬০, ৭০ বৎসর পর্যন্ত অবিকৃত ও টাটকা অবস্থায় মৌজুদ রাখা যাইত।

বিভিন্ন শস্য, ফলমূল ও ফুল উৎপাদনের জন্য ভূমি, পানি, বাতাস ও সূর্যের কিরণের অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন। স্পেনের ভূ-প্রকৃতি জলবায়ু সত্যি চমৎকার ছিল। ঐতিহাসিক মাককারী বলেন যে, আবু উবায়দুল্লাহ আল বাকরী আল আন্দালুসী তাহার স্বদেশ স্পেনকে সিরিয়ার সাথে তুলনা করেন নির্মল আবহাওয়া ও সুমিষ্ট পানির জন্য, ইয়েমেনের সাথে নাতিশীতোষ্ণ উত্তাপের জন্য, ভারতবর্ষের সাথে ভেষজ উদ্ভিদ এবং রোপণযোগ্য চারার অনুকূল অবস্থার জন্য, আহওয়াজের সাথে স্বর্ণের আধিক্যের জন্য চীনের সাথে খনি ও মূল্যবান পাথরের জন্য, এডেনের সাথে ইহার অসংখ্য নাব্য নিরাপদ পোতাশ্রয় ও সুন্দর উপকূলীয় বন্দরের জন্য। স্পেনের বিশেষ কতকগুলি প্রদেশের উর্বরতা প্রবাদ বাক্যের ন্যায় ছিল। সেভিলের সন্নিকটে এ্যাজারফ অঞ্চল পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উর্বরা নামে খ্যাত। সর্বসাকুল্যে একথা বলা চলে যে, স্পেনের ভূপ্রকৃতিতে রুক্ষতা ও হিমেল শৈত্যতা থাকিলেও তাহার উৎপাদনশীল উর্বরা জমির পরিমাণই উল্লেখযোগ্য।

স্পেনের বৃষ্টিপাত অনিয়মিত বিধায় একটি সুন্দর ও সুষম সেচব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। কূপ খনন, পাইপের সাহায্যে নদী হইতে পানি লইয়া কৃষিক্ষেত্রে সরবরাহ করিতে হইত।

উৎপন্ন দ্রব্য

উৎপন্ন ফসলের মধ্যে গম, বার্লি, ধান এবং ভুট্টাই ছিল সর্বাধিক। লোরসা, তলেদো, তুদেলা, সেভিল, ক্যাতিবারিয়া, কারমোনা, এ্যাভেরা, শারিস ও সারাগোসায় এই সমস্ত শস্যগুলি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হইত। ধানের চাষ সাধারণতঃ পলিবিধৌত নদীর তীরে করা হইত। Rice শব্দটির উৎপত্তি সাধারণতঃ আরবী ARUZZ হইতে। স্প্যানিশে ইহাকে ARROZ বলা হয়। ফরাসী ভাষায় RIZ এবং ইংরেজিতে RICE। অনেকে আবার তামিল শব্দ ARRASI থেকে আরবী ARUZZ এ রূপান্তরিত মনে করেন। স্পেনে ধানের চাষ সম্ভবতঃ দশম শতাব্দী হইতে শুরু হয়।

ফলমূল

ফলমূলের জন্য স্পেন খুবই প্রসিদ্ধ। স্পেনের জলপাই সমগ্র ইউরোপে সুবিখ্যাত। মুধ্যযুগে মালাগার মদ, সেভিলের জলপাইয়ের তেল, কর্দোবার কিতাব এবং সেভিলের বাদ্যযন্ত্র বিখ্যাত ছিল। স্পেনে বিভিন্ন প্রকারের আঙ্গুর উৎপন্ন হইত। স্পেনের সর্বত্রই আঙ্গুরের চাষ হইত প্রচুর পরিমাণে। বিভিন্ন রকমের ও বিভিন্ন স্বাদের আঙুর স্পেনে চাষ হইত। তবে লোরসাতে আঙ্গুরের চাষ সর্বাধিক হইত। স্পেনে ডুমুর ও বিভিন্ন রং-এর এবং প্রকারের ছিল। মালাগা ও সেভিলে ইহা প্রচুর উৎপন্ন হইত। আপেলের প্রকারভেদও এখানে ছিল বিচিত্র। কোনটি মিষ্ট, কোনটি টক আবার কোনটি স্বাদবিহীন ছিল। ইহা ব্যতীত আখরোট, নাশপাতি, পীচ, খোবানী, কমলা এবং শাকসব্জীসহ গোলমরিচ মশলা, ডাল, পেয়াজ ও অন্যান্য দ্রব্যের প্রাচুর্য ছিল।

স্পেনের ফলমূল দেশের জনগণের চাহিদা মিটাইয়া উদ্বৃত্ত থাকিত এবং বিদেশে রপ্তানী করিয়া প্রচুর অর্থ লাভ হইত। জনগণ এই সমস্ত ফসলাদি চাষাবাদের মাধ্যমে গোটা দেশটিকে যেন শস্যভাণ্ডারে পরিণত করিয়াছিল।

পশম

স্পেনের পশম একটি প্রয়োজনীয় অর্থকরী সম্পদ বলিয়া গণ্য করা হইত। দেশের অধিকাংশ জনগণ চাষাবাদে আত্মনিয়োগ করিত এবং বিপুল সংখ্যক জনগণও পশু পালন করিত। ভেড়াপালন করা এখানে অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার ছিল। ভেড়ার লোম হইতে প্রচুর পরিমাণে পশম পাওয়া যাইত। ইহাছাড়া পাহাড় পর্বত ও নদীর তটভূমির বনানীতেও বিভিন্ন প্রকারের জীবজন্তু হইতে পশম সংগ্রহ করা হইত। ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট পোশাক তৈয়ারী করা হইত।

রেশম

গুটিপোকা হইতে রেশম পাওয়া যাইত। তুতগাছে গুটিপোকার চাষ করা হইত। এলভিরা জেলাতে প্রচুর পরিমাণে রেশমের চাষ হইত। এলভিরার রেশম শিল্প এত উন্নতমানের ও ব্যাপক পরিমাণের ছিল যে, স্পেনে এবং দুনিয়ার সর্বত্রই ইহার সুখ্যাতি ছিল। ইহা ব্যতীত জায়েন, গ্রানাদা, মুরসিয়া এবং ভ্যালেনসিয়াতেও রেশম শিল্প গড়িয়া উঠে। স্পেনের সিল্ক দ্রব্যাদি অত্যন্ত নামকরা ছিল এবং ইহা লাভজনক বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে পরিগণিত। ইহা ব্যতীত লিনেন, তুলা, আখ, মধু, স্যাফরোণ, (তুলাজাতীয়) প্রভৃতি দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত।

ফুল

ভারতবর্ষের মত স্পেনও বিভিন্ন ঋতুতে রকমারি রং বেরং এর সুগন্ধি ফুলের চাষ হইত। স্পেনের মার্জিত ও রুচিসম্পন্ন জনগণ ও শাসনকর্তারাও পুষ্পউদ্যান রচনায় বিশেষ আগ্রহ

দেখাইয়াছেন। প্রতিটি প্রাসাদের চত্তরে পুষ্পকানন তাঁহারা রচনা করিয়াছেন। স্পেনের গোলাপ ফুল ছিল অত্যন্ত নয়নাভিরাম। ইহা লাল, হলুদ, সাদা, গোলাপী রঙের রকমারি সুগন্ধিতে ভরপুর।

সুগন্ধি

জগতের পাঁচটি সুগন্ধি দ্রব্যে বণি আদমকে বিমোহিত করে যথা—মেশকআম্বর, স্যাফরণ, কস্তরী, ক্যাম্পর ও মুসবার। ইহাদের মধ্যে তিনটি স্পেনেই উৎপাদিত হইত।

কাঠ

স্পেন অতি প্রাচীনকাল হইতে কাঠের জন্য বিখ্যাত ছিল। ইহার মধ্যে পাইন, টিক ও ওক প্রসিদ্ধ। পার্বত্য বনানীতে এগুলি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। আসবাবপত্র তৈয়ারীতে ইহার খুবই প্রচলন ছিল এবং বিদেশেও রপ্তানী করা হইত।

স্পেনের ১/১০ অংশ জুড়ে ছিল বন। এই বন বিভাগ মুসলমানদের হেফাজতে ছিল। বন্য পশু শিকার আর কাষ্ঠ আহরণের জন্য মুসলমানদের নিকট বনভূমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বনভূমি হইতে প্রচুর মধু, গম, রজন ইত্যাদি সংগৃহীত হইত। কৃষিজ ও বনজ শিল্পে স্পেন খুবই সমৃদ্ধ ছিল।

পশু পালন

স্পেনে পশুপালন একটি লাভজনক পেশা ছিল। ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, উট, মহিষ ইত্যাদি পশুপালন হইত। ভেড়া, ঘোড়া, গাধা, বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মাংস দুধ ও পশম জনগণের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়ন করিত। যানবাহনের জন্য উট, গাধা ও ঘোড়া ব্যবহৃত হইত। অশ্বপালন স্পেনের অভিজাত শ্রেণীর আভিজাত্যের নিদর্শনও ছিল। এইগুলি সামরিক প্রয়োজনে সর্বাধিক ব্যবহার করা হইত। বনভূমিতে নানা প্রকারের পাখীও পাওয়া যাইত এবং অনেক সামুদ্রিক পাখীও স্পেনে মিলিত।

খনিজ সম্পদ

প্রাচীনকাল হইতে স্পেন খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু গথদের অব্যবস্থার ফলে এই সম্পদ জনগণের সুখ আনিতে পারে নাই। মুসলমানদের আমলে এই সম্পদগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে জনগণের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়ন করে। খনিজ সম্পদের মধ্যে ছিল স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তামা, সীসা ও টিন ইত্যাদি। সমুদ্রের তলদেশে এবং ভূগর্ভে স্বর্ণ পাওয়া যাইত। লিসবন, লেরিদা, ও তাগুসে স্বর্ণ, বেজা, বাদাজোজ, তুদমির, কর্দোবা এবং এলভিরাতে রৌপ্য, ভ্যালেনসিয়া, এলভিরা, আলমেরিয়া এবং কর্দোবাতে সীসা পাওয়া যাইত। নীয়েবেলাতে কাঁচ সারাগোসাতে লবণ এবং কর্দোবার পারদ বিখ্যাত ছিল। বিভিন্ন প্রকারের মণি-মুক্তা, হীরা এবং মূল্যবান রঙ বেরঙের পাথরও স্পেনে পাওয়া যাইত।

শিল্প

উমাইয়া যুগে মুসলিম স্পেন অত্যন্ত শিল্পোন্নত ছিল। এই শিল্পই দেশের আর্থিক বুনিয়াদকে মজবুত করিয়া গড়িয়া তোলে। দেশে উৎপাদিত প্রচুর কাঁচামাল দক্ষ অভিজ্ঞ দেশী বিদেশী শ্রমিক এবং উৎপন্ন মালের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা স্পেনের শিল্পোন্নয়নের কারণ ছিল। কুটীরশিল্পই সমগ্র স্পেনের প্রাণস্পন্দনরূপে কাজ করিত। একক মালিকানা, যৌথ মালিকানা, কিংবা অংশীদার কারবার প্রথা কিংবা সমবায় ভিত্তিক মালিকানায় শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। বাটার প্রথায় কারবার পদ্ধতির প্রচলন ছিল। কারবারের মূলধন অনেক সময় ঋণের দ্বারা সংগৃহীত হইত এবং অর্থ সরবরাহকারীকে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হইত। পুরুষদের ন্যায় মহিলাগণও শিল্প বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিতেন। শিল্পের মধ্যে আটার কল দেশের সর্বত্রই ছিল। যেহেতু গম বা আটাই ছিল প্রধান খাদ্যশস্য তাই কলকারখানা অপরিহার্যরূপে দেশে বিস্তারলাভ করে। পানির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই মিলগুলি পরিচালিত হইত। একমাত্র গোয়াদালকুইভার নদীর পানি দ্বারা পাঁচ হাজার মিল পরিচালিত হইত। তৈলকল এবং মদ প্রস্তুত কারখানা, কাঠের কারখানা, চামড়ার কারখানা, কাপড়ের মিল ইত্যাদি শিল্প কারখানায় স্পেন সমৃদ্ধ ছিল।

কাঠের দ্বারা বিভিন্ন ধরণের অলঙ্করণ সমৃদ্ধ আসবাবপত্র তৈয়ারী হইত। প্রাসাদের দুয়ার, বাতায়ন, ছাদ এবং বিলাসবহুল দ্রব্যাদি মূল্যবান কাঠ দ্বারা তৈয়ার করা হইত। কাঠের অলঙ্করণ এত উৎকৃষ্ট ও উন্নতমানের ছিল যে, সেগুলি দর্শন করিলে আজও অবাক হইতে হয়। ফল, পাতা, গাছ, জীবজন্তু ও বিভিন্ন চিত্র কাঠের উপর নিখুঁতভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে। এই কারুকার্যে শ্রমিকের দক্ষতা এবং আভিজাত্যের নমুনা সহজে উপলব্ধি করা যায়। শ্রমিকের প্রচুর পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এইগুলি কার্য সম্পাদন করা হইত। ৮ জন কাঠের মিস্ত্রি সুদীর্ঘ ৭ বৎসর পরিশ্রম করিয়া ৩৬০০০ হাজার বিভিন্ন প্রকারের মূল্যবান কাঠের টুকরা এবং সোনা রূপার জোড়া দিয়া ৩৫৭৫ দীনার পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কর্দোবার মসজিদের সুরম্য মিম্বর নির্মাণ করেন। ঐতিহাসিক ইদ্রিসি ও মাক্কারী ইহাকে অতুলনীয় অনুপম সৌন্দর্যের সৃষ্টি মনে করেন। পার্বত্য অঞ্চলের কাঠের দ্বারা ব্যবসাবাণিজ্যও করা হইত। ইহাতে প্রচুর অর্থ উপার্জিত হইত।

চামড়ার কাজও স্পেনে নামকরা ছিল। লৌহ শিল্পও বিখ্যাত ছিল। স্পেনের লৌহবর্ম জগতে বিখ্যাত ছিল। তাহা ছাড়া স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা অলঙ্কার তৈয়ারীর কাজেও স্পেনের স্বর্ণকারগণ খ্যাতির দাবীদার।

বস্ত্র শিল্পে স্পেন তৎকালীন বিশ্বে অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করে। সিল্ক, লিনেন এবং সূক্ষ্ম সুতী বস্ত্রের জন্য স্পেন বিশ্বের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এই বস্ত্রের কারখানা কর্দোবাসহ প্রায় প্রত্যেকটি ছোট বড় শহরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সুন্দর বস্ত্রের নিদর্শন আজও লন্ডন, বার্লিন, মাদ্রিদ ও কায়রোর যাদুঘরে রক্ষিত আছে। বস্ত্রের মান বিচারে ইহার বিভিন্ন নামকরণ করা হইত। যেমন, তরাজ, হুলাল, ইসকালাতুন, আলজুরজানী, ইস্পাহানী এবং আতাবী ইত্যাদি। এক কর্দোবাতে ৮০০ + ১০০০ + ১০০০ + ১০০০ + ১০০০ + ১০০০ মোট ৫,৮০০ তাঁত ছিল। ১২০০০ শ্রমিক এই বয়ণ শিল্পে নিযুক্ত ছিল।

যাতায়াত

সড়কযোগে রাজধানী কর্দোবার সাথে অন্যান্য শহর ও বন্দরের সুন্দর যোগযোগ ছিল। রাজধানী কর্দোবা হইতে বিভিন্ন শহরের সাথে সংযোগরক্ষাকারী ৮টি রাজপথ ছিল। অধিকাংশ সড়কের মাঝে মাঝে সরাইখানা এবং পথিকদের নিরাপত্তার জন্য প্রহরী শিবির ছিল। বণিক, পথিক ও পরিব্রাজক নির্বিঘ্নে গন্তব্যপথে মালসামানসহ ভ্রমণ করিতে পারিত। প্রত্যেকটি শহরের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। ভূমধ্যসাগরে স্পেনীয় বন্দরগুলিতে নৌযানের ভীড়ে সর্বদাই মুখর থাকিত। আলমেরিয়া, আলজিসিরাস ও আলকানতি নদী বন্দরগুলিতে বাণিজ্য পণ্য উঠানামার জন্য নৌকা ও জাহাজ সর্বদা কর্ম ব্যস্ত থাকিত। তাহা ছাড়া নৌবাহিনীর প্রয়োজনেও এখানে নিরাপত্তাবাহিনী ছিল। বন্দরগুলির নিরাপত্তার জন্য প্রহরা স্তম্ভ ছিল (Watch Tower)।

স্পেনে যে সমস্ত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করা হইত তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পশু

পশুর মধ্যে খচ্চর পূর্বদেশে রপ্তানী করা হইত। এইগুলি এত মূল্যবান ছিল যে, এক একটির মূল্য ৫০০ দিনার ছিল।

মৎস

তানি নামক এক প্রকার মাছ সিউটা বন্দর দিয়া লবণ মিশ্রিত অবস্থায় বাহিরে চালান দেওয়া হইত।

তৈল

অলিভ ওয়েল বা জলপাইয়ের তৈল রপ্তানী করিয়া সেভিলবাসী বিশেষ অর্থশালী হইয়া উঠে। উত্তর আফ্রিকা এবং ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপাঞ্চলে এই তৈল রপ্তানী করা হইত।

ডুমুর

মালাগা হইতে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন রং‌এর ও স্বাদের ডুমুর মিশর, সিরিয়া, ইরাক ও চীনে রপ্তানী করা হইত। ইহা ব্যতীত অন্যান্য ফলমূল, চিনি, মধু, লবণ, সিল্ক, লিনেন, তুলা, কাঠ, কাগজ, চামড়া, বস্ত্র, কার্পেট, স্যাফরোন, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, টিন, তৈজষপত্র ও মৃৎপাত্র ইত্যাদি রপ্তানী করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জিত হইত।

আমদানী চক্রের মধ্যে ঘোড়া, উট, হাতী, গন্ডার, মহিষ, সিংহ, বাঘা, ভালুক, ষাঁড় এবং সুশিক্ষিত পাখী সিরিয়, উত্তর আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশ হইতে আমদানী করা হইত।

বিভিন্ন প্রকার ফলের গাছ ও চারা বিদেশ হইতে আমদানী করা হইত। মিশর হইতে তুলা আমদানী করা হইত। মূল্যবান পাথর ও মার্বেল এবং দাসদাসী বিদেশ হইতে আমদানী করা হইত। আমদানী তালিকার মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য জিনিস হইল গ্রন্থ। আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো, বাগদাদ ও দামেস্ক হইতে মূল্যবান গ্রন্থরাজি সংগ্রহ করা

হইত। আবদুর রহমান (৩য়) হাকাম (২য়) বই বিষয়ে সকলের সেরা ছিলেন। যে যে দেশের সহিত বৈদেশিক বাণিজ্য চলিত সেগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল : উত্তর আফ্রিকা, মিশর, সিরিয়া, আরব, ইরাক, পারস্য, খোরাশান, ভারত, চীন, বাইজানটাইন, ইতালী, ফ্রান্স, উত্তর ইউরোপ ইত্যাদি।

রাজস্ব

আয়ের উৎস ছিল রাজস্ব। এই রাজস্ব আসিত ভূমিকর, জাকাত, জিজিয়া, শুল্ক, খনিকর এবং গণিমাত হইতে। এই রাজস্ব সংগ্রহ ও বিতরণ ইত্যাদি হিসাব সংরক্ষণের ও সুষ্ঠু প্রশাসনের জন্য একটি মন্ত্রণালয় ছিল। এই মন্ত্রণালয়ের প্রধানকে খাজিন-আল-মাল বলা হইত। তিনি সাহিব-আল-মাকজান নামেও অভিহিত হইতেন। এই মন্ত্রণালয়ের শাখা-প্রশাখা গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শহর রাজস্ব সংগ্রাহককে আমির বলা হইত। তিনি গ্রাম ও নগর ইত্যাদি তদারক করিতেন।

দোকান, সরকারী স্নানাগার, মিল নৌযান ইত্যাদির উপর কর নির্ধারণের সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইত। এই বিভাগের উজিরকে অবশ্যই করবৃদ্ধি অথবা হ্রাস ইত্যাদির উপর সজাগ দৃষ্টি দিতে হইত ; এবং তাহাকে দ্রব্য তালিকার উপর ধার্যকৃত কর বিবরণী অবশ্যই কাজীর দরবারে পেশ করিতে হইত। কাজী সুন্নী আইন মোতাবেক করগুলি নিরূপিত হইয়াছে কি না তাহা দেখিতেন। এই বিবরণীর এক কপি রাজস্ব সংগ্রাহকের নিকট রাখিতে হইত। কোনক্রমে যদি অধিকহারে কর আদায় করা হইত তবে অপরাধমূলক কার্যহিসাবে বিবেচনা করা হইত এবং তাহাকে শাস্তি প্রদান করা হইত।

আমির এবং মুশরিফের পরামর্শ মোতাবেক ভূমিকর, জাকাত জিজিয়া এবং বাজারকর নির্ধারিত হইত। ব্যক্তিগত আয় ও উৎপন্ন ফসল কতটুকু হইয়াছে ইহার খবর তাহারাই বেশি রাখিতেন। ধার্যকৃত করের তালিকা তাহারা জেলা, প্রদেশে ও রাজধানীতে প্রেরণ করিতেন। জেলা ও প্রদেশের আদায়কৃত কর স্থানীয় ব্যয়ভার নির্বাহ করিবার পর উদ্বৃত্ত অংশ কেন্দ্রে প্রেরণ করা হইত। কর নগদ অর্থ অথবা দ্রব্য সামগ্রী দ্বারাও আদায় করা যাইত। কেন্দ্রে বায়তুলমাল হইতে ঘাটতি এলাকায় রাজস্ব প্রেরিত হইত। ভূমিকর কিংবা বাণিজ্যকর নির্ধারণের সময় ইনসাফ এবং ইহসান এমনভাবে কার্যকরী করা হইত যে, জনগণ কর প্রদানে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিতেন এবং কখনও কষ্ট বোধ করিতেন না। এই করের সাফল্য সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ম্যাকভ বলেন যে, 'অধিকন্তু জনগণ এই কর নির্ধারণ করেন, তাঁহারা অত্যন্ত সমতার ভিত্তিতে এই করের ফল উপভোগ করেন। কৃষিতে এই কর নির্ধারণ প্রথা এমন সতর্ক ও সুষ্ঠুভাবে হইত যে, ইহার তুলনা উনবিংশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বিরল ছিল।'[১] ভূমিকর জমির উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী হইত। উৎপাদিত ফসলের ১/২ অংশ, ১/৩, ১/৪, ১/৫ অথবা ১/৬ অংশ অনুপাতে ধার্য হইত। গম, বার্লি, মদ, ফলের বাগান, আখ, তুলা, ফলমূল ইত্যাদির উপর কর নির্ধারিত হইত। ওশর, ভূমির খাজনা আবার অনেক কম ছিল। ইহা ১/১০, ১/২০ হইতে ১/২ অংশতে নির্ধারিত ছিল।

---

১. McCable—The Splendour of Moorish Spain P—62-63
Sm Imamuddin—Economic History of Spain P—374

জাকাত

কাহারো নিকট ৫২-১/২ তোলা রৌপ্য অথবা ৭ ভরি সোনা উদ্বৃত্ত থাকিলে তাহার উপর জাকাত নির্ধারিত হইত। গৃহপালিত পশু ও ফসলের উপর জাকাত আদায় করা হইত। আদায়কৃত জাকাত রাজস্বের এক বিরাট অংশ ছিল। খলিফা আবদুর রহমানের (৩য়) এক অকৃত্রিম বন্ধু ইবনে সেলিম একদা ১১০,০০০ দীনার জাকাত প্রদান করেন।

জিজিয়া

নিরাপত্তা কর হিসাবে ইহা অমুসলিমদের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইত। সামর্থ অনুযায়ী এই করের হার ধার্য হইত বৎসরে ধনীদের ৪৮, মধ্যবিত্তদের ২৪ এবং সক্ষম শ্রমিকদের ১২ দিরহাম জিজিয়া দিতে হইত।

ব্যয়ের খতিয়ান

যুদ্ধের খরচ, সামরিক বেসামরিক কর্মচারীদের বেতন, সরকারী ভবন এবং জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও সংস্কার, যুদ্ধবন্দী মুক্তি, দরিদ্র ও এতিমদের লালন ইত্যাদি খাতে অর্থ ব্যয় হইত।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার দ্বারা আমরা এই কথা সহজে উপলব্ধি করিতে পারি যে, স্পেনে উমাইয়া শাসনকালে অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই সন্তোষজনক ছিল। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য যোগাযোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে, উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। জনগণ সুলভে স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে নিজেদের প্রয়োজন মিটাইয়া দৈহিক, নৈতিক ও মানসিক উৎকর্ষসাধন করে শুধু শাসকশ্রেণী স্বাচ্ছন্দে কালযাপন করেন নাই, সাধারণজনও সুখে দিনযাপন করিয়াছে। ঐতিহাসিক ডজি তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে এই কথা স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন। আল-মাককারী এবং ইবনে ইজাহারীও তাহাদের নিজ নিজ গ্রন্থে জনকল্যাণের ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে উমাইয়া আমির ও খলিফাদের আমলে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণের একটি বর্ণনা প্রদত্ত হইল :

আমির বা খলিফাদের নাম ও সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ

(১)	*আবদুর রহমান (১ম)*	*৩০০০০*	*দীনার*
(২)	*হিশাম (১ম)*	*৪৫০০০*	”
(৩)	*হাকাম (১ম)*	*৭০০০০০*	”
(৪)	*আবদুর রহমান (২য়)*	*১০০০০০০*	”
(৫)	*মুহাম্মদ (১ম)*	*৩০০০০০*	”
(৬)	*আবদুর রহমান (৩য়)*	*২০০০০০০০*	”
(৭)	*হাকাম (২য়)*	*৪০০০০০০০*	”

বিংশ অধ্যায়

মনীষা জগতে আন্দালুসিয়া

[সার সংক্ষেপ ঃ সূচনা ❑ মনীষা জগতে আন্দালুসিয়া ।]

৭১১ সাল থেকে ১৪৯২ সাল পর্যন্ত মুসলমানদের স্পেন শাসন গোটা ইউরোপে এক বিস্ময়কর শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতার দিগন্ত উন্মোচন করে। এমন এক সময় মুসলমানেরা স্পেনে যায় যখন সভ্যতার পরিবর্তে অজ্ঞতা আর শিক্ষার পরিবর্তে অশিক্ষা, কুসংস্কার সমাজ জীবনকে কলুষিত করে রেখেছিল। একথা বিংশ শতকের গবেষকের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল যে, মুসলিম স্পেন ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, স্থাপত্য, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল। তা গোটা ইউরোপের জন্য রেনেসাঁর খোরাক ছিল। প্রতিটি মনীষী এটা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন যে, মুসলিম স্পেন শিক্ষা সভ্যতার যে দ্বীপমালা জ্বেলেছিলেন তার তুলনা না ছিল ফ্রান্স ও জার্মানীতে না ছিল ইতালীতে। ফলে মুসলিম স্পেনের সভ্যতার স্রোত পীরেনীজ পেরিয়ে গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। যে গ্রন্থরাজি আরবীতে ৭ শত বছর ধরে কর্দোবা, সেভিল, মালাগা, তলেদো, গ্রানাদাতে লিখিত পঠিত হয়ে চিন্তার জগতকে আলোকিত করেছিল তাই ল্যাটিন বা স্পেনীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে ইউরোপবাসীকে চমৎকৃত করে।

আরব বা অনারব মুসলমানেরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কঠোর সাধনায় ভাষায়, কাব্যে, সাহিত্যে, ইতিহাস, ধর্মীয় তত্ত্বে, দর্শনে, জ্যোর্তিবিজ্ঞানে, ভূগোলে, চিকিৎসায়, স্থাপত্যে ভ্রমণ ও অংক শাস্ত্রে, রসায়ন ও পদার্থে, উদ্ভিদ বা ভেষজ বিদ্যায় যে অবদান মধ্যযুগে রাখে তা গোটা বিশ্ববাসীকে বিস্ময়ে হতবাক করে।

প্রথমতঃ ধর্মতত্ত্বে মুসলমানেরা শিক্ষা গ্রহণ ও বিস্তারে সর্বাপেক্ষা বেশি উৎসাহ প্রদর্শন করে। কুরআনুল করীম যেহেতু মুসলিম জীবনদর্শনের উৎস, সেহেতু তা পঠন, ব্যাখ্যা প্রদান ও অনুশীলন এবং গবেষণায় অর্থ শ্রম ও সময় নিয়োজিত করার কাজে বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শন করে।

কুরআনুল করীম কণ্ঠস্থ করার কাজে যারা থাকেন তাদেরকে হাফেজ বলা হয়। হাফেজদের অন্তরে বা হৃদয়ে কুরআন হেফাজতের কাজ প্রতিযুগে অব্যাহত থাকে এবং কুরআনকে বুঝবার জন্য এর অনুবাদ এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তফসীরের কাজটিও

ইসলামের প্রথম শতক থেকে টলতে থাকে। স্পেনীয় মুসলমানেরা এ মহৎ কাজেও পিছিয়ে ছিলেন না। তফসীর কারকদের মধ্যে যিনি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য তিনি হলেন আল বাকী বিন মাজমাল (মৃ. ৮৮৬)। তাঁর তফসীরখানি আল্লামা তাবারীর তফসীর অপেক্ষা স্পেনে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই সুবৃহৎ তফসীরখানি গ্রানাদার আবু মুহাম্মদ বিন আতিয়াহ (মৃ.১২৪৭) সংক্ষিপ্ত করেন এবং তাও প্রসিদ্ধি অর্জন করে। তবে কর্দোবার মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন ফারাহ্ আল কুরতুবী (মৃ. ১২৭৩) তফসীরকারকদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন।

শুদ্ধ ও সুমিষ্টকণ্ঠে কুরআন পঠন বিদ্যারও বিস্তার ঘটে আন্দালুসিয়ায়। উল্লেখযোগ্য ক্বারীদের মধ্যে দেনিয়ার শাসক আল মুজাহিদ (মৃ. ১০৪৪) অন্যতম। তবে ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের মতে, সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ সুন্দর কুরআন পাঠকারী হলেন আবু আমর আল দানী (মৃ. ১০৫৩)। তিনি কুরআনের উপর গবেষণামূলক অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তবে কুরআনের সপ্ত পাঠরীতি সম্বন্ধে তার অনবদ্য সৃষ্টি কিতাব আল তাইসীর। তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী হলেন জাতভীয়ার আবুল কাসিম বিন ফিররুহ (মৃ. ১১৯৪)।

কুরআনুল করীম চর্চার পরেই হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন ও গবেষণায় স্পেনীয় মুহাদ্দিসবৃন্দ গভীর সাধনার স্বাক্ষর রেখেছেন। এঁদের সংখ্যা অনেক। তবে মুহাম্মদ বিন অযযাহ (মৃ. ৯০০), কাসিম বিন আসবাগ (মৃ. ৯৫১), ইবনে ফুতাইস (মৃ. ১০১১) আবু আবদুল্লাহ আল জাওলানী (মৃ. ১০৭৫) এবং ইউসুফ ইবনে আবদ-আল বার (মৃ. ১০৭০) উল্লেখযোগ্য। হাদীসের ব্যাখ্যা দান ক্ষেত্রে স্পেনে ইমাম মালিক বিন আনাসের (রহঃ) (মৃ. ৯৭৫) প্রভাব ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি। আমির হিশামের (১ম) (৭৮৮-৭৯৬) রাজত্ব কালে প্রখ্যাত ধর্মশাস্ত্রবিদ বার্বার ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়া (মৃ. ৮৪৭) ইমাম মালিকের (রহঃ) নিকট মদিনাতে এসে শিক্ষা গ্রহণ করেন। স্পেনে প্রত্যাবর্তন করে তদ্বীয় শিক্ষকের আদর্শ প্রচার ও প্রসারে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রভাব আল হাকাম (১ম) (৭৯৬-৮২২) আব্দুর রহমান (২য়) (৮২২-৫২) পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই সময়ে এবং এর পরবর্তীকালে বহু ক্ষণজন্মা পুরুষ ধর্মীয় শিক্ষায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করে স্পেনের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন। এদের মধ্যে ইবনে হাবীব (মৃ. ৮৫৩), উতবী (মৃ. ৮৬৮), আল কুতিয়াহ (মৃ. ৯৭৭), ইবনে আফিফ (মৃ. ১০২৯) আবুল ওয়ালিদ আল বাকী (মৃ. ১০৮১), আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ বিন রুশদ (১১২৬-১১৯৮) প্রমুখ অন্যতম।

ধর্মীয় ব্যাখ্যা দাতা গবেষণায় দর্শনতত্ত্বের নূতন তথ্যের আবিষ্কারক ইবনে মাসাররাহ (মৃ. ৯৩১) প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি বহুপুস্তক রচনা করেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে নিজকে অন্তরীন রাখেন কর্দোবার অদূরে এক পর্বত গুহায়। একাধারে শাস্ত্রবিদ ও দার্শনিক হিসাবে চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। বাকীবিন মাজলাদও ছিলেন একজন ফকিহ এবং হাদিস বিশারদ তিনি ইমাম আল শাফী (রহঃ) ভক্ত ছিলেন বিধায় তার প্রতিভা মালেকী মতবাদের প্রাধান্যে মূল্যায়ন হয়নি। মুসলিম বিশ্বে তার রচিত কিতাবগুলি যথেষ্ট সমাদৃত হয়।

ধর্মীয় ভিন্ন মতবাদ প্রকাশের জন্য কুরআন, হাদীস, এবং দর্শনে বিপুল অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বের নিছক গোড়ামী ও তকলীদের জন্য-যাঁরা নির্যাতিত

হয়েছেন এবং নিগৃহীত হওয়ার পরও যাঁদের মনীষা খ্যাতির চূড়ায় তাদের মধ্যে ইমাম ইবনে হাযম (৯৯৪-১০৬৪), ইবনে রুশদ, ইবনে মায়মুন (যদিও তিনি আরব বংশোদ্ভূত ইহুদী) অন্যতম।

স্পেনে মালেকী মাজহাবের অন্ধ অনুসরণের জন্য খোলামন নিয়ে যাঁরা কুরআন ও হাদীসের চর্চা করেছেন তাঁরাও যেমন বাধা গ্রস্থ হয়েছেন তেমনি যাঁরা মুতাজিলা বা স্বাধীন চিন্তার অধিকারী হয়ে কিংবা ভাববাদের প্রবক্তা রূপে আবির্ভূত হয়ে বা দর্শনের জটিলতায় কেবল চিন্তার খোরাক জুগিয়ে জনমনে হাজির হয়েছেন তারাও সমানভাবে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছেন। প্রাচ্যে ইমাম গাজ্জালীকে (মৃ. ১১১১) হুজ্জাতুল ইসলামে ভূষিত করলেও স্পেনে তার কিতাব নিষিদ্ধ করার ঘটনাও বিরল নয়। তবে বেশ কিছু জনমানস স্পেনে সর্বকালে বিরাজমান ছিলেন যাঁরা প্রকৃতভাবে পক্ষপাত মূলক ধারণার বশবর্তী না হয়ে কেবল মাত্র কুরআন আর সহীহ হাদীসের অনুসরণের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক জেহাদ চালিয়ে গেছেন। তাঁরা যেমন ইমাম মালিকের (রহঃ) মুয়াত্তা কদর করেছেন তেমনি ইমাম বুখারী (রহঃ) (মৃ. ৮৯২) ইমাম নাসাঈ (রহঃ) (মৃ. ৯১৫), ইমাম ইবনে মাজাহ (রহঃ) (মৃ.-৮৮৬) প্রমুখ সিয়াহ সিত্তাহ সংকলকদের সাধনালব্ধ অমূল্য-গ্রন্থ রাজিকে গভীর শ্রদ্ধায় গ্রহণ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে স্পেনে চিন্তার জগতে ধর্মীয়জ্ঞানে অর্থাৎ কুরআন আর হাদিসে যিনি অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় কলম ধরেছেন, কিতাব রচনা করেছেন, তলোয়ার ধরেছেন জনকল্যাণমুখী সিয়াসাত প্রতিষ্ঠায় আবার কারবরণও করেছেন বহুবার হককে বাতিলের মোকাবেলায় সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠায় তাঁর সম্বন্ধে দুটি কথা বলা প্রয়োজন। এই বহুমুখী প্রতিভাধর মনীষী হলেন আবু মুহাম্মদ আলী ইবনে আহমদ ইবনে সাঈদ যিনি ইবনে হাযম নামেই সমাধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ৩৮৪ হি. তে শেষ রামাযানে জন্ম গ্রহণ করেন কর্দোবাতে (৭ই নভেম্বর ৯৯৪ খৃ. আর তাঁর মৃত্যু হয় ১০৬৪ হি. তে)। জীবনের চলার পথে সব বাধা উত্তরণ করে লেখা পড়া ও জ্ঞানার্জনে তার প্রবল আগ্রহই সর্বদা বিজয়ী হয়ে তিনি জ্ঞানীদের তালিকায় স্থান নিয়েছেন। রাষ্ট্র বিপ্লব তখন জোরালো। গৃহযুদ্ধ চলছে। কারণ এই সময়টিতে স্পেনে উমাইয়াদের পতন শুরু হয়েছে। খলিফা হিশাম (২য়) হতে উমাইয়া শাসকদের দুর্বলতা ও ক্ষমতা হ্রাস পায়। হাযিবদের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায় এবং তাও হাযিব আল মনসূর পর্যন্ত। গৃহযুদ্ধে তিনিও জড়িয়ে পড়েন এবং কয়েকবার কারাবরণও করেন। তবে জীবনের জটিলতা চলার পথের বন্ধুরতা তাকে জ্ঞান অনুশীলনীর পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। শাস্ত্রবিদ, মুহাদ্দিস, ফকিহ দার্শনিক হিসাবেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তার প্রথম গ্রন্থ যা ঐতিহাসিক ডজি সাহেব উল্লেখ করেছেন তা হলো—"তাওকা আল হামামাঃ ফী আল উলফা. ওয়া আল ওয়াফে"। এই গ্রন্থখানি কবিত্ব প্রতিভার এক চিত্তাকর্ষক উপমা। অতপর আল মাককারী যে গ্রন্থের কথা বলেছেন তা হোল 'রিসালা ফী কাযাল আল আন্দালুস'। তিনি ইতিহাস, হাদীস, ধর্মতত্ত্ব ও ফকিহের বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তার কিতাব 'আল মুহাল্লা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে কিতাবখানি তাঁকে বিশেষভাবে বিশ্বে স্মরণ করছে তা হোল কিতাব 'আল ফাসল ফী আল মিলাল ওয়া আল আহওয়া ওয়া আল নিহাল'। কুরআন আর বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে ফির্কাবন্দীর মারাত্মক পরিণতি এবং

বিভিন্ন মতের ও পথের প্রসারতা এই গ্রন্থে সবিস্তারে উদ্ধৃত। তার বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর স্বরূপ তিনি ৪০০ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এদের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০,০০০ বলে উল্লেখিত। (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পৃ. ১৭০ ১ম খণ্ড) তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও সাহসী মতের প্রবক্তা। অর্থাৎ যুক্তিতর্কে তিনি জয়ী হতেন তবে পরাজিতকেও সুবিচার করতেন। বলা হয় হাজ্জাজ বিন ইউসুফের তীক্ষ্ণ তরবারীর ন্যায় যুক্তিতর্কে তার কলম ছিল ধারাল। তিনি ইসলাম জগতে এত বড় পণ্ডিত ছিলেন যে মুয়াহহিদ খলিফা আল মনসুর তার সমাধিস্থলে গিয়ে এ মন্তব্য করেন যে, "সংকটে পড়লে সকল পণ্ডিতকেই ইবনে হাযমের দ্বারস্থ হতে হয়।" আর একজন পণ্ডিত প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে খুবই খ্যাতিমান—তিনি হলেন আবু আল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে রুশদ যিনি ইউরোপে Averroes নামে পরিচিত। তাঁর জন্ম কর্দোবাতে হি. ৫২০-১১২৬ সালে। তার পূর্বপুরুষও বিদ্বান ছিলেন। পিতামহ ছিলেন কর্দোবার কাজী এবং বহুগ্রন্থ প্রণেতা। তাকে বলা হয় স্পেনের শ্রেষ্ঠতম আরব দার্শনিক। তবে চিকিৎসা, অংক ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে তার মনীষাও অতুলনীয়। তার দর্শন পাশ্চাত্যের প্রভাবযুক্ত। বিশেষভাবে এরিস্টোটলের দার্শনিক মতবাদ যেন তার বিশেষ পছন্দনীয় ছিল। এই প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকের বহু কিতাব অনুবাদ ও তার ভাষ্য তিনি লিখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কিতাবের মধ্যে তাহাফাত আল তাহাফাত। মূলতঃ এই কিতাবটি ইমাম আল গাজ্জালীর রচিত তাহাফাত আল ফালাসিফারই প্রত্যুত্তর। দর্শনে গ্রীক পণ্ডিত এরিস্টোটলের বহুগ্রন্থের ভাষ্য এবং বিশদ পর্যালোচনামূলক কিতাব রচনার ফলে পাশ্চাত্য জগতে তার খ্যাতি মশহুর। ধর্ম ও দর্শনের সম্পর্কযুক্ত তার রচিত কিতাব ফাসল আল মাকাল এবং ফালয আল মানাকিজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর কিতাব 'আলসিয়াসা' Republic-এর ভাষ্য। আল ফারাবীর এবং ইবনে সীনার অভিমত সম্পর্কেও তিনি নিখুঁত আলোচনা রেখেছেন। ইবনে তুমারতের কিতাব আল আকিদার পাদটীকাও তিনি লিখেছেন। ফিকাহ শাস্ত্রে তাঁর "কিতাব বিদায়া আল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াঃ আল মুকতাছিদ" উল্লেখযোগ্য। জ্যোর্তিবিদ্যা এবং চিকিৎসা শাস্ত্রেও তার লেখনী বিদ্যমান 'কুল্লীয়াত' চিকিৎসা বিজ্ঞানও তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ধর্মীয় মতবাদ যা আল কুরআন ও সহী হাদীস সম্মত সে বিষয়ে তিনি অনেক সময় দার্শনিক ও নিগূঢ় তত্ত্ব ও অর্থ প্রয়োগ করার প্রবণতা দেখিয়েছেন। ফলে আকিদা ও বিশ্বাসে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য তাকে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এটা মুসলমানদের মনে স্বাভাবিক ক্ষত সৃষ্টি করলেও খ্রিস্টান ও ইহুদীগণ তার লেখনীকে লুফে নিয়েছেন। পাশ্চাত্যে তাই তিনি রুশদ অপেক্ষা Averroes নামে সমধিক খ্যাত। তাঁর গ্রন্থাবলী হিব্রু, ল্যাটিন, জার্মান, স্পেনীয়, ইতালীয় ও আরবী ভাষায় বিশ্বের নামকরা গ্রন্থাগারে রক্ষিত। ১১৯৮ সালের ১৯ই ডিসেম্বর মরক্কোতে তিনি ইনতিকাল করেন।

ইবনে আরাবী (জন্ম, ১১৬৫) মুরসিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুফী হিসাবে পরিচিত। বাতিনী চিন্তায় এবং সর্বেশ্বরবাদী মতবাদের কারণে তিনি জিন্দিক বলে নিন্দিত হন এবং মিশরে তাকে হত্যার জন্যও আন্দোলন হয়। তিনি বাগদাদ, দামেস্ক, মক্কা-মদিনা, মৌসূল, আলেপ্পো ও এশিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি আল ফুতুহ্যাত আল মক্কীয়া নামক ৫৬০ অধ্যায়ে বিভক্ত বিশাল এক গ্রন্থ রচনা করেন। তার রচিত দেড়

শত বই এখনও বিদ্যমান যা তার রচিত বই এর অর্ধেক। তবে আকাইদ বা বিশ্বাসের কারণে তাকে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। তথাপিও তার সমর্থক বেশ ছিল। তিনি ১২৪০ সালে মারা যান। ইতিহাসে কেবল রাজা বাদশাদের কাহিনীমূলক না করে শাসনের ফলাফল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে এর প্রভাবকে বিজ্ঞান ভিত্তিক নির্ণয় কল্পে যে প্রখ্যাত মনীষী কলম ধরেন তিনি হলেন বিশ্ব নন্দিত ঐতিহাসিক ও সমাজ এবং রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ওয়ালী আল দীন আবু য়াফ্দ আবদুর রহমান ইবনে খালদুন নামে পরিচিত। খালিদ খালদুন নামে তার পূর্বপুরুষ নবম শতকে আন্দালুসে এসে বসবাস করতে থাকেন। তার বংশধরগণ কেউ কারমোনায়, কেউ সেভিলে বসবাস করতে থাকেন। তবে গোলযোগপূর্ণ দিনগুলোতে তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না। মুত্তাহিদগণের পতনের পর খ্রিস্টানগণ ক্রমাগতভাবে স্পেনের শাসন কবজা করতে থাকেন। এসময় খালদুন বংশ সিউটায় চলে যান। ইবনে তিউনিসে বসবাস করেন। তারই তিন পুত্র মুহাম্মদ, আব্দুর রহমান, এবং ইয়াহয়া। শেষের এই দুজনই প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রূপে খ্যাত। তবে আব্দুর রহমানই সমধিক বিখ্যাত। তিনি ৭৩২ হি. তে ২৫ শে রামাযান ১৬ই মার্চ ১৪০৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্য বয়সে কুরআন হেফজ সমাপ্ত করে অতি উৎসাহে এবং কঠিন অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে ব্যাকরণ, ভাষা, হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জনে ব্রতী হন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ধর্ম শাস্ত্র, ভাষা, অলংকার শাস্ত্র এবং কুরআন হাদীসে যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করলে মাত্র ২১ বৎসর বয়সে তিউনিস বাদশাহের সচিবের পদমর্যাদা লাভ করেন। তবে সচিবের পদে কাজ করলেও তার জ্ঞান সাধনা অব্যাহত ভাবে চলে। রাজনৈতিক উত্থান পতন তার জীবনের গতিকে নানাভাবে উল্টে পাল্টে দেয়। বহুবার পদ ত্যাগ করে বিভিন্ন স্থানে গমন করেছেন, কারাবরণ করেছেন—যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। তবে জ্ঞানের অনুশীলনী কোন সময় থেমে থাকেনি। ২৮ বছর বয়সে তিনি কাজীর পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। তারপর ১৩৬২-৬৩ সালে তিনি নানা প্রতিকূলতার সাথে যুদ্ধ করে পূর্ব পুরুষের নিবাস স্পেনের গ্রানাদায় চলে যান। কিন্তু এখানেও তার জীবন নিরাপদে কাটেনি। বহুবার বহু চাকুরী গ্রহণ আর ত্যাগ চলতেই থাকে। গ্রানাদা হতে ফেজে চলে যান এবং সেখানেও শাসকের ভাগ্য বিড়ম্বনায় তার ভাগ্যও বিড়ম্বিত হয়। তিনি উত্তর আফ্রিকা এবং আন্দালুসিয়ার রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। ফলে তার জীবনের এক বিরাট চলমান অভিজ্ঞতা তার লেখনীকে সমৃদ্ধ করে। ৪৫ বছর বয়সে তিনি তার জীবনের সব থেকে কীর্তিবহুল গ্রন্থটি রচনায় হাত দেন। গ্রন্থটি বিশ্ববিখ্যাত এবং সাতখণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থটির নাম—

কিতাব আল ইবার ওয়া দিওয়ান আল মুবতাদা ওয়াল খবর ফী আইয়্যাম আল আরাব ওয়াল আজাম ওয়াল বারবার ওয়া মান আসরাহুম মিন যাউভি সুলতান আল আকবর। এই সুবিশাল তথ্যপূর্ণ গ্রন্থটি তিনটি পৃথক বিষয়ে বিভক্ত।

প্রথমত

সমাজ তার প্রকৃতিগত দিক-সার্বভৌম ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, উপজীবীকা, পেশা বিজ্ঞান এবং এসব তত্ত্বের যুক্তি সম্মত কারণ বিশ্লেষণ এটাই সাধারণ মুকাদিদমা নামে অভিহিত।

দ্বিতীয়ত

আরবদের ইতিহাস সৃষ্টির শুরু থেকে গ্রন্থকারের সময় পর্যন্ত। সমকালীন জাতি যেমন পারথিয়ান, সিরিয়ান, পারশিয়ান, ইহুদী, কপট, গ্রীক, রোমান ও তুর্কী এবং ফ্রাঙ্কদের ইতিহাস।

তৃতীয়ত

বার্বারদের নৃতত্ত্বের ইতিহাস থেকে তাদের চমকপ্রদ জীবন, রাজ্যজয় ও রাজত্ব এবং স্পেন ও উত্তর আফ্রিকায় তাদের কীর্তি। মুকাদিদমা দুইখণ্ড ব্যতীত আর যে পাঁচখণ্ড কিতাব তার বিষয়বস্তু হোল: দ্বিতীয় খণ্ডের উপসংযোজনী রূপে ইসলাম। হজরত মোহাম্মদ (স.) চার খলিফার ইতিহাস লেখা। ৩য় খণ্ডে উমাইয়া এবং আব্বাসীয়দের বিস্তারিত ইতিহাস। ৪র্থ খণ্ডে ফাতেমীয়, কারমাতিয় এবং স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস বিজয় থেকে শুরু করে বনুনসর বংশ পর্যন্ত। আর বনু বুয়াইয়া ও বনু সবুক্তকীন। ৫ খণ্ডে সেলজুক, ক্রুসেড, মিশরে মামলুকদের ৮ম শতক পর্যন্ত এবং তারপর বারবারদের বিস্তারিত ইতিহাস যা উত্তর আফ্রিকার বহু ঘটনায় সমৃদ্ধ। এছাড়াও তিনি তার চরিত্র আত্মজীবনী ও শত পৃষ্ঠায় লিখেছেন 'তারিব' নামে প্রথম অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন— রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে তার লেখনী উল্লেখযোগ্য। প্রাচ্যে মুসলিম কর্তৃক বিজিত হবার পর শাসন মুদ্রা ও ভাষা প্রাথমিকভাবে বহুলাংশে পূর্ববৎ বহাল রাখা হয়। যেমনটি মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুতে করেছিলেন। কিন্তু স্পেন বিজয়ে তা হয়নি। প্রাথমিকভাবেই সাংস্কৃতিক পট পরিবর্তনে এক বিপ্লব শুরু করা হয়। রাজকার্যের আদেশনামা, মুদ্রা, বক্তৃতা, সবকিছুই স্পেনীয় ভাষার পরিবর্তে বিজয়ী আরবদের আরবী ভাষা ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ শুরু থেকেই আরবীয়করণ নীতি চলতে থাকে। শাসকদের ভাষা উন্নত সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সভ্যতায় সম্মানিত হবার প্রত্যয়ে স্পেনীয়রা অনেকে বিজয়ীদের ভাষা, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, কর্মপদ্ধতি এবং এমনকি ধর্ম পর্যন্ত গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করেননি। এদেরকে নও-মুসলিম বা মুয়াল্লাদুন বলা হোত। এদের সংখ্যাও কালক্রমে যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। আবার যারা স্বধর্ম অর্থাৎ পৈতৃক ধর্ম বজায় রেখে কেবলমাত্র মুসলমানদের ভাষা, আচার ব্যবহার পোষাক পরিচ্ছদ এবং উন্নত রুচি ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করে তাদেরকে মুজারব বলা হয়। এদের সংখ্যাও অনেক। উত্তর আফ্রিকা থেকে সিউটা থেকে, ইউরোপ থেকে, আবার প্রাচ্যের অনেক দেশ থেকে জনমানুষ শিক্ষা, সভ্যতা ও উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় ভিড় জমাত স্পেনে। ফলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের একটা সম্মিলন কেন্দ্র হিসাবে কর্দোবা পরিচিত হয়ে উঠে। সংস্কৃতির চর্চা ও লালন ক্ষেত্ররূপে চিহ্নিত হয়। শাসকবর্গ ও তাদের প্রভাব এবং রুচি অনুযায়ী সভ্যতার চারা রোপণ করতে থাকেন। হিশাম (১ম) ধার্মিক ছিলেন বিধায় তারই প্রবল আগ্রহে মদিনা হতে ইমাম মালিক বিন আনাস (রহ.) এর নিকট হতে ইয়াহিয়া বিন ইয়াহয়া আল লাইসী শিক্ষা গ্রহণ করে স্পেনে সেই বাতি জ্বালিয়ে দেন। আবার আব্দুর রহমান (২য়) এর রুচি ছিল অন্য। তিনি তার দরবারকে কবি সাহিত্যিক গাল্পিক ও গায়কদেরকে নিয়ে গোলজার

করে রাখতেন। প্রাচ্যে থেকে আবুল হাসান ওরফে নাফি আল জিরাব (মৃ. ৮৫৭) চলে এলেন কর্দোবাতে। রুচি, ব্যবহার পোষাক এমন কি খাবার ঘরটি পর্যন্ত সাজিয়ে ফেললেন অপরূপ সজ্জায়। তার সঙ্গীত ছিল সেরা। বাদ্যযন্ত্রের তিনি নানা ঢঙে সেতার পঞ্চতারে সংযোজনের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। আমির আবদুর রহমানের (২য়) সময়ে কাব্য ও সাহিত্যের আসরও জমজমাট ছিল। কবি ইয়াহয়া আল গাজাল এবং আব্বাস বিন ফিরনাসের নাম এ সময়ে স্মরণীয়। তবে আমীর স্বয়ং কাব্যমোদী ছিলেন যেমনটি ছিলেন তার পূর্বপুরুষ। প্রথম আব্দুর রহমান রচিত কবিতাও খুবই নামকরা। ঠিক দামেস্ক উমাইয়াদের আমলের কবি জরীর ফারাজদাক বা আল আখতালের কাব্য বিষয় সুদূর স্পেনেও নূতন ভাবে দেখা দেয়। তার একটা কবিতা ইংরজিতে নিম্নে প্রদত্ত হোল :

Oh palm, Solitary one like mysely, grow
In a land where you are distant from your Kindered,
You weep, while your leaves in articulately whisper,
Not being human in species, not able to speak.

অনুরূপভাবে (১ম) হাকামও বেশ কিছু কবিতা লেখেন। প্রাগুক্ত জিরাবও নামকরা কবি ছিলেন। রাজনীতি, পদার্থ, ভূগোল আর জ্যোর্তিবিদ্যায়ও তার দখল ছিল। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ইবনে হাযিবের (মৃ. ৮৫৩) নাম উল্লেখযোগ্য। যে সময়ে ওমর বিন হাফসুন কর্দোবার আমিরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক অভিযান পরিচালনা করছিল ঠিক সেই সময়ে আর একজন কবি অত্যন্ত বীরত্ব ব্যঞ্জক কবিতা রচনা করে মানুষের অনুপ্রেরণার খোরাক যোগান! তিনি হলেন সাইদ বিন জুদী (মৃ. ৮৯৭)।

ইবনে হানি আল আন্দালুসী (৯৩২-৯৭৩) সাহিত্য কর্মে খ্যাতিমান। সেভিলে তার বাধন হারা জীবন কাটে। তারপর সেখান হতে বিতাড়িত হয়ে চলে যান উত্তর আফ্রিকার ফাতেমীয়দের নিকট। ফাতেমীয় খলিফা আল মুইজের জন্য তার বিখ্যাত কাসিদা রচনা করেন। ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকানের মূল্যায়নে ইবনে হানি প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যের অতুল্য কবিরূপে খ্যাত। ইবনে জায়দুন (১০০৩-৭০), ইবনে আম্মার (১০৩১-১০৮৬), আল মুতামিদ (১০৪০-১০৯১), আবু ইসাহাক আল ইলবিরি, আল মুতাসিম (১০৫১-১০৯১) উম্মুল কিয়াম, ইবনে বাজ্জাহ (মৃ. ১১২৮), ইবনে আবদুন (মৃ. ১১৩৪), আবু খালত (১০৬৮-১১৩৪), ইবনে খাইদ (মৃ. ১১৬৪), হাফসা (মৃ. ১১৯০), আবু হাইয়ান (১২৫৭-১৩৪৪), ইবনুল খাতিব (১৩৪১-১৩৭৪) প্রমুখ সকলেই ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাধর কবি ও সাহিত্যিক। কেউ আমির বা খলিফা হয়েও কাব্যাঙ্গনে বিচরণ করেছেন অপূর্ব প্রতিভা নিয়ে। কবিদের পৃষ্ঠপোষকতায় আদৌ ভাটা পড়েনি আন্দালুসিয়ায়।

স্পেনে মুসলিম সাহিত্য চর্চায় যিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার বিস্ময়কর সৃষ্টি জগৎবাসীকে "আল ইফদুল ফরিদ" বা The unique Necklec বা অপূর্ব কণ্ঠহার নামে উপহার দিয়েছেন তিনিই ইবনে আবদ রাব্বিহী (মৃ. ৯৪০)। গ্রন্থ রচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে উভয়রীতি তার কলমে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন এ অমূল্য গ্রন্থটিতে।

রাজনীতি, সরকার পদ্ধতি, শাসক শাসিতের সম্পর্ক, সামরিক বাহিনীর ক্রিয়াকলাপ, অনুপম বক্তৃতা, শিক্ষা পদ্ধতি, বিষয় ও নীতি, মনীষীদের কীর্তিবহুল জীবনী, আচার ব্যবহার, বন্ধুত্ব, ধর্মীয় সম্প্রদায়, ভাষা রচনাশৈলী, নবীদের উক্তি, প্রবাদ বাক্য, আরবদের বংশ তালিকা, ধর্মীয় অনুশাসন, মৃত্যু, জানাজা, বিখ্যাত বক্তৃতা, সচিবদের পদ, স্পেনীয় শাসক ও খলিফাদের ইতিহাস, কবিতার সুখ্যাতি, গায়কদের গীতিমালা, নারীদের দোষগুণ, ভূগোল, চিকিৎসা, খাদ্য, পানীয়, রূপকথা, গল্প উপকথা কাহিনী ইত্যাদি বিষয়ের উপর পঁচিশটি মূল্যবান কিতাব লিখেছেন ভিন্ন ভিন্ন মণিমুক্তার নামকরণে।

সাহিত্যের জগতে আর একজন পণ্ডিত হলেন আবু আলী আলকুলী (৯০১-৬৭)। আরবী কবিতায় তার অনন্য সাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ছিলেন জ্ঞান পিপাসু খলিফা হাকাম (২য়) এর গৃহ শিক্ষক। তাঁর লিখিত কিতাবগুলি ব্যাকরণ ও হাদিস বিষয়ক এবং ভাষা, প্রবাদ ও কাহিনী সম্বলিত। তবে কিতাব আল আমালী সর্বশ্রেষ্ঠ। স্পেনীয় চিন্তার জগতে তিনি বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করেন। তিনি প্রতিষ্ঠানরূপে আদবের ক্ষেত্রে তার ছাত্র মণ্ডলীর মধ্যে চিরস্মরণীয়। ভূগোলবিদ আল বাকরী (মৃ. ১০৯৪) তার Book of pesalo এবং বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যাকরণবিদ, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ইবনে আবি আল খিসাল (১০৭২-১১৪২), তার রচিত আদব আবু আলী আল কুলার ভূয়সী প্রশংসা করেন। কবি ইবনে আল সীদ (১০৫২-১১২৭) মুহাদ্দিস ইউসুফ ইবনে আবদ আল বার, (মৃ. ১০৭১) এবং প্রথিত কথা লেখক আল মাওয়াইনী (মৃ. ১১৬৮) স্পেনের যশস্বী মনীষী। প্রত্যেকেই চিন্তার জগতে নূতন দিগন্ত উন্মোচন করেন।

আবু বকর আল তরতুসী (১০৫৯-১১৩০) তার শ্রেষ্ঠকিতাব "সিরাজ আল মূলক"। শাসকের কি কি গুণ থাকা উচিত। পারসিয়ান, গ্রীক, হিন্দুস্থানী এবং অন্যান্য রাজা বাদশাহদের সম্বন্ধে বহুতত্ত্ব বিস্ময়কর ঘটনাপঞ্জী, যুদ্ধ, সৈন্য, ন্যায়বিচার প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এ গ্রন্থটি রচিত। দশম শতকে ইবনে মুগিস খলিফা হাকাম (২য়) কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে প্রাচ্য ও আন্দালুসিয়ায় কবিদের সম্পর্কে একটি উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। ইবনে মুগিসের সমকালীন ইবনে ফারাজ আল গায়ানী (মৃ. ৯৭০)। তিনি "কিতাব আল হাদাইক" Book of Garden রচনা করেন ইবনে দাউদ আল ইস্পাহানীর কিতাব 'আজ জাহরায়' আনুপ্রাণিত হয়ে। 'কিতাব আল হাদাইক' এ দু'শত পংক্তি বিশিষ্ট একটি অধ্যায় ছিল। এমনিভাবে এ দু'শত অধ্যায়ে এ বৃহৎ কাব্য গ্রন্থটি। এটাও খলিফা হাকামের (২য়) নামে উৎসর্গিত। আবুল ওয়ালিদ আল হিমাইরী (১০২৬) 'আল রাদি ফি-ওয়াসক আল রাব্বি' (The wondrous Concerning the description at Spring) স্পেনীয় পণ্ডিতদের নিয়ে তিনি উচ্চ প্রশংসা করেছেন কাব্যছন্দে।

ইবনে বাসাম (১১৪৭) 'আল জাকিরাহ ফি মাহসিন আহল আজ জাজিরাহ' নামে আন্দালুসিয়ার কাব্য জগতে চমকপ্রদ একটি গ্রন্থ উপহার দেন। উপদ্বীপে সুন্দর গুণরাজিতে অমূল্য সম্পদ সে সম্বন্ধে কাব্যটির আলোচ্য বিষয়। গ্রন্থটি তার খ্যাতির চূড়ায় আরোহণ করায়। এটা (১০০৬-৯) সালের মধ্যে সেভিলে বসে রচনা করেন। ফাতাহ ইবনে খাকান এর কালাইদও অত্যন্ত নামকরা গ্রন্থ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ বংশের যুগে এটা রচিত। এ গ্রন্থে

৬৩ জন স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের কথা বিবৃত এবং চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ১ম অধ্যায়ে শাসক ও তাদের পুত্রদের মহৎ গুণরাজি, ২য় অধ্যায়ে উজিরদের কীর্তি, সচিবদের কাব্য এবং ব্যাকরণ, ৩য় অধ্যায়ে বিচারক এবং মনীষীদের কথা, আর ৪র্থ অধ্যায়ে খ্যাতিমান কবি সাহিত্যিকদেরকে নিয়ে লেখা। ইবনে বাসাম ও ইবনে খাকানের ন্যায় তাদেরই নিকটমত উত্তরসূরী সাফওয়ান বিন ইদ্রিস (১১৬৪-১২০১) মুরসিয়াতে এবং আল হিজারী (১১০৬-১১৬৫) মিলভিস ও গ্রানাদায় সাহিত্য গগনে উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে আর্বিভূত হন। আল হিজারী– 'কিতাব আল মুসহিব ফিগারাইব আহল আল মাগরিব' (The Book of the Louaic on one about the wonderful qualitis of the people of Magrib) আল শাকানদী (মৃ. ১২৩১) এর 'রিসালা' অত্যন্ত তথ্যবহুল গ্রন্থ। ইতিহাস ও হাদিস বিষয়ে প্রমাণ পঞ্জীতে সমৃদ্ধ।

চর্তুদশ শতকে যে বিদ্বান ব্যক্তির নাম উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন, গ্রানাদার ইবনুল খাতিব (মৃ. ১৩৭৪) 'লিসান আদদ্বীন' তার উপাধি। তিনি একাধারে রাজনীতিক, কবি, বিদ্বান, আর চিকিৎসা, দর্শন আর আরবী সাহিত্যে তার পদচারণা সকলের কৌতূহলোদ্দীপক। সেই রাজনৈতিক অস্থিরতা আর খ্রিস্টান জগৎ কর্তৃক মুসলিম স্পেনকে গ্রাস করার দুর্যোগময় মুহূর্তে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের উত্তপ্ত চুল্লীতে অবস্থান করেও তিনি রাজনীতিকদের ও সচিবদের ইতিকর্তব্য আর ইতিহাস ও ভ্রমণ কাহিনীর চমকপ্রদ বর্ণনা দিয়ে কিতাব লিখেন। তার অনবদ্য-সৃষ্টি 'আল ইহাতা ফি তারিখ গারনাতা' (গ্রানাদা ইতিহাস বিশ্বকোষ)। এই কিতাবটি স্পেনীয় মুসলিম ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ যা অত্যন্ত মূল্যবান। আর একজন খ্যাতিমান পণ্ডিত যদিও স্পেনীয় নন তবু স্পেনের উপর সপ্তদশ শতকে যা উপহার দেন "নাফ আত তিব-মিন গাসান আল আন্দালুসী আল রাতিব ওয়াযাফির অজিরিহা লিসান আল দ্বীন ইবনে আল খাতিব"—তিনি হলেন আল মাক্কারী (মৃ. ১৬৩১)। তিনি ইবনুল খাতিবের জীবন ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে লিখলেন বিরাট ইতিহাস যা প্রাথমিক স্পেন বিজয়ের ইতিহাস থেকে শুরু করে খ্রিস্টানগণ কর্তৃক স্পেন দখল ও মুসলিম বিতাড়ন পর্যন্ত। তফসীর, হাদীস, সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় ছাড়াও অনেক মনীষী কর্দোবার বিশ্ববিদ্যালয়, সেভিল, সারাগোসা, জায়েন, বাদাজোজ, তলেদো, এলভিরা, আলমেরিয়া, এবং গ্রানাদার শহরকে আলোকিত করে গোটা ইউরোপকে হাতছানি দিয়ে আহ্বান করত জ্ঞানপিপাসুদের। প্রতিটি বিষয়ে লেখাপড়া গবেষণা ও নূতন চিন্তার ক্ষেত্রে উন্মোচিত হতো প্রবল আগ্রহে। নিম্নে আরও কিছু মনীষীদের নাম আলোচনা করা হলো :

ইতিহাস চর্চায় প্রাচ্যের মনীষীরা যেমন উৎকর্ষ প্রদর্শন করেছেন পাশ্চাত্যেও তাদের অবদান অনস্বীকার্য। রাজনৈতিক ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস, আঞ্চলিক ইতিহাস, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও শিল্পকলা স্থাপত্যের ইতিহাস, ধর্ম দর্শন ও বিজ্ঞানের ইতিহাস এবং বিশ্ব ইতিহাস রচনায় আন্দালুসিয়ার ঐতিহাসিকবৃন্দ খুবই উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন। সৃষ্টির প্রথম থেকে লেখকের সময় পর্যন্ত ইতিহাস লেখার যে ধারা প্রাচ্যে বিদ্যমান ছিল তা প্রায় সর্বদা সর্বস্থানে মুসলমানেরা অব্যাহত রেখেছেন। যেমন ইলখানী আমলে গাজানখানের মন্ত্রি ইতিহাসবেত্তা রশিদ উদ্দিন ফজলুল্লাহ জামেউত তাওয়ারিখ এ

ধরনের এক বিশ্বকোষ ইতিহাস রচনা করেন। ঐতিহাসিক তাবারী, মাসুদী, ইবনুল আসীর, বালাজুরী, ইয়াকুবী, যেমন প্রাচ্যের ইতিহাস গগণের নক্ষত্র স্বরূপ তেমনি স্পেনেও বহু ক্ষণজন্মা ঐতিহাসিকের আবির্ভাব ঘটেছে যারা প্রাচ্যে পাশ্চাত্যেসহ বিশ্বে বিপুলভাবে সমাদৃত। আর যা আমাদের নিকট এসেছে তার জন্য আমরা অব্যশই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করব— ঐতিহাসিক ডজি, কোডিরা, রিবেরা, গণজালেজ ভ্যালেনসিয়া সহ আল মাকরেজী, আল মাক্কারী, আল জাববী, ইবনুল আববার প্রভৃতি মনীষীর আবদান। ঐতিহাসিকদের অনেক লেখনী ছাপার হরফে প্রকাশিত হয়নি। এখনও বহু পাণ্ডুলিপি এসকোরিয়াল, মাদ্রিদ, তলেদো, কর্দোবা বা এমনি বহু গ্রন্থাগারে বা ব্যক্তিগত সংগ্রহে বিদ্যমান। কারণ মুসল-মানদের রাজত্বে এমন কোন শহর ছিল না যেখানে না ছিল কিতাব না ছিল গণ গ্রন্থাগার।

স্পেনের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস বেত্তাদের মধ্যে আব্দুল মালিক ইবনে হাবীব (মৃ. ৮৫৪) একজন বিপুল জ্ঞানের অধিকারী পণ্ডিত ছিলেন। বহু বিষয়ের উপর তার অনেক কিতাব আছে। ঐতিহাসিক হিসাবে তাকে স্মরণ রেখেছে তারই রচিত ইতিহাস 'তারিখ' এটা সৃষ্টির শুরু থেকে নবী হজরত মোহাম্মদ (স.) পর্যন্ত। অনেক নবীর কথা, মুহাম্মদ (স.) এর উত্তর সূরী খলিফাবৃন্দ, স্পেন বিজয় এবং স্পেনের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে লিখিত।

বনু রাজি তিন পুরুষ ইতিহাস বেত্তারূপে খ্যাত। ইবনে মুসা আল রাজী (মৃ. ৮৮৬) আহমদ আল রাজী (মৃ. ৯৩৬) এবং তার পুত্র ঈসা স্পেনের রডারিক থেকে মুসা বিন নুসাইর সহ একেবারে হাযিব আল মনসুর পর্যন্ত বিস্তারিত ইতিহাস লিখেছেন। তারিখ আল আন্দালুস নামে। কিন্তু অধিকাংশ কিতাব একত্রিত হয়ে কোথাও রক্ষিত নয়। তবে "আখবার মাজমুয়াহ ফি ফাতহ আল আন্দালুস" নামে বিক্ষিপ্ত সংগ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে যা খুবই মূল্যবান তথ্য সম্বলিত। তারিখ ইফতিতাহ আল আন্দালুস প্রণেতা ইবনে কুতিয়াহ (মৃ. ৯৭৭) আখবার মাজমুয়াহর লেখকের ন্যায় বিখ্যাত। তার কিতাবও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ইবনে হাইয়ান (৯৮৭-১০৭০) ১০ খণ্ডে "কিতাব আল মাকতাবিছ ফী তারিখ রিজাল আল আন্দালুস" নামক অত্যন্ত মূল্যবান কিতাব রচনা করেন। তার অন্য কিতাব আল মাতিন ৬০ খণ্ডে বিভক্ত। যদিও অধিকাংশ খণ্ড বিলুপ্ত। খলিফা হাকাম (২য়) পর্যন্ত নিখুঁত চিত্র এ গ্রন্থে প্রদত্ত।

১১শ শতকে বহু কীর্তিমান ঐতিহাসিক স্পেনের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে ইবনে হাযমের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্বে তার কৃতিত্বের কথা বলা হয়েছে। এখানে ইতিহাসে তার অবদান কি সেটা আলোচ্য বিষয়। ইবনে হাযমের দু'খানা ইতিহাস গ্রন্থ খুবই উল্লেখযোগ্য। একখানা হোল জামহারাত আনসার আল আরাব এবং অন্যখানা হোল কিতাব আল নাকত আল আরুস ফি তাওয়ারিখ আল খোলাফা বিল আন্দালুস। আবার অনেকে তার বিখ্যাত গ্রন্থ ফিসালকেও ইতিহাসের তালিকাভুক্ত করেছেন। এসব গ্রন্থে আরবদের বংশতালিকা সহ সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গরূপ দেয়া হয়েছে।

ইবনে হাযমের যোগ্য উত্তরসূরী তলেদোর সাঈদ (১০২৯-৬১)। তার গ্রন্থ তাবাকাত আল উমাম। এই বইটি আবার ভিন্ন ধরনের তথ্য সমৃদ্ধ। পৃথিবীর পরিচিত জাতির কথা তুলে ধরা হয়েছে। ভারতীয়, গ্রীক, পারশিয়ান, রোমান, মিশরীয় এবং অন্যান্য জাতির কথা। এটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের উত্থান যুগে লেখা সেহেতু এর প্রতিবাদ্য বিষয় এরূপ।

আব্দুল ওয়াহিদ আল মাররাকুশী (১২৮৫-১২২৪) এবং আলী ইবনে সাঈদ আল মাগরেবী (১২১০-৭৪) ত্রয়োদশ শতকের ইতিহাসের দিকপালরূপে আর্বিভূত। উভয়েই মুয়াহিদদের যুগের। আল মাররাকুশী মারকুশের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্পেনে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। তার সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'আল মুজিব ফি তালখিস আখবার আল মাগরিব'। আল মাররাকুশীর সমকালীন ঐতিহাসিক ইবনুল ইযাহারী 'আল বাইয়ান আল মাগরিব' নামে অমূল্য গ্রন্থও রচনা করেন। ইবনে সাঈদ মাগরেবীর লিখিত গ্রন্থ 'আল মুখীরব ফি হুলা আল মাগরিব'। বইটা যদিও ১৫ খণ্ডে বিভক্ত কিন্তু অধিকাংশই বিলুপ্ত। আর একখানি তথ্যবহুল ইতিহাস হোল 'কিতাব আল মাসহিব ফী গারাইব আহল আল মাগরিব।' এই কিতাবখানি (১০১৬-১১৬৫) সালে প্রণীত। সমসায়িক আর একজন ঐতিহাসিক হলেন ইবনে বাশকুয়াল (১১০০-১১৮২)। তার কিতাব 'আলসিলাহ'। তার নিকটবর্তী লেখক আল জাববী (মৃ. ১২০২) এ সময়ের অন্য যে খ্যাতনামা লেখক তিনি হলেন ইবনুল আব্বার (১১৯৮-১২৩৮) তিনি প্রকৃতপক্ষে আল সিলীহ গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। ইতিপূর্বে আলোচিত ইবনে আব্দুল বার (মৃ. ৯৪৯) লিসানুদ্দিন ইবনুল খাতিব (মৃ. ১৩৭৪) এবং আব্দুর রহমান ইবনে খালদুন (মৃ. ১৪০৬) ইবনে বাসসা' ইবনে খাকান এর কথা আলোচিত হয়েছে। ইতিহাস লেখায় তাদের অবদান সবার সেরা।

মুসলিম সংস্কৃতিতে ইতিহাসের সাথে ভূগোলের সংশ্রব অবিচ্ছিন্ন। প্রায় প্রতিটি ইতিহাস গ্রন্থে ভৌগোলিক বিবরণ সুবিস্তৃত। মুসলমানেরা, ধর্মীয়, সামাজিক আর প্রশাসনিক প্রয়োজনে ভূগোলবিদ্যা চর্চায় বিশেষ যত্নবান হয়। অর্থনৈতিক আর বাণিজ্যিক কারণেও ভূপ্রকৃতি, আবহাওয়া, প্রাকৃতিক সম্পদ উৎপন্নদ্রব্য, যাতায়াত পথ, শহর, নগর, বন্দর ইত্যাদির অন্বেষায় ভূগোল জ্ঞান অপরিহার্য। কাবার দিকে কিবলা নির্ণয়, হজ্জপালন, বিভিন্ন জাতির সীমালংঘনের পরিণতির দিকে দিব্যজ্ঞান লাভের ভূপর্যটন নিতান্ত প্রয়োজন। কুরআন আর হাদীসে ভ্রমণ আর পর্যটনের নির্দেশও সুস্পষ্ট। যাক বিভিন্ন কারণে আর প্রয়োজনে অপরিচিত বিশ্বকে পরিচিত এবং প্রবাসকে নিবাস করার মানসে অধিকাংশ ভূগোলবিদ পরিব্রাজক হয়ে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করে জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করেছেন। মুসলিম ভ্রমণকারীরা কেবলমাত্র মুসলিম দেশ ভ্রমণ করেননি বরং পৃথিবীর অমুসলিম দেশও ভ্রমণ করেছেন এবং সে দেশের জনমানুষ খাদ্য পোষাক, আচরণ, ধর্ম সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, নিরাপত্তা, বাজারদর, উৎপন্ন দ্রব্য ইত্যাদির বিবরণও দিয়েছেন। যেমন ভারত, চীন, বলকান রাষ্ট্রসমূহ এবং অন্যান্যদেশ এমন কি এটা ঐতিহাসিক সত্য যে সর্বপ্রথম মুসলিম নাবিক পর্যটকই আন্দালুসিয়া থেকে আমেরিকা আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে বার্হিগত হন এবং সেই নূতন দেশ সন্ধানে সফলতা লাভ করেন। আর এ তথ্য তারা স্পেনে ফিরে বিস্তারিত বর্ণনা দেন। তখন মুসলমানদের রাজত্ব নেই বললেই হয়। সব অঞ্চল খ্রিস্টানরা গ্রাস করে কেবল মাত্র গ্রানাদায় মুসলিমরা দুর্গে অবরুদ্ধ আর তখনও

আত্মকলহ চলছে। তারপর যে বর্ষে অর্থাৎ ১৪৯২ সালে ফার্ডিনাণ্ড ও ইসাবেলা গ্রানাদার শেষ শাসক আবু আবদুল্লাহ বোয়াবদিলকে নিছক প্রতারিত করে আত্মসমর্পণের চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়ে মুসলিম শাসন চিরতরে নির্মমভাবে শেষ করল, ঠিক সেই বর্ষেই মুসলিম নাবিকদের নিয়ে সেই আবিষ্কারকদেরকে গাইড করে বিহার করে কলম্বাস স্পেন থেকে আমেরিকায় গেল। মুসলমানেরা কিন্তু পরিভ্রমণের নামে প্রমোদ বিহার করে কখনও বনভোজন করেনি। প্রকৃত প্রস্তাবে তারা শিক্ষা সফর করে দেশের ভূপ্রকৃতি, ভূত্বক, আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিরিখে সারা পৃথিবীকে ৭টি জোনে বিভক্ত করেন। নীলনদের উৎস, ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর, কৃষ্ণ সাগর, মা অরা আন নাহার, দজলাফোরাত প্রভৃতি নদনদী সাগর আর পাহাড়, পর্বতমালার অবস্থিতি সম্পর্কেও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। আরবী শব্দ জিওগরাফিয়া থেকে geography যদিও গ্রীক পণ্ডিত টলেমীর ভূগোল সম্বন্ধেও মুসলিম ভূগোলবিদগণ অবহিত হয়েছিলেন। কিন্তু সেই তথ্যে তারা সন্তুষ্ট ছিলেন না বরং স্বচক্ষে দেশ ভ্রমণ করে তাদের অভিজ্ঞানকে জগতবাসীকে সুন্দরভাবে উপহার দেন। প্রাচ্যে এই ভূবিদ্যাচর্চায় বিশেষ স্মরণীয় পণ্ডিত ছিলেন আল খাওয়ারজমী (মৃ. ৮৪৭) তিনি 'সুরাত আল আরজ্' নামক গ্রন্থ রচনা করে পৃথিবী ও আকাশের মানচিত্র পরিবেশন করেন। তারই উত্তরসূরী ইবনে খুরদাদবিহ (মৃ. ৯১২) আল ইয়াকুবী (মৃ. ৮৯৭), আল ইস্তাখারী (মৃ. ৯৫০) ইবনে হাওকল (মৃ. ৯৭৭) আল মাকদিস (মৃ. ১০০০) এবং ইয়াকুবী (মৃ. ১২২৯) সকলেই প্রাচ্যের স্বনামধন্য ভূগোল শাস্ত্রের দিকদিশারী।

পাশ্চাত্যেও মুসলমানেরা প্রাচ্যের ন্যায় ভূগোল শাস্ত্রে অমূল্য অবদান রাখেন। স্পেনের ভূগোলবিদদের মধ্যে আল ওয়াররাক্ (মৃ. ৯৭৩) আহমদ বিন মুহাম্মদ আল রাজী– (মৃ. ৯৩৬) আল বাকরী (মৃ. ১০৯৪) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তারা মাসালিক নামে কিতাব রচনা করে নূতন নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটন করেন। শহরের অবস্থিতি– ব্যবধানিক দূরত্ব, উৎপন্ন দ্রব্য, যাতায়াত, পরিবহণ, যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। দ্বাদশ শতকেও ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেমে থাকেনি। এ সময়ে যাঁরা সর্বাপেক্ষা নামকরা ছিলেন তাঁরা হলেন আল ইদ্রিসী (মৃ. ১১৬৬), আবু হামিদ আল গরিনাতি (মৃ. ১১৬৯) এবং ইবনে আল জুবাইর (মৃ. ১২১৭)। আল ইদ্রিসী আরবদের প্রতিনিধিরূপে বিশ্বে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তিনি ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ সিসিলী ও তার তীরস্থ দেশ সমূহে এবং বারমান রাজা দ্বিতীয় রজারে ফরমায়েশ মত একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কিতাবটির নাম 'নুজহাত আল মুশতাক ফি ইখতারক আল আফাক'। গ্রন্থটি মানচিত্রে সমৃদ্ধ ও বিরল তথ্য সম্বলিত। পরবর্তী গ্রন্থাকারদের টেকস্ট বুক হিসাবে পরিগণিত।

আল ইদ্রিসীর ন্যায় প্রতিভাদীপ্ত আবু হামিদ আল মাজিনী। তিনি ও আল ইদ্রিসী সমসাময়িক গ্রানাদার অধিবাসী। উৎসাহী কৌতূহলী আর অক্লান্ত পরিশ্রমী পরিব্রাজক রূপে তিনি ঘুরেছেন। আন্দালুসিয়ার সীমানা পেরিয়ে সিসিলী, মিশর, কাস্পিয়ান সাগর ও বলকান রাজ্যে। প্রাচ্যে রাশিয়া আমুদরিয়া ভ্রমণ করে বাগদাদে উপনীত হন। যে সময় আধুনিক পরিবহণ নেই, যোগাযোগ নেই, বন্ধুর মরুপর্বত জঙ্গলাকীর্ণ স্বাপদ সংকুল সেই মধ্যযুগে মরুগিরি কানন কান্তর শহর নগর প্রান্তর নদনদী সাগর একের পর এক অতিক্রম করেছেন শত বাঁধার গিরি লংঘন করে। তারপর তাঁর সেই বিচিত্র জীবনে দেখা বৈচিত্রময় পৃথিবীকে

উপহার দিয়েছেন ঘরের মানুষকে এক অনবদ্য বর্ণনায় তথ্য ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ করে। পৃথিবী পৃষ্ঠে বসবাসকারী জনগণের হালহকিকত, নয়নাভিরাম নগরে প্রাসাদ হর্ম্যরাজি, সাগর, দ্বীপ, উপদ্বীপ আর দুষ্প্রাপ্য বিরল বিচিত্র পশু-প্রাণী জীব জন্তুর বর্ণনা, গিরি গুহা, সমাধি সৌধমালা, প্রস্তরীভূত কংকালও তার বিবরণে বাদ পড়েনি। অর্থাৎ তাদের ভূগোল পাঠে পাঠকের কৌতূহল আর জ্ঞান পিপাসা যেন বৃদ্ধি পেত গাণিতিক হারে। রহস্যময় পৃথিবীর সব আবরণ উন্মোচিত হোত অজানাকে জানার তৃপ্তি আস্বাদে। ত্রয়োদশ শতকে এমনি আর একজন পরিব্রাজক পণ্ডিত ছিলেন ইবনুল জুবাইর (মৃ. ১২১৭)। তিনি দেশ জানার অতৃপ্ত বাসনায় অজানা পথের হাতছানিতে বেরিয়ে পড়েন স্পেন হতে। মিশর পেরিয়ে মক্কা, মদীনা, কুফা, বাগদাদ, আলেপ্পো হয়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন আন্দালুসিয়ায়। ইসলামের কীর্তিবহুল স্মৃতি বিজড়িত কেন্দ্রগুলি যা জ্ঞান-বিজ্ঞান, কলা সাহিত্যে আর স্থাপত্যের ইমারতে স্মৃতি স্বাক্ষররূপে দণ্ডায়মান সেগুলি বছরের পর বছর ধরে পথ যাত্রার দুঃখময় ক্লান্তি অবসাদ শ্রান্তি উপেক্ষা করে দেখেছেন আর মনের পাতায় স্মৃতির বহর বাড়িয়ে জগতবাসীকে উপহার দিয়েছেন—'রিহালা' নামের এক মূল্যবান গ্রন্থ যা পাঠে যুগান্তরের দেশ-দেশান্তরের মানুষেরা পরিতৃপ্ত।

মুসলমানেরা এমনিভাবে কি ইতিহাসে, কি ভূগোলে আন্দালুসিয়ায় এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন পাণ্ডিত্যের সোপান রচনা করে। তাই তো মুসলিম মনীষীরা সেদিনের স্পেন সারা ইউরোপকে করেছিল আলোকিত। যুগান্তরের তমসা হয়েছিল বিদূরিত।

এমনিভাবে স্পেনের রাজধানী জগতমণি কর্দোবা আর সেরা শহর তলেদো, মালাগা সারাগোসা, সেভিল, এছিজা, জায়েন, আলমেরিয়া এবং মুসলমান শাসনের শেষ কেন্দ্রবিন্দু গ্রানাদার শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় অসংখ্য মনীষী জ্ঞানতাপসের ন্যায় নিরলস সাধনায় গভীর তন্ময় ও অধ্যবসায় গণিত শাস্ত্র, জ্যোর্তিবিদ্যা, দর্শন, উদ্ভিদবিদ্যা, চিকিৎসা, রসায়ন ও পদার্থে বিরল কীর্তি রেখে গেছেন। এ সমস্ত পণ্ডিত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে স্পেনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি নামে ভিন্ন একটি গ্রন্থ রচনার যথেষ্ট অবকাশ আছে। তাদের কর্ম সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এ সংগে সংযোজিত করা হোল উৎসাহী জনের গবেষণার সূত্র রচনার মানসে।

পরিশিষ্ট—ক

[মুজারব ❑ মুর ❑ মুদেজার ❑ মরিসকোস ❑ সার্ফ ❑ মুয়াল্লাদ ❑ শ্লাভ ❑ বার্বার ❑ গথ বা ভিসিগথ ❑ শাসনকর্তাদের তালিকা ❑ মনীষীবৃন্দের, তালিকা ।]

মুজারব

মুজারব শব্দটি আরবী শব্দ মুসতারিব থেকে। আরবগণ স্পেনে গমনের পর স্পেনীয়দের মধ্যে আরবীভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে। উন্নত, মার্জিত, ছন্দ, উপমা, অলংকার এবং শ্রুতিমধুর আরবীভাষা ও সাহিত্য খ্রিস্টান স্পেনীয়দের নিকট এক আকর্ষণীয় ও অনুকরণীয় বিষয়রূপে বিবেচিত হয়। শুধু ভাষা নয় আরবদের আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ, রীতিনীতি, চালচলন, রুচি, আহার পদ্ধতি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, গৃহসজ্জা, আসবাব বিন্যাস হতে শুরু করে বিজ্ঞানী, দর্শন, কলা, কাব্য অর্থাৎ আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতি হুবহু যারা অনুকরণ করল শুধুমাত্র ধর্মটা ছাড়া তাদেরকে মুজারব বলা হতো। ধর্মে তারা খ্রিস্টান ছিল। আরবীয়করণ এমনভাবে হয়েছিল মুজারবদের মধ্যে যে তারা তাদের মাতৃভাষা ভুলে আরবী ভাষায় মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করে। স্পেনীয় সমাজে মুজারব একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীরূপে বিবেচিত হতো। তারা ধর্মগ্রন্থ বাইবেল পর্যন্ত আরবীতে অনুবাদ করে। কর্দোবা, সেভিল, সারাগোসা ও তলেদোর মত বড় বড় শহরে তারা আরবদের সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে বসবাস করত। এ রূপ আরব প্রীতি গোড়া খ্রিস্টানদের ঈর্ষার উদ্রেক করত। ফলে আরব বিতাড়নে তাদের তৎপরতা যুগ যুগ ধরে চালাতে থাকে।

মুর

মুর শব্দটি ল্যাটিন মাউরী শব্দ থেকে। এর অর্থ বোবা বা কালো। অর্থাৎ রোমান আমলে উত্তর আফ্রিকার মৌরি তানিয়া অথবা উপজাতি বার্বারদের ভাষা শাসক শ্রেণী বুঝত না। ফলে রোমান শাসকরা এই উত্তর আফ্রিকীয়দের তাচ্ছিল্যভরে মাউরী বলে সম্বোধন করত। যেরূপ ইংরাজরা ভারতবর্ষের মোকদের কথা বুঝতনা বলে তাদের নেটিভ বা ম্লেচ্ছ ইত্যাদি ভাষায় গালি দিত। এটা শাসকশ্রেণীর বুর্জোয়া টাইপের অহমিকা।

১. Sm Imamuddin—The Economic History of Spain. P—458

আরব ও বার্বারগণ সম্মিলিতভাবে স্পেন বিজয় করে। স্পেনীয়রা এই আরব ও বার্বার অর্থাৎ স্পেনে নবাগত মুসলমানদের সহ্য করতে না পেরে তাদেরকে হেয় প্রতিপন্নের জন্য মুর বলে সম্বোধন করে। ঐতিহাসিক লেনপুল সাহেব তার বই Moors in Spain এ Moor সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা হোল : The word Moor is conveniently used to signify Arabs and other Mohammedans in spain but properly if should only be applied to Berbers of North Africa and spain. In this volume the term is used in its common acceptation, unless the Arabs are specially distinguished from Berbers. Page-13n.

তার বই এর শেষ পৃষ্ঠায় তিনি দুঃখের সাথে বলেছেন যে মুরদের বিতাড়ন করে স্পেনীয়রা যেন তাদের স্বর্ণডিম্ব প্রসবিনী হংসীকেই হত্যা করে। মুরদের বিতাড়ন করে যেন খ্রিস্টান স্পেনে শিল্প সাহিত্য-জ্ঞান বিজ্ঞান, সভ্যতা ও সংস্কৃতির গগনে চন্দ্রগ্রহণ ডেকে আনে। পূর্ণচন্দ্রের কিরণে মুসলিম স্পেন যেমন আলোয় ঝলমল করত, মুসলিম অবসানে খ্রিস্টান স্পেন যেন অমানিসার আধারে ডুবছে। মুর বলে যাদের ঘৃণা করত তারাই শিখালো সভ্যতার নবজাগরণ খ্রিস্টান ইউরোপে। তুচ্ছ, তাচ্ছিল্য আর ঈর্ষার কারণে ঘৃণার সম্বোধন তাদেরই প্রাপ্য যারা ঐ সম্বোধন করত।

প্রকৃতপক্ষে ঘৃণা, হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন জ্বেলে ইউরোপের সভ্যতার দিক নির্দেশক মুসলিমদের যে অমানবিক অত্যাচার, নৃশংস হত্যা এবং নজীরবিহীন ধ্বংসের দ্বারা মুর বিতাড়নের কাজটি সেদিন যারা করেছিল তাতে তারা রক্তে হোলি খেলায় মেতে উঠেছিল। ১লা এপ্রিল ১৪৯২ মুসলিম বিতাড়নের দিনটি মূঢ় খ্রিস্টান শ্রেণীর নিকট এক কৌতুক উৎসব। যেন বোকা মুসলমানদের তাড়নের করুণ চিত্র তাদের নিকট খেলা তামাসার বিষয়। অথচ ঐ ১লা এপ্রিল আজও পশ্চিমা গোষ্ঠী অনবহিত মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে কৌতুক দিবস পালন করাচ্ছে তাদেরই পূর্বসুরীদের করুণ পরিণতির অজানা হৃদয়বিদারক দৃশ্যে।

মুদেজার

দক্ষিণে মুসলিম শাসন অবসানের পূর্বে যে সমস্ত মুসলমানেরা খ্রিস্টান রাজ্য ক্যাষ্টাইল, লিওন এবং আরাগনে বাস করত তাদেরকে মুদেজার বলা হোত। এরাই খ্রিস্টান শাসনে নিদারুণ নিগ্রহের শিকার ছিল।

মরিসকোস

গ্রনাদা পতনের পর মুসলমানদের ভাগ্যে সামগ্রিকভাবে নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা। নির্যাতন, জুলুম, নিপীড়ন এবং জোরপূর্বক খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ, ইত্যাদি। কেউ প্রকাশ্যে মুসলিম রীতিনীতি, বিবাহ–তালাক আকিকা, সালাত, সিয়াম ইত্যাদি পালন করতে পারত না। আরবী বলাও নিষিদ্ধ ছিল। অতএব মুসলিম নির্যাতনের নানা ধরনের কলাকৌশলে খ্রিস্টানরা তৎপর। এই রাজ্যহারা, সর্বহারা, ধর্মচ্যুতির যুগে সে সমস্ত মুসল- মানেরা অত্যন্ত গোপনে তাদের ধর্মকে টিকিয়ে রেখেছিল তাদেরকে মরিসকোস বলা

হতো। প্রতিটি শহরে এ ধরনের ধর্মচ্যুতির ফরমান জারি করে মুসলিম নিধন ও নিশ্চিহ্নের ব্যবস্থা করা হয়। কোন কোন সময় মুসলমানেরা বিদ্রোহও করে। কিন্তু তা ছিল নিষ্ফল এবং অধিকতর নির্যাতনের কারণ। ১৪৯২ সাল থেকে ১৬১৩ সাল পর্যন্ত সমগ্র স্পেনে এমন মুসলিম নিধনের কাজ চলতে থাকে। তাদেরকে নানা অজুহাতে বিভিন্ন শহর থেকে বিতাড়িত করা হয়। ঐতিহাসিক ইমামউদ্দিন সাহেব এই বিতাড়িত মুসলমানদের সংখ্যা ৪৬৭৫০০০ উল্লেখ করেছেন।

সার্ফ

গথ শাসনামলে স্পেনের সমাজে সর্ব নিম্নশ্রেণীতে ছিল ক্রীতদাস। ক্রীতদাস থেকে একটু উচুতে ছিল সার্ফ। তারা ক্রীতদাস ও কুরিয়ালদের মধ্যবর্তী পর্যায়ে অবস্থান করত। তারা কৃষক ছিল। ভূমি চাষ করত। তারা সেনাবাহিনী ও কৃষি ক্ষেতে শ্রমিক যোগান দিত। ভূমির সাথে তাদের ভাগ্য ছিল বিজড়িত। ভূমি বিক্রয় করলে ঐ ভূমি যে সার্ফগণ চাষ করত তাদেরও বিক্রিত হতে হতো। তাদের ভূমির খাজনা এবং নিজের খাজনা দিতে হোত। আবার দৈহিক শাস্তিও পেতে হোত। রোমানদের শেষ যুগে তাদের অবস্থা কিছুটা ভাল হলেও গথদের সময় তাদের অবস্থা ছিল মানবেতর। তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিলনা। তারা মনিবদের অনুমতি ভিন্ন বিয়ে করতে পারত না। তাদের নিজস্ব বলে কোন সম্পত্তিও ছিলনা। অধিকন্তু খাজনা না দিতে পারলে দৈহিক নির্যাতনের ভয়ে বনেজঙ্গলে পালিয়ে দস্যুবৃত্তিতে ঢুকে পড়ত।

মুয়াল্লাদ (Muallad) বা মুয়াল্লাদূন

মুসলিম স্পেনের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মধ্যে মুয়াল্লাদূনরা ছিল উল্লেখযোগ্য। তারা মূলতঃ নও মুসলিম বা নব দীক্ষিত মুসলিম। বড় বড় শহর যেমন কর্দোবা, গ্রানাদা, তলেদো, সেভিল ও সারাগোসা প্রভৃতিতে বিত্তবান ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে ধর্মান্তরণ বেশি ঘটত। আবার অন্তঃ গোত্র ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ে হোত যেমন আরব–বার্বার এবং স্পেনীয় খ্রিস্টান মুসলিমদের মধ্যে। এই বিবাহের ফলে যে নবজাতক হোত তাকেই বিশেষভাবে মুয়াল্লাদ বলা হোত। এই শ্রেণীর মুসলিম মুয়াল্লাদূনদের খোদ আরবরা ভাল চোখে দেখত না। তাদের হেয় জ্ঞান করত বা ঘৃণা করত। যেমন দামেস্কের আরবরা নওমুসলিম অনারব মাওয়ালীদেরকে দেখত। শাসক শ্রেণী মুয়াল্লাদূনদের ঘৃণার চোখে দেখত এবং উচু পদে চাকুরীও দিত না। ফলে তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং আরব আধিপত্য ও আভিজাত্য খর্ব করে অধিকার আদায়ের দাবীতে তারা জোটবদ্ধ হোত সমশ্রেণীর সাথে।

স্লাভ (Salvs)

আরবদের আভিজাত্য এবং গোষ্ঠীকলহে বিরক্ত এবং বিপদাপন্ন হয়ে আব্দুর রহমান (৩য়) বিদেশীদের দ্বারা একটা রক্ষী বাহিনী তৈরি করেন। জার্মান, ফরাসী, ইতালীয়, ইসক্যান্ডিনেভিয়ান এবং রুশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বালকদেরকে ক্রীতদাস হিসাবে ভেনেশীয় এবং

অন্যান্য সমুদ্রে ব্যবসায়ীরা স্পেনের বাজারে বিক্রয় করত। এদেরকে ক্রয় করে আব্দুর রহমান (তৃতীয়) মুসলিম ধর্মবিশ্বাসে দীক্ষিত করে আরবীভাষা, সংস্কৃতি আচার, ব্যবহার এবং প্রয়োজনীয় সামরিক শিক্ষায় এদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলেন। এরাই পরবর্তীকালে সুদক্ষ রাজকীয় বাহিনী রূপে পরিগণিত হয়। সামরিক বেসামরিক গুরুত্বপূর্ণ পদে এদেরকে নিয়োগ করা হোত। এমনকি সেনাধ্যক্ষের পদও এদেরকে প্রদান করা হয়। লেনপুল সাহেব বলেন : With the aid of his Slaves the sultan not only banished brigandage and rebelleon from spain but waged war with the christians of the north with brilliant success. Page– 115.

এই শ্লাভদেরকে ইসকালাবী বা সাকালীবাহ্ বলা হোত। এদের সংখ্যা আব্দুর রহমান ১২০০০ হাজারে উন্নীত করেন এবং ৮০০০ হাজার অশ্বারোহী ছিল। শ্লাভদের মধ্যে অন্য-তম প্রধান সেনাপতি ছিলেন নাজদা। তবে শক্তিশালী শাসকের নিয়ন্ত্রণে এই বাহিনী অনুগত ছিল ঠিকই কিন্তু দুর্বল শাসকের সময়ে এরাই মুসলিম স্পেনের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেনাবাহিনীর মধ্যে বহু জাতিকে চরিত্র বৈষম্য ও অনৈক্য মারাত্মক রূপ নেয় এবং প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের হোতা রূপে কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল করে ফেলে। সেনাবাহিনীর মধ্যে ছিল আরব (মুদারীয়ও হিমারীয়) বার্বার, স্পেনীয় এবং শ্লাভ।

বার্বার

বার্বারগণ মূলত উত্তর আফ্রিকার অধিবাসী। এরা উপজাতি আদিবাসী। পার্বত্যঅঞ্চলে গোত্রভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় এদের জীবন। মৌরিতানিয়া ও মরক্কো জুড়ে ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক বিস্তৃত উপকূলে এদের বাস। এরা খুবই প্রাণবন্ত, উদ্যমশীল এবং সামরিক শক্তিমান গোষ্ঠী। আরবদের ন্যায় এরা গণতন্ত্রীমনা কর্মঠ, বলিষ্ঠ এবং গোত্রভিত্তিক জাতি। তবে সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল আরবদের বংশ ও গোত্রের প্রতি যেমন অকৃত্রিম টান এবং আনুগত্য তেমনি বার্বারদেরও। তাদের রণকৌশল আরবদের ন্যায়। বহু বছর ধরে বার্বার আরবদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। অতঃপর তারা আরবদের নিকট পরাজয় বরণ করে কিন্তু শর্ত ছিল যে তাদের গোত্রীয় শাসন বজায় থাকবে এবং দাসত্ব নয় ভ্রাতৃত্ব সুলভ আচরণ লাভ করবে বিজয়ী আরবদের নিকট হতে। বার্বারগণ অতিশয় বিশ্বাসপরায়ণ এবং সর্বদা নূতন ধর্মমত গ্রহণে তৎপর। ফলে মুসা বিন নুসাইর উত্তর আফ্রিকার গভর্ণর হয়ে আসলে এই বার্বারদের মধ্যে অস্ত্রের ব্যবহার অপেক্ষা শান্তির ধর্ম ইসলামের মর্মবাণী প্রচারে অধিক সুফল লাভ করে। বার্বারগণ দলে দলে সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ইসলামে একক আল্লা ও বিশ্ব নবীর প্রতি ঈমান এনে মুসলমান হয়ে যায়। বার্বারদের বহুগোত্র এমনি করে মুসা বিন নুসাইরের আহ্বানে সাড়া দেয় পদ মর্যাদা ও রণকৌশলের দক্ষতা অনুযায়ী তাদেরকে সেনাবাহিনীতে যোগ্যতার আসন দেন। এমনিভাবে দেখা গেল তারিফ বিন মালিক আন নখয়ী ছিলেন বার্বার এবং তিনিই প্রথম সেনাপতি যিনি স্পেন বিজয়ের জন্য নেতৃত্ব দেন। তারিফ বিন জিয়াদ, স্পেনবিজয়ী বীর

তিনিও বার্বার।* প্রসিদ্ধ ফকিহ ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়া ও ঈসা বিন দীনারও বার্বার ছিলেন। সেনাবাহিনীতে হাজার হাজার বার্বার আরবদের সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে স্পেন বিজয়ে অংশ গ্রহণ করেন। মূলতঃ উত্তর আফ্রিকার এই বার্বারদেরকেই স্পেনীয়রা মুর বলে অভিহিত করত। তবে আরব বার্বার সকল মুসলমানদেরকেই স্পেনীয়রা পরবর্তীকালে ঢালাওভাবে ঘৃণা বিদ্বেষবশতঃ মুর বলে অভিহিত করে। আরব-বার্বার যৌথ বাহুবলেও ঈমানের অবিচল ও অনঢ় বিশ্বাসে স্পেনে গথ শাসনের পতন ঘটিয়ে ইসলামের সোনালী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সেদিন সাদা-কালো আরব-অনারবের বার্বার ঐক্যবদ্ধ ইসলামী শক্তির জোর প্রয়াসে ইউরোপের পশ্চিম ভূখণ্ডে তমসার আধার বিদূরিত করে যে সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটায় তাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সমগ্র দুনিয়াকে চমৎকৃত করে।

ইমাম ইবনে হাযম বলেছেন যে বার্বারগণ আরবদের সাথে এমন ভাবে মিশে যায় যে তাদের মাতৃভাষার পরিবর্তে আরবী ভাষা ব্যবহার করতে থাকে এবং তারা পুরাপুরী আরব ভাষাপন্ন হয়ে যায়। তারা স্পেনে চিরস্থায়ী বসতি স্থাপন করে এবং আর জন্মভূমি বার্বারী এলাকা উত্তর আফ্রিকায় ফিরে যাবার তাগিদ অনুভব করেনি।

গথ বা ভিসিগথ

ইউরোপের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে এরাও একটা জাতিরূপে পরিগণিত। খ্রিস্টিয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে অসংখ্য অসভ্য বর্বার বাহিনী কর্তৃক প্রাচ্যে রোমান সাম্রাজ্য অধিকৃত হয় তবে তাদের মধ্যে শৌর্য আনুগত্য, উদারতায় গথরা ছিল উল্লেখযোগ্য। তারা খ্রিস্টিয় ৫ম শতকে স্পেনে ভান্ডালদেরকে বিতাড়িত করে ক্ষমতা দখল করে। তবে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে ছিল অলীক স্বপ্ন, ভৌতিক বিশ্বাস এবং নানা কুসংস্কারে আচ্ছাদিত। তারা নিজদের সৎ বংশোদ্ভূত মনে করত। তাদের সাহিত্য বলতে ছিল বাইবেলের অবিন্যস্ত অনুবাদ, সরকার বলতে ছিল গোত্রপতি শাসন। তবে অভিযানে নৃশংসতা এবং ধ্বংসযজ্ঞ মনোবৃত্তি তাদের পুরামাত্রায় ছিল। ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ তাদের ছিল। ভৌগোলিক কারণে বাসস্থানের জন্য গথগণ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। বরিসস্থীন্‌স নদের পূর্ব তীরের অধিবাসীরা অস্ট্রোগথ এবং পশ্চিম তীরের বাসিন্দারা ভিজিগথ নামে পরিচিত হয়। (History of the Moorish Empire in Europe—S. P. Scott. Vol-1 Page-166)

গথিক চার্চ বলতে স্পেনে ধর্মীয় খ্রিস্টান পুরোহিত তন্ত্রই বুঝাতো এবং তারা বেশ স্বাধীন ছিল যদিও রোমের মহান চার্চের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা এবং স্বীকৃতি পুরাপুরি ছিল। এরা খ্রিস্টান ধর্মান্ধ এত বেশি ছিল যে খ্রিস্টান ছাড়া অন্য কোন ধর্মীয় গোষ্ঠী বা মতকে আদৌও সহ্য করত না। এর ফলে হাজার হাজার ইহুদীকে তারা নির্মম নির্যাতনে হয় ধর্মান্তরিত না হয় বিতাড়িত এবং বহুজনকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। এরা বহু বিবাহ ও উপপত্নী গ্রহণে বেপরোয়া ছিল। মাঝে মাঝে ধর্মের নামে ভিজিগথিক কোড বা টলেডো কাউন্সিলের রাজকীয় ফরমান জারী করত নিবর্তন ও নিগ্রহ বা কর আদায়ের লক্ষ্যে।

---

* প্রসিদ্ধ ফকিহ ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়া ও ঈসা বিন দিনারও বার্বার ছিলেন।

স্থাপত্যে গথিক আর্চ বা খিলান বলতে যা বুঝায় তা হোল রোমের ইমারত নির্মাণে যে গোলাকার খিলানের স্থলে pointed arch বা সুচালু খিলান ব্যবহৃত হয় তারই হুবাহু অনুকরণ গথগণ তাদের স্থাপত্যে করে। তাই এটা জনমনে স্পেনে গথ শাসনে গথিক আর্চ নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এ প্রসংগে S. P. Scott বলেন– In their application to the mechanical arts, and in their development of architecture the visigoths diselosed rather on initature facaulty than a spirit of marked originality. (History of Moorish Empire in Europe Vo–I-page 193) ভিসিগথ রাজতন্ত্র ৫ম শতক হতে শুরু করে মুসলিম সেনাপতি কর্তৃক স্পেন বিজিত হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত স্পেনে অব্যাহত ছিল। তবে এই রাজতন্ত্রের শেষ শৌর্যবীর্যের বীর প্রতীক ছিলেন রাজা ওয়ামবা। তার জীবনাবসানে রাজা হন আরভিজিয়াস। আরভিজিয়াস তার জামাতার অনুকূলে ক্ষমতা ছেড়ে দেন। জামাত এযিজা বেশ কিছু দিন রাজ্য শাসন করার পর স্বীয় পুত্র উইটিজা তার স্থলাভিসিক্ত হন। উইটিজা বেশ ব্যতিক্রমধর্মী শাসক ছিলেন এবং অনেক অনাচার অত্যাচার ও ধর্মীয় গোড়ামী ও কুসংস্কার হতে দেশকে মুক্ত করার প্রয়াস চালান। ক্ষীপ্ত গোড়া ধর্মান্ধগণ এটা মেনে নিতে পারেনি। ফলে তাকে অসহায়ভাবে নিহত হতে হয়। অতঃপর ৭০৯ সালে রাজা রডারিক ক্ষমতা দখল করেন যদিও তিনি ভিসিগথ রাজ বংশজাত ছিলেন না। নিহত রাজা উইটিজার পুত্র অচিলা ভ্রাতা অপাস রাজধানী টলেডোতে ছিলেন এবং জামাতা কাউন্ট জুলিয়ান সিউটার গভর্ণর ছিলেন। ৭১০ সালে মুসলিম বিজয় বাহিনীর হাতে রাজধানী টলেডোর পতন হয় এবং গথ শাসনের অবসান ঘটে।

বিভিন্ন বিষয়ের উপর আন্দালুসিয়ায় সে সমস্ত কীর্তিমান মনীষী স্মরণীয় তাঁদের মধ্যে
কিছু সংখ্যক ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের কিছু শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নামের তালিকা।

	মনীষীবৃন্দের নাম	জন্ম মৃত্যু সন	রচিত গ্রন্থের নাম	বিষয়
১.	আল বাকী বিন মাজমাল	মৃ. ৮৮৬ ইং		আল কুরআনের তফসীর
২.	আল মুজাহিদ	মৃ. ১০৪৪		আল কুরআনের তফসীর
৩.	আবু আমর আল সানী	মৃ. ১০৫৩		আল কুরআনের তফসীর
৪.	আবু মুহাম্মদ বিন আতিয়াহ	মৃ. ১১৪৭		আল কুরআনের তফসীর
৫.	আবুল কাসিম বিন ফিররুহ	মৃ. ১১৯৪		আল কুরআনের তফসীর
৬.	মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন ফরাহ আল কুরতুবী	মৃ. ১২৭৩	তফসীরে কুরতুবী	আল কুরআনের তফসীর
৭.	মুহাম্মদ বিন ওযয়াহ	মৃ. ৯০০		হাদিস
৮.	কাসিম বিন আসবাগ	৮৬১-৯৫১		হাদিস
৯.	ইবনে ফুতাইস	মৃ. ১০১১		হাদিস
১০.	আবু আব্দুল্লাহ আল জাওলানী	৯৭৮-১০৭৪		হাদিস
১১.	ইউসুফ ইবনে আব্দ আল বার	মৃ. ১০৭০	তামহীদ	হাদিস
১২.	ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়া আল লাইসী বার্বার	মৃ. ৮৪৭		ফিক্হ
১৩.	ইবনে মাসারাহ	মৃ. ৯৩১		ফক্হ

	মনীষীবৃন্দের নাম	জন্ম মৃত্যু সন	রচিত গ্রন্থের নাম	বিষয়
১৪.	আবুল ওয়ালিদ আল বাকী	মৃ. ১০৮১		ফিক্‌হ
১৫.	ঈসা বিন দীনার	মৃ. ৮২৭		ফিক্‌হ
১৬.	আবু মুসা হাওয়ারী (১ম হিশামের সময়)			ফিক্‌হ
১৭.	আবু মুহাম্মদ আলি ইবনে আহমদ ইবনে সাঈদ ইবনে হাযম	৯৯৪-১০৬৪	জামহারাত আনসাব আল আরাব এবং কিতাব আল নাক্‌ত আল আরুস ফি তাওয়ারিখ আলখুলাদা	ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতি।
১৮.	আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে রুশদ	১১২৬-১১৯৮	কিতাব বিদায়া আল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়া এবং কুল্লিয়াত।	ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতি চিকিৎসা।
১৯.	ওয়ালিউদ্দিন আবু যায়দ আব্দুর রহমান ইবনে খালদুন	১৩৩২-১৪০৬	কিতাব আল ই'বার ওয়া দিউয়ান আল মুবতাদা ওয়াল খবর ফি আইয়্যাম আল আরব আল আজাম ওয়াল বার্বার ওয়ামান আসরাহুম মিন যাউভি সুলতান আল আকবর	ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সমাজ ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদি।
২০	মুহীউদ্দিন ইবনুল আরাবী	১১৬৫-১২৪০	ফুতুহাত আল মাককীয়া	ধর্ম, দর্শন, সূফীতত্ত্ব।
২১.	ইবনে আবদ রাব্বিহী	৮৬০-৯৪০	ইকদুল ফরীদ	ধর্ম, ইতিহাস, কবিতা ইত্যাদি।
২২.	লিসানুদ্দিন ইবনুল খাতিব	১৩১৩-১৩৭৪	আল ইহতা ফী তারিখ গারনাতা	ধর্ম, ইতিহাস, কবিতা, রাষ্ট্র।
২৩.	আবু ইব্রাহিম			ফিক্‌হ
২৪.	আবু বকর বিন মাবিয়া			ফিক্‌হ

	মনীষীবৃন্দের নাম	জন্ম মৃত্যু সন	রচিত গ্রন্থের নাম	বিষয়
২৫.	আল রিবাই			ফিক্‌হ
২৬.	সাঈদ বিন রাজিব			ফিক্‌হ
২৭.	ইবনে মামার			ফিক্‌হ
২৮.	আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল মালিক ইবনে তুফায়েল	১১০৫-১১৮৬	হাই ইবনে ইয়াকজান	দর্শন ও চিকিৎসা
২৯.	ইবনেসাবঈন	১২১৭-১২৬৯		দর্শন
৩০.	আবু বরক মুহাম্মদ বিন ইয়াহয়া ইবনে বাজাহ	মৃ. ১১৩৮	তাদবীর আল মুতাওয়াহীদ	দর্শন
৩১.	ইবনে আবদ ইয়াহয়া	মৃ. ১১৩৪		দর্শন
৩২.	আল শাকানদী	মৃ. ১২৩১	রিসালাহ	ইতিহাস
৩৩.	আল মাককারী	মৃ. ১৬৩১	নাফ আত তী মিন গাসান আল আন্দালুসী আল রাতিব অযাফির আজিরিহা লিসানুদ্দিন ইবনুলখাতিব	ইতিহাস
৩৪.	আব্দুল মালিক ইবনে হাবিব	মৃ. ৮৫৪	আত তারিখ	ইতিহাস
৩৫.	মুহাম্মদ ইবনে মূসা আররাজী	মৃ. ৮৮৬	তারিখ আল আন্দালুস	ইতিহাস
৩৬.	আহমদ আর রাজী	মৃ. ৯৩৬	আখবার মাজমুয়াহ ফী ফাতহ্ আল আন্দালুস	ইতিহাস
৩৭.	ঈসা বিন আহমদ আর রাজী		ঐ	

	মনীষীবৃন্দের নাম	জন্ম মৃত্যু সন	রচিত গ্রন্থের নাম	বিষয়
৩৮.	আবু বকর ইবনে ওমর আল কুতিয়াহ	মৃ. ৯৭৭	তারিখ ইফতিতাহ আল আন্দালুস	ইতিহাস
৩৯.	ইবনে হাইয়্যান	৯৮৭-১০৭০	কিতাব আল মাকতাছি ফী তারিখ রিজাল আল আন্দালুস (১০ খণ্ড এবং আল মাতিন ৬০ খণ্ড)	ঐইতিহাস
৪০.	সাঈদ	১০২৯-৬৯	তাবাকাত আল উমাম	ইতিহাস
৪১.	ইবনে বাশকুয়াল	১১০০-১১৮২	কিতাব আল মিলাহ ফী আখবারি আইমাতিকা আন্দালুস	ইতিহাস
৪২.	আল হিজারী	১১০৬-১১৫৫	কিতাব আল মাসহিব ফী গারাইব আল মাগরিব	ইতিহাস
৪৩.	আব্দুল ওয়াহিদ আল মাররাকুশী	১১৮৫-১২২৪	আল মুজিব ফী তালখিস আখবার আল মাগরিব	ইতিহাস
৪৪.	আল জাব্বী	মৃ. ১২০২		ইতিহাস
৪৫.	আলী ইবনে সাঈদ আল মাগবেরী	১২১০-১২৭৪	আল মুখরীব ফীহুলা আল মাগরিব ১৫ খণ্ড	ইতিহাস
৪৬.	ইবনুল ইযাহারী (ঐ সমকালীন)		আল বায়ান আল মাগরিব	ইতিহাস
৪৭.	ইবনুল আহমর	৯৬৯		ইতিহাস
৪৮.	আবু বকর আল তরতুসী	১০৫৯-১১৩০	সিরাজ আল মুলুক	ইতিহাস
৪৯.	ইবনে আবি আল খিসাল	১০৭২-১১৪২		
৫০.	ইবনে খাইর	১১০৮-১১৭৯		ইতিহাস
৫১.	ইবনে সাঈদ	১০৩০-১০৭০	কিতাবুত তারিফ বি তাবাকাতিল উমাম	ইতিহাস

	মনীষীবৃন্দের নাম	জন্ম মৃত্যু সন	রচিত গ্রন্থের নাম	বিষয়
৫২.	ইবনুল ফারাজী	৯৬২-১০১৩	তারিখুল ইলামা আল আন্দালুস	ইতিহাস
৫৩.	আল ওয়াররক	মৃ. ৯৭৩		ভূগোল
৫৪.	ইবনুল আববার	১১৯৮-১২৩৮	আল মিলাহ গ্রন্থ সম্পূর্ণকরণ	ভূগোল
৫৫.	আল ইদ্রিস	মৃ. ১১৬৬	নুর্জহাত আল মুশতাকফী ইখতিরাক আল আফা	ভূগোল
৫৬.	আবু হামিদ আল গারনাতী	মৃ. ১১৬৯		ভূগোল
৫৭.	ইবনে আল জুবাইর	মৃ. ১২১৭	রিহালা	ভূগোল
৫৮.	আবু হামিদ আল মাজিনী			ভূগোল
৫৯.	আল বাকরী	১০৪০-১০৯৪	মাসালিক ও মামালিক	ভূগোল
৬০.	আরিব বিন সাঈদ			চিকিৎসা
৬১.	ইয়াহয়া বিন ইসাহক			চিকিৎসা
৬২.	আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওজরী			চিকিৎসা
৬৩.	আব্দুর রহমান ইসহাক ইবনে হায়শাম	৯৬৫-১০৩৯		চিকিৎসা
৬৪.	ইবনে মায়মুন ইহুদী	১১৩৫-১২০৪		চিকিৎসা
৬৫.	হাসদাই ইহুদী			চিকিৎসা
৬৬.	ইবনে আরকাম	মৃ. ১৩৫৬		

	মনীষীবৃন্দের নাম	জন্ম মৃত্যু সন	রচিত গ্রন্থের নাম	বিষয়
৬৭.	মুহাম্মদ বিন আবু বকর আয যুহরী			চিকিৎসা
৬৮.	আবুল কাশেম খালাদ ইবনে আব্বাস আজ জাহরফী	মৃ. ১০১৩		চিকিৎসা
৬৯.	আবুল কাসিম (বুকাসিম)		আত তাসরীফ (৩০ খণ্ড)	চিকিৎসা
৭০.	ইবনে জুলজুল	মৃ. ৯৮২	তারিখউল আতিককা ওয়াল দালাসিফা	চিকিৎসা
৭১.	ইবনুল ওয়াফিদ	৯৯৭-১০৩৫	ফিতাবুল আদবিয়া আল মুফরাদা	চিকিৎসা
৭২.	ইবনুল সামাহ	৯৭৯-১০৩৫	আল মুয়ামালাত	চিকিৎসা
৭৩.	আবু মারওয়ান আব্দুল মালিক ইবনে জুহুর	১০৯১-১১৬২	আল তাইছির ফী আল মুদাওয়া ওয়াল তাদবীর	চিকিৎসা
৭৪.	ইবনেরাসা	মৃ. ১৩১৬		চিকিৎসা
৭৫.	ইবনে জুয়াইয়া (বনু নসর বংশ)			চিকিৎসা
৭৬.	ইবনুস সাফফার	মৃ. ১০৩৫		চিকিৎসা
৭৭.	আহমদ বিন নসর	মৃ. ৯৪৪		চিকিৎসা
৭৮.	মাসালামাহ ইবনুল কাসিম (৩য় আঃ রহমানের সময়ে)			
৭৯.	আবুল কাসিম মাসলামাহ			জ্যোর্তিবিদ
৮০.	ইবনুল বাইতার	মৃ. ১২৪৮	কিতাবুল জামি ফী আদবিয়া আল মুফরাদা	উদ্ভিদ বিজ্ঞান
৮১.	আবুল আব্বাস আহমদ	১১৬৫-১২৪০	কিতাবুল রিহালা	উদ্ভিদ বিজ্ঞান

	মনীষীবৃন্দের নাম	জন্ম মৃত্যু সন	রচিত গ্রন্থের নাম	বিষয়
৮২.	ইবনুল আওয়্যাম (১২শ)		কিতাবুল ফালাহ	উদ্ভিদ বিজ্ঞান
৮৩.	ইয়াহয়া আল গাজাল	মৃ. ৮৬৪	(২য়) আব্দুর রহমানের দূতরূপে কনষ্টান্টিনপল যান	কবিতা
৮৪.	আব্বাস বিন ফিরনাম			কবিতা
৮৫.	আমির আব্দুর রহমান আদ দাখিল	৭৩১-৭৮৮	·	কবিতা
৮৬.	আমির হাকাম (১ম)	৭৭০-৮২২		কবিতা
৮৭.	ইবনে হাবিব	৭৯৬-৮৫২		ফকিহ
৮৮.	আবুল হাসান বিন নাফে ওরফে জিরাব	৭৮৯-৮৫৭		কবিতা
৮৯.	সাঈদ বিন জুদী	মৃ. ৮৯৭		কবিতা
৯০.	ইবনে হানি আল আন্দালুসী	৯৩২-৯৭৩		কবিতা
৯১.	ইবনে জায়দূন	১০৩১-১০৮৬		কবিতা
৯২.	আল মুতামিদ	১০৪০-১০৯১		কবিতা
৯৩.	আবু ইসাহক আল ইলবিরি	মৃ. ১০৬৯		কবিতা
৯৪.	আল মুতাসিম	১০৫১-১০৯১		কবিতা
৯৫.	উম্মুল কিরাম			কবিতা
৯৬.	ইবনে আম্মার	১০৩১-১০৮৬		কবিতা

	মনীষীবৃন্দের নাম	জন্ম মৃত্যু সন	রচিত গ্রন্থের নাম	বিষয়
৯৭.	আবু সালত	১০৬৮-১১৩৪		কবিতা
৯৮.	ইবনে সাঈদ	মৃ. ১১৬৪		কবিতা
৯৯.	আবু হাইয়্যান	১২৫৭-১৩৪৪		কবিতা
১০০.	আবু আলী আলকুলী	৯০১-৯৬৭	কিতাব আল আমালী	কবিতা, ব্যাকরণ ইত্যাদি
১০১.	ইবনে আল সীদ	১০৫২-১১২৭		কবিতা
১০২.	আল মাওয়াইনী	মৃ. ১১৬৮		কবিতা
১০৩.	ইবনে মুগিস (খলিফা ২য় হাকামের সময়)			কবিতা
১০৪.	ইবনে ফরাজ আল গায়ানী	মৃ. ৯৭০	কিতাব আল হাদাইক	কবিতা
১০৫.	ইবদে দাউদ আল ইসপাহানী			কবিতা
১০৬.	আবুল ওয়ালীদ আল হিমারীয়	১০২৬	আল বাদি ফী ওয়াসফ আল রাব্বি	কবিতা
১০৭.	ফাতাহ ইবনে খাকান			কবিতা
১০৮.	সাফওয়ান ইবনে ইদ্রিস	১১৬৪-১২০১		
১০৯.	আল হিজারী	১১০৬-১১৫৫	কিতাব আল মাসহাব ফী গারাইব আহল আল মাগরিব	কবিতা
১১০.	আবু বকর আল জুবাইদী		কিতাবুল আইন	সাহিত্য ও অভিধান
১১১.	উবাদা বিন আব্দুল্লাহ বিন মাসুমী আবু বকরী			কবিতা
১১২.	আব্দুল ওয়ারিস বিন সুফিয়ান			
১১৩.	সাঈদ বিন উসমান বিন মারওয়ান			

	মনীষীবৃন্দের নাম	জন্ম মৃত্যু সন	রচিত গ্রন্থের নাম	বিষয়
১১৪.	সাঈদ বিন হাসান			
১১৫.	ইবনে আসমার	মৃ. ১০৮৫		কবিতা
১১৬.	আল উত্তরী	মৃ. ৮৬৯		হাদিস ও ফিক্হ
১১৭.	ইব্রাহিম বিন মুযায়ন	মৃ. ৮৭২		হাদিস ও ফিক্হ
১১৮.	মালিক বিন আল আল কাতানী	মৃ. ৮৮২		হাদিস ও ফিক্হ
১১৯.	মুহাম্মদ বিন উমর ইবন লুবাজ	৮৪০-৯২৬		হাদিস ও ফিক্হ
১২০.	মুহাম্মদ আব্দুল মালিক বিন আইমান	৮৬৬-৯৪১		হাদিস ও ফিক্হ
১২১.	আহমদ বিন সাঈদ	৮৯৭-৯৬১		হাদিস ও ফিক্হ
১২২.	বাকী ইবনে মাখলাদ	৮১৭-৮৯		হাদিস ও ফিক্হ
১২৩.	মুহাম্মদ ইবনে আসিম	মৃ. ৯৯২		ভাষা ব্যাকরণ ও সাহিত্য
১২৪.	ইবনে সাঈদ	মৃ. ৯৯৫		
১২৫.	ইবনুত্তায়্যানী	মৃ. ১০৪৪		
১২৬.	মাসলামা আল মাজরীতি	মৃ. ১০০৭		গণিত ও জ্যোর্তিবিদ্যা
১২৭.	ইবনুস সামাহ	৯৮০-১০৩৪		গণিত ও জ্যোর্তিবিদ্যা
১২৮.	তাম্মাম ইবনে আমির	৮০১-৮৯৬		কবিতা
১২৯.	ইবনে আবদুন	মৃ. ১১৩৪		কবিতা
১৩০.	ইবনে কুযমান	মৃ. ১১৫৯		কবিতা

৭১১ সাল হইতে ৭৫৬ সাল পর্যন্ত স্পেনে উমাইয়া শাসনকর্তাদের তালিকা

	নাম	রাজত্বকাল	খ্রিস্টাব্দে
১.	তারিক বিন জিয়াদ	৭১১–৭১২	"
২.	মুসা বিন নুসাইর	৭১২–৭১৩	"
৩.	আবদুল আজিজ বিন মুসা	৭১৩–৭১৬	"
৪.	আয়ুব বিন হাবিব	৭১৬–	
৫.	আল হোর বিন আবদুর রহমান আল সাকিফী	৭১৬–৮১৮	"
৬.	আস সামাহ্ বিন মালিক আল খাওয়ালিন	৭১৮–৮২১	"
৭.	আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ্ আল গাফিকী	৭২১–	"
৮.	আম্বাসা বিন সাহিম আল কাল্বী	৭২১–৭২৫	"
৯.	আজরাহ বিন আবদুল্লাহ	৭২৫–	"
১০.	ইয়াহয়া বিন বিন সালমা আল কাল্বী	৭২৫–৭২৬	"
১১.	উসমান বিন আলী উবায়হাদ	৭২৬–৭২৭	"
১২.	উসমান বিন আবি নাম আল কাসিমী	৭২৭–৭২৮	"
১৩.	হাযিফা বিন আল আহওয়াজ আল কায়ছী	৭২৮-৭২৯	"
১৪.	আল হাইসাম বিন ওবায়দুল্লাহ আল কিলাবী	৭২৯–৭৩০	"
১৫.	মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল আশজী	৭৩০–	"
১৬.	আবদুর রহমান আল গাফিকী (দ্বিতীয়বার)	৭৩০–৭৩২	"
১৭.	আবদুল মলিক বিন আল কাতান আল ফিহ্রী	৭৩২–৭৩৪	"
১৮.	ওকবা বিন হাজ্জাজ	৭৩৪–৭৪১	"
১৯.	আবদুল মালিক আল ফিহ্রী	৭৪১–	"
২০.	বাল্জ বিন বিশ্র আল কুসাইর	৭৪১–৭৪২	"
২১.	সালাবাহ বিন ছালামাহ আল আমিলি	৭৪২–৭৪৩	"
২২.	হুসাম বিন দাররার আল কাল্বী	৭৪৩–৭৪৫	"
২৩.	সুওয়াবাহ বিন ছালামাহ আল হান্দানী	৭৪৫–৭৪৭	"
২৪.	ইউসুফ বিন আবদুর রহমান আল ফিহ্রী	৭৪৭–৭৫৬	"

কর্দোবাতে উমাইয়া আমির ও খলিফাগণ ৭৫৬–১০৩১

আমিরগণ–

	নাম	রাজত্বকাল	খ্রিস্টাব্দে
১.	আবদুর রহমান আদ-দাখিল	৭৫৬–৮৮	"
২.	হিশাম (১ম)	৭৮৮–৯৬	"
৩.	হাকাম (১ম)	৭৯৬–৮২২	"
৪.	আবদুর রহমান (২য়)	৮২২–৮৫২	"
৫.	মুহম্মদ বিন আবদুর রহমান (২য়)	৮৫২–৮৬	"
৬.	মুনজির	৮৮৬–৮৮	"
৭.	আবদুল্লাহ	৮৮৮–৯১২	"

খলিফাগণ

	নাম	রাজত্বকাল	খ্রিস্টাব্দে
৮.	আবদুর রহমান আন নাসির-লি-দ্বীন ইল্লাহ	৯১২–৯৬১	"
৯.	হাকাম (২য়)	৯৬১–৭৬	"
১০.	হিশাম (২য়)	৯৭৬–১০০৯	"
১১.	মুহাম্মদ (২য়)	১০০৯–	"
১২.	সুলায়মান	১০০৯–১০১০	"
১৩.	মুহাম্মদ (২য়) (দ্বিতীয়বার)	১০০৯–১০১০	"
১৪.	হিশাম (২য়) (দ্বিতীয়বার)	১০১০–১০১৩	"
১৫.	সুলায়মান (২য়) (দ্বিতীয়বার)	১০১৩–১০১৬	"
১৬.	আলী বিন হাম্মুদ	১০১৬–১০১৬	"
১৭	আবদুর রহমান (৪র্থ)	১০১৬–১০১৮	"
১৮.	কাসিম বিন হাম্মুদ	১০১৮–	"
১৯.	ইয়াহয়া বিন আলী	১০১৮–১০২১	"
২০.	কাসিম বিন হাম্মুদ (দ্বিতীয়বার)	১০২১–১০২২	"
২১.	আবদুর রহমান (৫ম)	১০২২–১০২৩	"
২২.	মুহাম্মদ (৩য়)	১০২৩–২৪	"
২৩.	ইয়াহয়া বিন আলী (দ্বিতীয়বার)	১০২৪–২৫	"
২৪.	হিশাম (৩য়)	১০২৭–৩১	"

স্পেনে ক্ষুদ্র বংশ

	নাম	রাজত্বকাল	খ্রিস্টাব্দে
১.	কর্দোবায় বনু জাওহার	১০৩১–৭০	"
২.	মালাগা ও আলজিসিরাসে বনু হাম্মুদ	১০১০–১০৫৭	"
৩.	গ্রানাদায় বনুজিরি	১০১২–১০৯০	"
৪.	আলমেরিয়া, মুরসিয়া, দেনিয়া ও বেলারিক দ্বীপপুঞ্জে ক্ষুদ্র শ্লাভ বংশ	১০১৩–১১১৫	"
৫.	সারাগোসায় বনু হুদ	১০১০–১১১৮	"
৬.	তলেদোতে বনু জুন্নুন	১০৩৫–১০৮৫	"
৭.	সেভিলে বনু আব্বাদ	১০২৩–১০৯১	"

উত্তর আফ্রিকার শাসন– ১০৯০–১২৬৯

	নাম	রাজত্বকাল	খ্রিস্টাব্দে
১.	মুরাবিতগণ	১০৫৬–১১৪৬	"
২.	আল মুহাহিদুন	১১৪৬–১২৬৯	"

গ্রানাদায় বনু নসর– ১২৩২–১৪৯২

গ্রন্থপঞ্জী

1. Ameer Ali Syed—A short History of the Saracens.
2. Arnold and Guillaume—The Leagcy of Islam.
3. Borckelmann—History of the Islamic people.
4. Conde J. A.—History of the Dominion of the Arabs in Spain.
5. Encyclopaedia of Islam.
6. Encyclopaedia of Britannica.
7. Hitti P. K.—History of the Arabs.
8. Ibn Khaldun—Muqaddimah (English trans) (Kitab-al-Iber).
9. Imamuddin S. M. —A political History of Muslim Spain.
10. Imamuddin S. M.—The Economic History of Spain.
11. Imamuddin S. M. —Arab Muslim Administration.
12. Khuda Baksh—The Oreint under the caliphs.
13. Khuda Baksh—Islamic civilisation.
14. Lane poole. s.—Moors in Spain.
15. Dozy, Reinhert—Spanish Islam.
16. Scott S. P. —History of the Moorish Empire in Europe.
17. Maqqari—The History of the Mohammedan dynasties in Spain (English trans.)
18. সৈয়দ আমির আলী– আরব জাতির ইতিহাস (অনুবাদক–শেখ রেয়াজুদ্দীন আহমদ)।
19. কাজী ইমদাদুল হক– কাজী ইমদাদুল হক রচনাবলী।
20. ইসলামী বিশ্বকোষ– ইসলামিক ফাউণ্ডেশন্।
21. Islamic culture.
22. Islamic literature.
23. Journal of Pakistan Historical society.

নির্ঘন্ট

ই

ঈ

উ

এ

ও

ক

খ

গ

আস্তুরিয়া
ন্যাভারী
ক্যাস্টাইল
লিয়েন
মাড্রিদ
আরাগন
নারবোন
বারসিলোনা
তারাগোনা
তরতোসা
ক্যাতালোনিয়া
সারাগোসা
ভ্যালেনসিয়া
দেনিয়া
তাগুস নদী
লিসবন
মেরিদা
বাদাজোজ
কর্দোবা
তুদমির
কারমোনা
বেজা
জায়েন
সেভিল
গ্রানাদা
মুরসিয়া
লোরস
আলমেরিয়া
মালাগা
কাদিস
জিব্রালটার
আলজিসিরাস
সিউটা
মরক্কো
উত্তর আফ্রিকা
স্পেনের মানচিত্র
(৭১১ - ১৪৯২)
ইং মা: ১"— ১০০ মা: